ফিক্‌হী বিশ্বকোষ-৩

ফিক্‌হে
হযরত ওসমান
রাদিয়াল্লাহু আনহু

ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

www.amarboi.org

www.amarboi.org

হযরত রাসূলে মাকবুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বলেছেন ঃ

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

আল্লাহ যার
কল্যাণ চান তাকে
দীনি ইলমের পাণ্ডিত্য দান করেন।
—আল হাদীস।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ফিক্‌হী বিশ্বকোষ–৩

ফিক্‌হে হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান

(রাদিয়াল্লাহু আনহু)

ড. মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী

ভাষান্তর ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

ISBN : 984-840-004-4 Set

আঃ প্রঃ ২৯৭

১ম প্রকাশ

সফর	১৪২৩
বৈশাখ	১৪০৯
এপ্রিল	২০০২

বিনিময় ঃ ১৭০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

FIQUEHE OTHMAN (R) by Doct. Mohammad Rawas Quala'zi. Translated by Mohammad Khalilur Rahaman Momin. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 170.00 Only.

www.amarboi.org

অনুবাদকের কথা

১. ইসলামী জীবন বিধানের প্রধান উৎস দু'টো। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব বা কুরআনুল হাকীম অন্যটি সুন্নাতে রাসূল বা হাদীস। আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে—হাদীস বা সুন্নাতে রাসূল মূলত আল্লাহ্‌র কিতাব বা আল কুরআনের ভাষ্য। হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআন বুঝার কথা কল্পনাও করা যায় না। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে—'তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও' নামায কিভাবে কায়েম করতে হবে অথবা যাকাত কিভাবে দিতে হবে তার বিস্তারিত কোনো রূপরেখা পেশ করা হয়নি। সুন্নাতে রাসূলে আমরা দেখতে পাই নামায বলতে ওযু করে নির্দিষ্ট সময়ে কিবলামুখী হয়ে বুকে অথবা নাভির নিচে হাত বেধে সানা, সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়া, রুকূ' করা সিজদা করা, তাশাহুদ পড়া, দরূদ শরীফ পড়া তারপর দুআ মাছুরা পড়ে নামায শেষ করার পরিপূর্ণ বিবরণ। তদ্রূপ ন্যূনতম কতটুকু সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হবে এবং সম্পদের মোট কত অংশ প্রদান করতে হবে তাও হাদীসের মাধ্যমে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি।

২. আল কুরআন অবতীর্ণ ও তার ভাষ্য প্রদানের সময় যারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন তারা হচ্ছেন সম্মানিত সাহাবাগণ। আল্লাহ্‌র কথা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষ্য তাদের মাধ্যমেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাছাড়া তারা আবার হাদীসের ভাষ্যও প্রদান করেছেন। অনেক সময় কুরআন ও হাদীসের আলোকে তারা নতুন কোনো সমস্যার সমাধানও পেশ করেছেন। সেগুলোকে ভিত্তি করে পরবর্তীতে ইজমা ও কিয়াসের উদ্ভব হয়েছে। যা ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে পরিচিত।

৩. সাহাবাদের যে কোনো ধরনের ভাষ্যই হোক তা মূলত কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ব্যাপারে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আবার ইমাম ও মুজতাহিদগণ ও ইসলামী আইন ও বিধান সংক্রান্ত অনেক ভাষ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে—ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইসলামী আইন ও বিধান সংক্রান্ত ভাষ্যগুলো যেখানে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ্ বুঝার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করবো, সেখানে তা না করে বরং সেই ভাষ্যকেই অকাট্য মনে করে আমল করা শুরু করে দিয়েছি। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ইমামদের গবেষণা ও রায় যেখানে কুরআন হাদীসের সাথে তুলনা করে কিংবা যাচাই করে মানা প্রয়োজন সেখানে কুরআন হাদীসের সাথে যাচাই তো দূরের কথা এক ইমামের গবেষণা অন্য ইমামের গবেষণার সাথে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনও আমরা মনে করি না। তাছাড়া সে সুযোগও আমাদের নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেক ইমামই তার গবেষণার রায় দেয়ার পর বলেছেন—'এটি আমার গবেষণা বা অনুসন্ধানের ফলাফল। এ রায় বা ফলাফল যদি কোনো সহীহ্ হাদীসের বিপরীত প্রমাণিত হয় তাহলে সেই হাদীসের বক্তব্যই হবে আমার রায় বা বক্তব্য।' অথচ আজ আমরা যারা সেই মহান ইমামদের অনুসরণ করছি তারা একথা প্রায় ভুলেই বসেছি। মনে করি আমাদের ইমাম যেসব রায় দিয়েছেন সবই সঠিক এবং নির্ভুল।

www.amarboi.org

৪. একজন সাধারণ লোক কিংবা একজন আলিম যতো সহজে বলতে পারেন এ মাসয়ালায় ইমাম আবু হানিফা সাহেবের অভিমত এই, ইমাম শাফিঈ সাহেবের রায় এই এবং ইমাম মালিক সাহেবের সিদ্ধান্ত এই, ততো সহজে বলতে পারেন না যে, এ মাসয়ালার ব্যাপারে অমুক সাহাবার রায় এই এবং অমুক সাহাবার রায় এরূপ। কারণ, ইমামদের ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি আমরা যেভাবে জানতে পারি সাহাবাদের ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি সেভাবে জানার সুযোগ ও উপকরণ আমাদের কাছে নেই। এমন কি যেসব ফিক্‌হী গ্রন্থ পাওয়া যায় সেখানেও সাহাবাদের মতামত বিস্তারিতভাবে জানা যায় না।

৫. বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গবেষক, জাহ্‌রান পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটির (সৌদী আরব) প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ রাওয়াস কালাজী [যিনি কুয়েত থেকে প্রকাশিত—ফিক্‌হী বিশ্বকোষ (৪০ খণ্ডে) সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য] সাহাবা ও তাবিঈনদের ফিক্‌হী রায়গুলোকে সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে চলছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন—

"ফিক্‌হী ইসলামীর সংকলন ও সম্পাদনার সময় আমার ভেতর ইচ্ছে জাগলো এমন একটি ফিক্‌হী বিশ্বকোষ সংকলনের, যেখানে ইসলামী ফিক্‌হের যাবতীয় ইজতিহাদ ও রায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যদিও কাজটি অসম্ভব নয়, তাই বলে খুব সহজ সাধ্যও ছিলো না। কারণ—সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাবিঈনে ইযাম এবং ইমামদের ইজতিহাদী রায়গুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে সংকলন করা হয়নি। দ্বিতীয়ত প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহের ফিক্‌হগুলোও আধুনিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে কোনো সংকলন বের করা হয়নি। অথচ একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হী বিশ্বকোষের ইমারত তৈরী করতে হলে এ দু'টো জিনিস ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে।

এ মহান কাজের দায়িত্ব নিতে এ পর্যন্ত না কোনো রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে না কোনো সংস্থা। এমনকি কোনো ব্যক্তিও এগিয়ে আসেননি। তাদের ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফায়দা ওঠানোর জন্য ভিত্তির ইট ছাড়াই ইমারত নির্মাণ শুরু করে দেয়া। এহেন প্রতিকূল অবস্থায়ও বুকে সাহস সঞ্চয় করে সালফে সালিহীনদের ফিক্‌হী রায় সংক্রান্ত বিশ্বকোষ সংকলন ও সম্পাদনার কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু লেখনী ধরার পূর্বে সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, তাবিঈন (রহ) এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ইজতিহাদ ও রায়গুলোকে একত্রিত করার কাজ শুরু করে দিলাম। একত্রিত করার যে কাজটি আজ পর্যন্ত কেউই করেননি। বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে সেই মহান কাজটি আমি সম্পূর্ণ করেছি। ------- এখন আমি শুধু সালফে সালিহীনদের ফিক্‌হী বিশ্বকোষ রচনা কাজে নিয়োজিত থাকবো।"

এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত খণ্ডগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। যা পর্যায়ক্রমে পাঠকদের হাতে পৌঁছুবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলো হচ্ছে—

১. ফিক্‌হে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু

২. ফিক্‌হে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু

৩. ফিক্‌হে হযরত ওসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

৪. ফিক্‌হে হযরত আলী ইবনু আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

৫. ফিক্‌হে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.amarboi.org

লেখকের এ মহান খিদমতকে বাংলা ভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য গ্রন্থগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এ মহান কাজে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে ইসলামী বই পুস্তক প্রকাশনা জগতের নক্ষত্র স্বরূপ আধুনিক প্রকাশনী। সবগুলো খণ্ডকেই পর্যায়ক্রমে অনুবাদ ও প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৬. সংকলকের ইল্‌মী মান ও পাণ্ডিত্যে গ্রন্থখানা হয়ে ওঠেছে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ মহান গ্রন্থটি অনুবাদের কাজ সহজ ছিলো না। তবু আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশা নিয়ে এ কাজে হাত দিয়েছি। জানি না এতে কতটুকু সফল হয়েছি। তবে অনুবাদে মূল বিষয়ের ভাব ও বক্তব্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। গ্রন্থটি অনুবাদে আমি প্রতিনিয়ত যাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তাদের মধ্যে—আধুনিক প্রকাশনীর সাবেক পরিচালক মরহুম আবদুল গাফ্‌ফার ভাই, প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন ভাই এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ ভাই। আর যারা অনুবাদে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় মুরব্বী ও বরেণ্য আলিমে দীন আবদুল মান্নান তালিব ভাই এবং অধ্যক্ষ মাওলানা মোজ্জাম্মেল হক সাহেব অন্যতম। আল্লাহ্ যেন তাদের প্রত্যেককে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

৭. এবার অনুবাদ সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা।

[৭.১] মূল গ্রন্থ যেহেতু আরবী ভাষায় তাই বিষয়বস্তুর শিরোনামও আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো। বাংলা ভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলো বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিয়েছি। এতে মূল গ্রন্থের সাথে অনুবাদ গ্রন্থের মানের কোনো হেরফের হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

[৭.২] এখানে পাঠককে একটি কথা মনে রাখতে হবে, এ সিরিজের প্রতিটি পুস্তক ইসলামী আইনের উৎসের মর্যাদা রাখে। তাই আমরা অন্যান্য ফিক্‌হী গ্রন্থে মাসয়ালার যে বিন্যাস দেখতে পাই এখানে তার ব্যতিক্রম। যেমন সাধারণ ফিক্‌হী গ্রন্থে বলা হয়েছে 'ওযুর সময় নাকে পানি দিতে হবে এবং কুলি করতে হবে।' কিন্তু এসব গ্রন্থে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবাগণ ওযু করেছেন। আবার বলা যায় 'জাহেলী যুগের কুপ্রথার অনুসরণ ইসলামে জায়েয নেই।' এটি হচ্ছে মূল মাসয়ালা। কিন্তু দেখা যায় ফিক্‌হে আবু বকরে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এক মহিলা কথা না বলে হাজ্জ করার মানত করেছিলেন, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কথপোকথনের মাধ্যমে জানতে পেরে তাকে বারণ করেছেন। আবার দেখা যায় ওযু ভঙ্গের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে দু'টো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, অন্যগুলো সম্পর্কে কোনো কথাই বলা হলো না। এর কারণ হচ্ছে—যে সাহাবার মতামতকে ধারণ করে ফিক্‌হী গ্রন্থের রূপ দেয়া হয়েছে, ঐ সাহাবা থেকে হয়তো সেই দু'টো বিষয়েই তার মতামত পাওয়া গেছে। অন্য খণ্ডে হয়তো অন্য সাহাবা থেকে সেই বিষয়ে ভিন্নমত পাওয়া যাবে

www.amarboi.org

কিংবা আরো বেশী মতামত পাওয়া যাবে। সবগুলো খণ্ডকে যখন এক সাথে রাখা হবে তখন দেখা যাবে প্রতিটি বিষয়েরই পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা আমাদের কাছে চলে এসেছে।

[৭.৩] ইখতিলাফী মাসয়ালার ব্যাপারে যেটিকে অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করা হয়েছে শুধু সেইটির নোট দেয়া হয়েছে। সবগুলোর নোট দেয়া হয়নি। কারণ দু'টো। অনুবাদক কর্তৃক বেশী টীকা সংযোজন করলে মূল কিতাবের গুরুত্ব হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত—ফিক্‌হী মাসয়ালায় সাহাবাদের মধ্যেও অনেক ব্যাপারে মতবিরোধ হতো কিন্তু তা নিয়ে কখনো তারা বাড়াবাড়ি করেননি সে কথাটি সুস্পষ্ট করার জন্য। তবে কিছু আরবী শব্দের পরিচিতি মূলক ব্যাখ্যা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজন করা হয়েছে। অবশ্য অনুবাদকের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন মূল লেখক ও অনুবাদকের কথাকে পাঠকগণ গুলিয়ে না ফেলেন।

[৭.৪] যেহেতু মূল পুস্তক আরবী ভাষায় লিখিত তাই একটি মাসয়ালা আরবীতে একাধিক শিরোনামভুক্ত হয়েছে। এক জায়গায় সেই মাসায়ালাটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু অন্য জায়গায় শুধু রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। যেমন—ইবিল বা উট। এটি বিভিন্ন মাসয়ালার সাথে জড়িত। যাকাতের মাসয়ালার সাথেও উটের প্রসঙ্গটি এসে যায় আবার হাজ্জের কুরবানীর মাসয়ালাও উটের কুরবানী প্রসঙ্গটি চলে আসে, আবার দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধের দিয়াত বা জরিমানা হিসেবেও উটের কথা চলে আসে। তাই ইবিল শিরোনামে বিস্তারিত আলোচন না করে কোথায় কোথায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তার নির্দেশিকা তুলে ধরা হয়েছে। আরো অনেক মাসয়ালার ব্যাপারেই এরূপ করা হয়েছে। আমার মনে হয় এরূপ করায় পাঠকদের অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশী হয়েছে। আশা করি পুস্তকটি পড়লেই পাঠকগণ আমার সাথে একমত হবেন।

[৭.৫] পাঠকদের দেখমতে অনুরোধ কোথাও যদি আপনারা অনুবাদকে দুর্বোধ্য মনে করেন কিংবা কোনো ভুলক্রটি আপনাদের দৃষ্টিতে পড়ে যায় মেহেরবাণী করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে এ বিশ্বকোষের সংকলক, প্রকাশক ও পাঠক প্রত্যেকের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে জাযায়ে খায়ের কামনা করছি এবং আমার এ অনুবাদ কর্মটিকে ভুলক্রটি মাফ করে কবুল করার জন্য বিশ্ব চরাচরের মালিক ও প্রতিপালকের সমীপে নতশিরে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমীন।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০
০৭-০৯-৯৯ ঈসায়ী

www.amarboi.org

লেখকের অভিব্যক্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ـ

এ পুস্তক যা "ফিক্‌হে হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা)" নামে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে, তা প্রকাশনা হিসেবে সিরিজের ৬ষ্ঠতম গ্রন্থ। ইতোপূর্বে আমরা এ সিরিজের পাঁচটি গ্রন্থ পাঠক সমীপে পেশ করেছি। যদিও পুস্তকটি প্রকাশনার ধারাবাহিকতায় বিলম্বে প্রকাশ করা হলো কিন্তু গুরুত্ব ও ঘটনা বিচারে এর ক্রমধারা আরো অনেক আগের। আমরা প্রকাশের যে ক্রমধারা অবলম্বন করেছি তা সময়ের দাবী কিংবা গুরুত্বের কারণে নয়। যেমন–প্রথমে প্রকাশ করা হয়েছে "ফিক্‌হে ইবরাহীম নখঈ" অথচ তিনি ছিলেন একজন তাবিঈ মাত্র। তারপর "ফিক্‌হে হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব (রা)," "ফিক্‌হে হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা)," "ফিক্‌হে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)," "ফিক্‌হে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)" এবং বর্তমানে "ফিক্‌হে হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা)" প্রকাশ করা হলো।

এটি যদি আমার একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হতো তাহলে সর্বপ্রথম খুলাফা-ই-রাশিদীনের ফিক্‌হ প্রকাশ করতাম। তাও ধারাক্রম অনুযায়ী। অর্থাৎ প্রথমে "ফিক্‌হে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)" তারপর "ফিক্‌হে হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব (রা)" তারপর "ফিক্‌হে হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা)" এবং "ফিক্‌হে হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা)" প্রকাশের ব্যবস্থা নিতাম। অতপর ক্রমানুসারে "ফিক্‌হে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)," "ফিক্‌হে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)," "ফিক্‌হে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)" প্রকাশ করতাম। তারপর ধারাবাহিকভাবে তাবিঈদের ফিক্‌হ প্রকাশের উদ্‌যোগ নিতাম। কিন্তু ব্যতিক্রম ক্রমধারায় প্রকাশ করাটাই ছিলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মর্জি। তাই সেভাবেই এ সিরিজ প্রকাশনা এগিয়ে চলছে।

যেহেতু এ পুস্তকটি হযরত ওসমান (রা)-এর ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত মতামতের সামষ্টিক সংকলন সেহেতু তার সংক্ষিপ্ত জীবনীর ওপর একটু নযর বুলিয়ে নেয়াও জরুরী।

হযরত ওসমান (রা) খুলাফা-ই-রাশিদীনের তৃতীয় খলীফা ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয়–ওসমান ইবনু আফ্‌ফান ইবনু আবুল আস ইবনু ওমাইয়া। তাঁর বংশ সম্পর্ক ছিলো কুরাইশ গোত্রের সাথে।

তিনি হিজরতের ৪৭ বছর পূর্বে পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামী দাওয়াতের প্রথম দিকেই তিনি দাওয়াত কবুল করে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হন।

ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই তিনি মস্তবড় ধনী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সকল সম্পদ ইসলামের কল্যাণে ব্যয় করেন। দীনের বিজয় ও মুসলমান ভাইদের সাহায্যার্থে তিনি যে মুক্ত হস্তে অকাতরে দান করতেন নিচের কয়েকটি ঘটনা-ই তার প্রমাণ—

www.amarboi.org

একবার হযরত ওসমান (রা) জানতে পারলেন—মসজিদে নববী সংলগ্ন জায়গাটি কিনে মসজিদ প্রশস্ত করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সাথে সাথে তিনি সেই জায়গা কিনে মসজিদে নববীর নামে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের কাছে আপীল করলেন, তারা যেন সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ যোগানোর ব্যাপারে সাহায্য করেন। তখন হযরত ওসমান (রা) যে দান করেছিলেন, অর্ধেক সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ যোগাড় করার জন্য তা যথেষ্ট হয়েছিলো।

মদীনায় হিজরতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের থেকে বি'রে রুমা (বা রুমা নামক কূপ) ক্রয় করে মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য তা ওয়াক্‌ফ করে দিতে সাহাবাদেরকে আহ্বান জানালেন, তখন অবিলম্বে হযরত ওসমান (রা) তা ক্রয় করে মুসলমানদের কল্যাণে ওয়াক্‌ফ করে দেন।

হযরত ওসমান (রা) ১২ বছর খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এ দীর্ঘ সময়ে একটি পয়সাও তিনি বাইতুল মাল থেকে গ্রহণ করেননি। বেশীর ভাগ সময় তিনি দিনে রোযা রেখে এবং রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদাত ও কুরআন তিলাওয়াতে কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর এ অসামান্য তাকওয়া, দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা এবং ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে দান)-এর জযবা দেখে স্বয়ং ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জাবোধ করতেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

الا استحى من رجل تستحى منه الملائكة

'অর্থাৎ আমি কি ঐ ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, যে ব্যক্তিকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা করে ?'

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর শাহাদাতের পর [সাহাবা কিরাম (রা)-এর] মজলিশে শুরার সিদ্ধান্ত ক্রমে ২৯শে জিলহাজ্জ, ২৩ হিজরী, রোজ সোমবার তিনি খলীফা নির্বাচিত হোন এবং দীর্ঘ ১২ বছর পর্যন্ত তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। সেসব অভিযোগের মধ্যে অন্যতম অভিযোগ হচ্ছে—তিনি যেহেতু বনী উমাইয়া গোত্রের লোক ছিলেন তাই তিনি সেই গোত্রের লোকদের ক্ষমতায় পুনর্বাসন করেছিলেন। একবার কূফা, বসরা এবং মিশর থেকে কয়েকটি প্রতিনিধি দল এ সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো এবং তারা অনুরোধ করলো তিনি যেন এ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু তিনি তাদের সাথে একমত হলেন না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিলেন—"আল্লাহর কসম ! আমি কখনো এ ধরনের খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবো না।" তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসও তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন যা তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

"ওসমান ! আল্লাহ তোমাকে বিশেষ নিয়ামতে ধন্য করবেন। যদি মুনাফিকরা তোমাকে তা থেকে বঞ্চিত করতে চায়, তুমি তাদের কথা শুনবে না।"

রাসূলের এ বাণী তিনি কয়েকবার তাদের সামনে পুনরাবৃত্তি করলেন। তারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর বাড়ি অবরোধ করে রাখলো। তারপর তারা দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে

www.amarboi.org

শহীদ করে। ওসমান (রা) তখন কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করছিলেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো ৩৫ হিজরীর ঈদুল আযহার দিন সকাল বেলা।

আমি এখানে বিশেষভাবে যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে—প্রাচীনকালে হাক্কানী ওলামাগণের নীতি ছিলো, যখন ইল্‌মে হাদীসের ব্যাপারে আলোচনা হতো এবং বেশী সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাদের উল্লেখ করা হতো তখন তারা সর্বপ্রথম খুলাফা-ই-রাশিদীনের নাম বলতেন। যখন ফকীহ্ সাহাবাদের সম্পর্কে কথা ওঠতো তখনো সর্বপ্রথম তারা খুলাফা-ই-আরবা'আর (চারজন খলীফার) কথা বলতেন। কিন্তু যখন আমি সাহাবাদের রায়গুলোকে একত্রিত করলাম তখন দেখলাম হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর রায় প্রায় সমান। এর কারণ ফিক্‌হী সমাধান এবং রায়ের যখন যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ্ ততটুকু ইল্‌ম তাদেরকে দিয়েছেন। হতে পারে আমি তাদের সবগুলো রায়কে সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতেই তাদের ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি ও সুস্থ চিন্তার পুরোপুরি একটি চিত্র আমাদের সামনে চলে এসেছে। যা আমাদের জন্য ইল্‌মের এক অসাধারণ উৎস হিসেবে কাজ করবে।

আবু বকর (রা) খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দু' বছর কয়েক মাস মাত্র। তার মধ্যে অধিকাংশ সময় তাকে ব্যয় করতে হয়েছে বিভিন্ন গোত্রের বিদ্রোহ দমন ও ভণ্ড নবী দাবীদারদের শায়েস্তা করার কাজে। দু' দণ্ড তিনি স্বস্তিতে বসতে পারেননি। তাই আইন ও ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর তেমন কোনো সুযোগই তিনি পাননি।

হযরত ওমর (রা) যখন খলীফা হন তখন শাসন ব্যবস্থা মুটামোটি স্থিতি লাভ করে। সে জন্য আইন ও ব্যবস্থাপনাকে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে যথেষ্ট সুযোগ ও সময় তিনি পেয়েছিলেন। তাই আজ আমাদের সামনে তার ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার ফায়সালার বিবরণীর বিরাট এক কলেবর বর্তমান।

হযরত ওসমান (রা) যে মহূর্তে খিলাফতের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তার আগেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও আইনসমূহ সুদৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছিলো। বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে চলছিলো। হযরত ওমর (রা) যে নীতিমালা প্রণয়ন করে গিয়েছিলেন সেই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই হযরত ওসমান (রা) প্রশাসন চালাচ্ছিলেন। নতুন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন খুব কমই অনুভূত হতো। এ কারণেই হযরত ওমর (রা)-এর চেয়ে হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর ফিক্‌হের কলেবর কিছুটা ছোট।

তাই বলে কেউ এরূপ ভুল ধারণা করে বসবেন না যে, হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে বুঝি নতুন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন-ই হয়নি এবং তিনি নিজস্ব কোনো মতামত-ই ব্যক্ত করেননি। আমাদের এ বক্তব্যের মূল কারণ ছিলো ফিকহে ওমর (রা)-এর চেয়ে ফিক্‌হে ওসমান (রা)-এর কলেবর অপেক্ষাকৃত ছোট কেন সেই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। যখনই কোনো নতুন সমস্যা তিনি অনুভব করেছেন তখনই সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা রায় তুলে ধরতে মহূর্ত কালও বিলম্ব করেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—যখন তাঁকে পরামর্শ দেয়া হলো, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে আল্ কুরআনের কিছু কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেয়া হোক এবং সেই কপির পাঠকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হোক। তখনই তিনি হযরত

www.amarboi.org

আবু বকর (রা)-এর কাছে যে কপিটি সংরক্ষিত ছিলো তা চেয়ে পাঠালেন। অতপর কয়েকটি কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এ মর্মে নির্দেশ জারী করলেন—এ কপি থেকে যেন সবাই নকল করে নেয় এবং পাঠ করে। অবশিষ্ট সকল কপি যেন সংগ্রহ করে গভর্নরের তত্ত্বাবধানে সেগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যাতে ভবিষ্যতে কুরআনে কারীমের ব্যাপারে কোনো মতভেদ সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।

আবার যখন বলা হলো—মাসজিদুল হারাম এবং মাসজিদুন নববীর সম্প্রসারণ কাজ প্রয়োজন। তখনই তিনি বিনা দ্বিধায় তা করিয়ে দিলেন। আবার তাকে পরামর্শ দেয়া হলো, জুম'আর দিন যাতে দূরদূরান্ত থেকে লোকজন মসজিদে এসে হাজির হতে পারে সেজন্য যুরা নামক স্থান থেকে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন করা হোক। সাথে সাথে তিনি জুম'আর দিন দ্বিতীয় আযানের অনুমতি দিয়ে দিলেন। কারণ আযানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে লোকদেরকে নামাযের ব্যাপারে অবহিত করা।

তাকে আরো পরামর্শ দেয়া হলো, সন্ত্রাস দমন ও সমাজে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিভাগের প্রয়োজন। তখনই তিনি পুলিশ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলেন।

বিচার ফায়সালার জন্য যখন তিনি দেখলেন মসজিদে গ্যাদারিং হয়ে যাচ্ছে এবং মসজিদে লোকদের কোলাহল বেড়ে যাচ্ছে তখন তিনি পৃথক ভবন নির্মাণ করে সেখানে বিচারালয় স্থানান্তর করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

তদ্রূপ এমন জমি যা থেকে মালিককে বেদখল করা হয়েছে এবং রাষ্ট্র তা রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছে; আবাদকারীদের দাবী ছিলো তা যেন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। তখন তিনি বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ তা কার্যকরী করেন। কারণ তিনি একথা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, জমি অনাবাদী পড়ে থাকলে তার উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আর সেগুলো আবাদ করাতে পারলে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে।

আমি এ গ্রন্থখানা সংকলন ও সম্পাদনা করতে গিয়ে হাদীস ও ফিক্‌হের মৌলিক গ্রন্থসমূহ (যেমন–মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক) থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। নিসন্দেহে এসব গ্রন্থে সালফে সালেহীনদের ফিক্‌হী দৃষ্টিভঙ্গি ও রায়ের এক বিরাট অংশ বিদ্যমান। তাছাড়া সিহাহ্ সিত্তা, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানু বাইহাকী, মুসান্নাফ সাঈদ ইবনু মানসুর প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও উপকৃত হয়েছি। হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে যেগুলো আমি সামনে রেখেছি—ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী, ইমাম নববী কর্তৃক মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনু কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী, দুররু মানসুর এবং ইমাম আবু বকর আল জাস্‌সাসের আহকামুল কুরআন থেকেও আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি।

যখন ফিকহে মুকারান (Comparative study of law) সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর প্রয়োজন হয়েছে তখন ইবনু কুদামার আল মুগনী, ইবনু হাযামের আল মুহাল্লী, আল মাজমু' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ দেখেছি।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নের সময় যখন দেখেছি একটি বর্ণনা অন্য একটি বর্ণনার সাথে মৌলিক মিল আছে তখন আমি সময় বাঁচানোর জন্য ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী, শরহে যুরকানী, দুররুল মানসুর প্রভৃতি গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি।

www.amarboi.org

ফিক্‌হে ওসমান (রা) আমি ঠিক সেই ভাবেই সংকলন করেছি, যেভাবে আমি ফিক্‌হের অন্য গ্রন্থগুলো করেছি। তাই আপনি যখন কোনো মাসয়ালা জানতে চাবেন তখন দেখতে হবে তা কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন আপনি খারাজ সংক্রান্ত কোনো মাসয়ালা জানতে চান, তাহলে আপনাকে "খ" বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত 'খারাজ' শব্দটি বের করতে হবে, তখন আপনি যা জানতে চান পেয়ে যাবেন। আর যদি সেখানে না পান তাহলে কোথায়.পাবেন সে ব্যাপারেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইঙ্গিতকৃত জায়গায় আপনার উদ্দিষ্ট মাসয়ালাটি অবশ্যই পাবেন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে ফরিয়াদ তিনি যেন আমার এ প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। আমীন।

আহকার
মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী
পেট্রোলিয়াম ইউনিভারসিটি,
জাহরান, সাউদি আরব,
১লা যিলহাজ্জ, ১৪০১ হিজরী।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

শিরোনাম বিন্যাস

আ

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
○ আইনুন (عين)-চোখ	২৭
○ আওরাহ্ (عورة)-সতর/শরীরের গোপন অংশ	২৭
○ আ'ওয়ার (اعور)-এক চোখ অন্ধ ব্যক্তি	২৭
○ আখুন (اخ)-ভাই	২৮
○ আছার (اثار)-নিদর্শন/স্মৃতি চিহ্ন	২৮
○ আতাউন (عطاء)-অনুদান/ভাতা	২৮
○ আতিয়্যাহ (عطية)-দান	৩২
○ আবদুন (عبد)-দাস	৩২
○ আবুন (اب)-পিতা	৩২
○ আ'মা (اعمى)-অন্ধ/দৃষ্টিহী	৩২
○ আ'যল (عزل)-জুরায়ুর বাইরে বীর্যপাত	৩৩
○ আয্লুন (عضل)-বলপ্রয়োগ করা/ বাধা দেয়া	৩৩
○ আযহিয়্যাহ (اضحية)-কুরবানী	৩৩
○ আযান (اذان)-আযান/ঘোষণা	৩৫
○ আয়িব (عيب)-দোষ	৩৬
○ আরদুন (ارض)-জমি/ ভূমি	৩৬
○ আরব (عرب)-আরবের অধিবাসী	৩৭
○ আরাফাহ্ (عرفة)-আরাফাতের ময়দান	৩৭
○ আলে রাসূলুল্লাহ (ال رسول الله)-রাসূল (সা)-এর বংশধর	৩৭
○ আশরাবাহ্ (اشربة)-সুরা	৩৭
○ আসরুন (اسر)-বন্দী করা	৪১
○ আসাবা (عصبة)-পিতৃ সূত্রে আত্মীয়	৪২

ই

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
○ ইক্তা (اقطاع)-জায়গীর দান/ জমিদারী প্রদান	৪৫
○ ইক্তিহাল (اكتحال)-সুরমা ব্যবহার করা	৪৫
○ ইক্রাহ্ (اكراه)-অবৈধ বলপ্রয়োগ/ জবরদস্তি	৪৫
○ ইকামাতুস সালাত (اقامة الصلوة)- নামাযের ইকামাত বলা	৪৬
○ ইকামাতুল মুসাফির (اقامة المسافر)- মুসাফিরের মুকীম হয়ে যাওয়া	৪৬
○ ইখতিলাফ (اختلاف)-মতবিরোধ/ মতানৈক্য	৪৬
○ ইছবাত (اثبات)-প্রমাণ করা/সত্য প্রতিষ্ঠিত করা	৪৬
○ ইজতিহাদ (اجتهاد)-গবেষণা	৪৭
○ ইজারা (اجارة)-ভাড়া	৪৭
○ ইত্কুন (عتق)-মুক্ত করে দেয়া	৪৭
○ ইত্লাফ (اتلاف)-নষ্ট করা/ক্ষতি করা	৪৭
○ ইদ্দাহ্ (عدة)-ইদ্দত	৪৮
○ ইদ্দিখার (ادخار)-জমা করা/ সংরক্ষণ করা	৫১
○ ইন্সাত (انصات)-মনযোগ দিয়ে শোনা	৫২
○ ইনাউন (اناء)-থালা বাসন	৫২
○ ইফতার (افطار)-পানাহারের মাধ্যমে রোযার অবসান করা	৫২
○ ইফতিদা (افتداء)-ফিদইয়া দেয়া	৫২
○ ইফরাদ (افراد)-হাজ্জের একটি পদ্ধতি	৫২
○ ইফলাস (افلاس)-দেওলিয়া হয়ে যাওয়া	৫৩
○ ইবনু (ابن)-ছেলে	৫৩
○ ইবনুস্ সাবীল (ابن السبيل)- পথিক/ভ্রমণকারী	৫৩
○ ইবাক (اباق)-ক্রীতদাস পালিয়ে যাওয়া	৫৩
○ ইবিল (ابل)-উট	৫৩
○ ইমামত (امامت)-নেতৃত্ব/ইমামত	৫৩
○ ইমারাত (امارة)-নেতৃত্ব	৫৩
○ ইযিন (اذن)-অনুমতি/সম্মতি	৬১
○ ইয়াওমু আরাফা (يوم عرفة)- আরাফাতের দিন	৬১

www.amarboi.org

o ইয়াওমুশ শাক্কি (يوم اشك)- সন্দেহের দিন ৬১
o ইয়াতীম (يتيم)-ইয়াতিম ৬২
o ইয়াদুন (يد)-হাত ৬২
o ইয়ামীন (يمين)-শপথ ৬২
o ইরছ্ (ارث)-উত্তরাধিকার/মীরাস ৬২
o ইল্‌ম (علم)-অবগতি/জ্ঞান ৭৫
o ই'লান (اعلان)-ঘোষণা ৭৬
o ইশ্‌হাদ (اشهاد)-সাক্ষ্য বানানো ৭৬
o 'ইশা (عشاء)-'ইশার নামায ৭৬
o ইস্‌তি'আযাহ্ (استعاذة)-আউযুবিল্লাহ পড়া ৭৬
o ইস্‌তিতাবাহ্ (استتابة)-তাওবার জন্য আহ্বান জানানো ৭৬
o ইসতিব্‌রা (استبراء)-জরায়ু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ৭৬
o ইস্‌তি'যান (استئذان)-অনুমতি চাওয়া ৭৮
o ইস্‌তিন্‌জা (استنجاء)-পেশাব পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করা ৭৯
o ইস্‌তিনশাক (استنشاق)-নাকে পানি দেয়া ৮০
o ইস্‌তিয়াক (استياق)-দাঁতন করা/ মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা ৮০
o ইস্‌তিয্‌লাল (استظلال)-ছায়া গ্রহণ করা ৮০
o ইস্‌তিস্‌কা (استسقاء)-বৃষ্টি প্রার্থনা করা ৮০
o ইসতিহ্‌কাক (استحقاق)-যোগ্য হওয়া/অধিকারী হওয়া ৮০
o ইস্‌তিহাযা (استحاضة)-রক্ত প্রদর ৮১
o ইসতিল্‌কা (استلقاء)-চিৎ হয়ে শোয়া ৮১
o ইস্‌ফার (اسفار)-ফর্সা হওয়া ৮২
o ইসবা (اصبع)-আঙ্গুল ৮২
o ইসরাফ (اسراف)-অপচয়/অপব্যয় ৮২
o ইহ্‌ইয়াউল লাইল (احياء الليل) -শববেদারী/রাত্রি জাগরণ ৮২
o ইহইয়াউল মাওয়াত (احياء الموات)- পতিত জমি আবাদ করা ৮২
o ইহ্‌তিকার (احتكار)-মজুদদারী ৮৩
o ইহ্‌তিয়াত (احتياط)-সতর্কতা ৮৪
o ইহ্‌তিলাম (احتلام)-স্বপ্নদোষ ৮৪
o ইহ্‌দাদ (احداد)-শোক পালন ৮৫
o ইহ্‌সান (احصان)-বিবাহিত/সংরক্ষিত ৮৫
o ইহ্‌রাম (احرام)-হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরা ৮৫

ঈ

o ঈদ (عيد)- ৯৫
o ঈমা (ايماء)-ইশারা করা ৯৫
o ঈলা (ايلاء)-স্ত্রীর সাথে বিছানায় না যাওয়ার শপথ ৯৫

উ

o উখ্‌তু (اخت)-বোন ৯৮
o 'উন্নাহ্ (عنة)-পুরুত্বহীনতা ৯৮
o উম্মু ওয়ালাদ (ام ولد)- ৯৮
o উম্মুন (ام)-মা ৯৮
o উযবু (عضو)-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ৯৮
o উযুনুন (اذن)-কান ৯৮

ও

o ওকুবাহ্ (عقوبة)-শাস্তি ৯৯
o ওমরা (عمر)-এক প্রকার হজ্জ ৯৯
o ওয্‌র (عذر)-সংগত কারণ ১০০
o ওযু (وضو)-নির্দিষ্ট নিয়মে কতিপয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া ১০০
o ওয়াক্‌ফ (وقف)- ১০২

www.amarboi.org

o ওয়াক্‌যাহ্ (وكذه)-ঘুষিমারা ১০৩
o ওয়াকালাহ্ (وكالة)-অভিভাবকত্ব/ প্রতিনিধিত্ব ১০৩
o ওয়াজহুন (وجه)-মুখমণ্ডল ১০৩
o ওয়াত্‌উন (وطء)-সহবাস করা ১০৪
o ওয়ালা (ولاء)-বন্ধুত্ব ১০৫
o ওয়ালাদ (ولد)-সন্তান ১০৭
o ওয়ালী (ولى)-অভিভাবক/ওলী ১০৮
o ওয়ালীমা (وليمة)-বিবাহ ভোজ ১০৮
o ওশর (عشر)- ১০৮
o ওয়াসিয়্যাত (وصية)-ওসিয়ত ১০৮
o ওয়াসী (وصى)-ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ১০৯

ক

o ক্বাওয়াদ (قود)-প্রতিশোধ গ্রহণ/কিসাস ১১২
o ক্বাত্‌ল (قتل)-হত্যা/মৃত্যুদণ্ড ১১২
o কাফন (كفن)-যে পোশাকে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় ১১২
o কাফ্‌ফারাহ্ (كفاره)-কাফ্‌ফারা/ প্রতিকার ১১২
o কাফায়াত (كفاءة)-সমতা ১১৩
o কাফির (كافر)-অমুসলিম ১১৩
o ক্বাবযুন (قبض)-হস্তগত হওয়া ১১৩
o কাবরুন (قبر)-কবর ১১৩
o কা'বা (كعبة)-বাইতুল্লাহ ১১৪
o কাযফ্ (قذف)-অপবাদ দেয়া/ গালি দেয়া ১১৪
o কাযা (قضاء)-বিচারফায়সালা করা ১১৬
o কার্‌য (قرض)-ঋণ/কর্জ দেয়া ১১৯
o ক্বারাবাহ্ (قرابة)-আত্মীয়তা ১২১
o ক্বারিনাহ (قرينة)-অনুসঙ্গ ১২১
o কালবুন (كلب)-কুকুর ১২১
o কালাম (كلام)-কথাবার্তা ১২১
o কাসবুন (كسب)-উপার্জন ১২১
o কাসামাহ্ (قسامة)-হত্যার দায় এড়ানোর শপথ ১২৩
o কিতাবিউন/কিতাবী (كتابى)-আহলে কিতাব ১২৩
o কিয়াম (قيام)-দাঁড়ানো ১২৪
o কিরান (قران)-একই ইহ্‌রামে হাজ্জ ও ওমরা পালন করা ১২৪
o কিরায (قراض)-অন্যের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করা ১২৪
o কিসাস (قصاص)-প্রতিশোধ ১২৪
o কুনূত (قنوت)-দু'আ কুনূত পড়া ১২৪
o কুফ্‌র (كفر)- ১২৪
o কুবলাহ্ (قبلة)-চুমো ১২৫
o কুরআন (قران)- ১২৫
o কুরু' (قرء)-ঋত অবস্থা/পবিত্রাবস্থা ১২৬
o কুসূফ (كسوف)-সূর্যগ্রহণ ১২৭
o কুহ্‌ল (كحل)-সুরমা ১২৭

খ

o খাইলুন (خيل)-ঘোড়া ১৩০
o খাতাম (خاتم)-আংটি ১৩০
o খামার (خمر)-মাদক দ্রব্য ১৩০
o খায্‌য (خز)-রেশম/রেশমী সুতো ১৩০
o খিত্‌বাহ্ (خطبة)-বিয়ের প্রস্তাব দেয়া ১৩০
o খিযাব (خضاب)-মেহেদী/হেয়ার ডাই ১৩১
o খিয়ার (خيار)-অবকাশ ১৩১
o খিলওয়াত (خلوه)-একান্ত নিরিবিলি ১৩৩
o খিলাফাত (خلافت)-প্রতিনিধিত্ব/ নেতৃত্ব ১৩৩
o খুতবা (خطبة)-বক্তৃতা ১৩৩
o খুলা' (خلع)-স্ত্রী কর্তৃক তালাক নেয়া ১৩৩
o খুসূমাহ্ (خصومة)-মোকদ্দমা/ আদালতে অভিযোগ ১৩৯

www.amarboi.org

গ

o গানিমাত (غنيمت)-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ১৪১
o গিনা (غناء)-গান/সংগীত ১৪৩
o গিয়াব (غياب)-অনুপস্থিতি ১৪৩
o গুস্‌ল (غسل)-গোসল ১৪৪

জ

o জাদ্দাতুন (جدة)-দাদী ১৪৮
o জাদ্দুন (جد)-দাদা ১৪৮
o জানাবাত (جنابة)-অপবিত্র অবস্থা/অপবিত্রতা ১৪৮
o জানাযা (جنازة)-লাশ/কফিন ১৪৮
o জানীন (جنين)-গর্ভস্থ সন্তান ১৪৯
o জামায়াত (جماعة)-ইমামের নেতৃত্বে নামায আদায় করা ১৪৯
o জাযা (جزاء)-বিনিময় ১৪৯
o জায়িহাহ্ (جائحة)-আসমানী বিপদ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১৪৯
o জাল্‌দ (جلد)-চাবুক/বেত ১৪৯
o জাহ্‌ল (جهل)-মূর্খতা/অজ্ঞতা ১৫০
o জি'আলাহ্ (جعالة)-পারিশ্রমিক/মজুরী ১৫০
o জিওয়ার (جوار)-নৈকট্য/প্রতিবেশীত্ব ১৫০
o জিনাইয়া (جناية)-অপরাধ ১৫০
o জিয্‌ইয়া (جزية)-জিযিয়া ১৬০
o জিহাদ (جهاد)- আল্লাহর পথে সংগ্রাম/লড়াই ১৬১
o জুনূন (جنون)-পাগলামী ১৬২
o জুম'আ (جمعة)-জুমার নামায ১৬৩
o জুলূস (جلوس)-বসা ১৬৩

ত

o তআম (طعام)-খাদ্য ১৬৬
o তইরুন (طير)-পাখী ১৬৬
o তাওবা (توبة)-অনুশোচনা/প্রত্যাবর্তন ১৬৬
o তাওয়াফ (طواف)-কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করা ১৬৭
o তাক্‌ফীন (تكفين)-কাফন পরানো ১৬৭
o তাকবীর (تكبير)-'আল্লাহু আকবার' বলা ১৬৭
o তাকবীল (تقبيل)-চুমো দেয়া ১৬৭
o তাকরার (تكرار)-বারবার করা ১৬৭
o তাকলীদ (تقليد)-(অমুসলিমদের) অনুকরণ করা ১৬৭
o তাকাল্লুম (تكلم)-কথাবার্তা বলা ১৬৮
o তাখলীল (تخليل)-খেলাল করা ১৬৮
o তাখাত্তুম (تختم)-আংটি পরা ১৬৮
o তাখাল্লী (تخلي)-মলত্যাগ করা/পায়খানায় যাওয়া ১৬৮
o তাগরীব (تغريب)-দেশ থেকে বহিষ্কার করা/নির্বাসন ১৬৮
o তাগলীয (تغليظ)-কঠিন করা/মজবুত করা ১৬৯
o তাগলীস (تغليس)-রাতের শেষভাগে কোনো কাজ করা ১৬৯
o তাতায়্যুব (تطيب)-সুবাসিত হওয়া/সুগন্ধি ব্যবহার ১৬৯
o তাতাব্বু' (تطوع)-অতিরিক্ত/নফল ১৬৯
o তাদবীর (تدبير)-মৃত্যুর পর গোলামকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়া ১৬৯
o তানফীল (تنفيل)-অতিরিক্ত দেয়া/পুরস্কার ১৬৯
o তানশীফ (تنشيف)-কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে শরীর মুছে শুকানো ১৭০
o তাফবীয (تفويض)-হস্তান্তর/ক্ষমতা প্রদান ১৭০
o তাফরীক (تفريق)-পৃথক করা ১৭০
o তাবযীর (تبذير)-অপব্যয় ১৭০
o তাবাররু' (تبرع)-নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দেয়া/দান ১৭০

www.amarboi.org

০ তামাত্তু' (تمتع)-কল্যাণ লাভ করা/ তামাত্তু হাজ্জ ১৭০
০ তাযায়্যুন (تزين)-সুন্দর করা/সাজানো ১৭১
০ তা'যীর (تعزير)-শাস্তি প্রদান ১৭১
০ তায়ামুন (تيامن)-ডান হাত দিয়ে করা ১৭৩
০ তার্‌কাহ্‌ (تركة)-মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ/মীরাস ১৭৩
০ তারতীব (ترتيب)-ধারাবাহিকতা ১৭৩
০ তা'রীফ (تعريف)-ঘোষণা করা ১৭৩
০ তা'রীয (تعريض)-কটাক্ষ করা/ প্রশ্ন উত্থাপন ১৭৩
০ তালকীন (تلقين)-শেখানো ১৭৩
০ তালবীয়া (تلبية)-সাড়াদান ১৭৪
০ তালাক (طلاق)-বিবাহ বিচ্ছেদ ১৭৪
০ তালাফুন (تلف)-নষ্ট করা/নষ্ট হওয়া ১৭৯
০ তাশাব্বাহ (تشبة)-অনুকরণ ১৭৯
০ তাসবীক (تسويك)-মিসওয়াক করা ১৭৯
০ তাসলীম (تسليم)-সালাম দেয়া ১৭৯
০ তাসাররুইউন (تسرى)-বাঁদীর সাথে সহবাস করা ১৭৯
০ তাহ্‌কীম (تحكيم)-ফায়সালা করা ১৮১
০ তাহ্‌দীদ (تهديد)-ভীতি প্রদর্শন করা ১৮১
০ তাহ্‌রীম (تحريم)-স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়া ১৮২
০ তাহ্‌লীল (تحليل)-হালাল করা ১৮২
০ তাহাল্লা/তাহাল্লী (تحلى)-সজ্জিত হওয়া/অলংকার পরা ১৮৪
০ তিজারাত (تجارات)-ব্যবসা ১৮৪
০ তিফলুন (طفل)-শিশু ১৮৪
০ তীব (طيب)-সুগন্ধি ১৮৪

দ

০ দাইন (دين)-ঋণ ১৮৭
০ দাওয়াত (دعوة)-অনুরোধ/দাওয়াত ১৮৭
০ দিয়াত (دية)-রক্তপণ ১৮৭
০ দীন (دين)-জীবন ব্যবস্থা ১৮৭
০ দু'আ (دعاء)- ১৮৭

ন

০ নাওম (نوم)-ঘুম ১৮৮
০ নাজাসাহ্‌ (نجاسة)-অপবিত্রতা/নাপাকী ১৮৮
০ নাফইউন (نفى)-বহিষ্কার করা/ নির্বাসন দেয়া ১৮৮
০ নাফিলাহ্‌ (نافلة)-অতিরিক্ত/নফল ১৮৮
০ নাবিয়্যুন (نبى)-নবী ১৮৮
০ নাবীয (نبيذ)-স্যুপ/ মিশ্র পানীয় ১৮৯
০ নারদুন (نرد)-পাশা খেলা/জুয়া খেলা ১৮৯
০ না'ল (نعل)-জুতা ১৮৯
০ নাসইয়াহ্‌ (نسية)-ধার/ঋণ ১৮৯
০ নাসাব (نسب)-বংশ প্রমাণিত হওয়া ১৮৯
০ নিকাহ্‌ (نكاح)-বিয়ে ১৯০
০ নিসাব (نصاب)- ১৯৪
০ নুকূল (نكول)-ভীতু হয়ে পড়া/ অস্বীকার করা ১৯৪

ফ

০ ফজর (فجر)-ফজর নামায/প্রভাত ১৯৬
০ ফাকরুন (فقر)-দারিদ্রতা ১৯৬
০ ফাতহু আলাল ইমাম ফিস্‌ সালাত (الفتح على الامام فى الصلوة)-ইমামকে লোকমা দেয়া ১৯৬
০ ফারাইয (فرائض)-উত্তরাধিকার আইন ১৯৬
০ ফালাস (فلس)-নিঃস্ব/দেওলিয়া ১৯৬
০ ফিদা (فداء)-ফিদইয়া ১৯৭
০ ফিদ্দাহ্‌ (فضة)-রূপা ১৯৭
০ ফিস্‌ক (فسق)-কবীরাহ গুনায় লিপ্ত হওয়া ১৯৭

www.amarboi.org

ব

০ বাইতুন (بيت)–ঘর/বাড়ি ১৯৮
০ বাইতুল মাল (بيت المال)–ট্রেজারী ১৯৮
০ বাকার (بقر)– গাভী/গরু ১৯৮
০ বায়' (بيع)–বেচাকেনা ১৯৯
০ বাসমালাহ্ (بسملة)–'বিসমিল্লাহ' বলা বা লিখা ২০৩
০ বাহীমাহ (بهيمة)–চতুষ্পদ প্রাণী ২০৩
০ বিত্‌র (وتر)–বিজোড়/বিতর নামায ২০৩
০ বিদ'আত (بدعت)– ২০৩
০ বিলাইয়াহ্ (ولاية)–অভিভাবকত্ব ২০৪
০ বিরুন (بئر)–কূপ/কুয়া ২০৪
০ বুলূগ (بلوغ)–প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ২০৪

ম

০ মযী (مذى)–লজ্জাস্থান দিয়ে নির্গত আঠালো পদার্থ ২০৭
০ মাওত (موت)–মৃত্যু ২০৮
০ মাক্কাহ্ (مكه)–মক্কা ২০৮
০ মাগরিব (مغرب)–মাগরিবের নামায ২০৯
০ মাজনূন (مجنون)–পাগল ২০৯
০ মাজূস (مجوس)–অগ্নি উপাসক ২০৯
০ মান্নুন (من)–অনুগ্রহ/উপকার ২০৯
০ মানিয়্যুন (منى)–শুক্র/বীর্য/মনী ২০৯
০ মাফকূদ (مفقود)–নিখোঁজ ব্যক্তি ২১০
০ মাযমাযাহ (مضمضة)–কুলি করা ২১০
০ মারআহ্ (مرأة)–মহিলা/স্ত্রীলোক ২১০
০ মারায (مرض)–অসুখ/অসুস্থতা ২১১
০ মাসজিদ (مسجد)–মসজিদ ২১১
০ মাসলাহাত (مصلحة)–স্বার্থ/কল্যাণ ২১৩
০ মাহ্‌র (مهر)–দেনমোহর/মোহরানা ২১৩
০ মীকাত (ميقات)–ইহ্‌রাম বাধার স্থান ২১৩
০ মুকাতাব (مكاتب)–মুক্তি চুক্তিকৃত গোলাম ২১৩
০ মুদাব্বার (مدبر)–এক শ্রেণীর গোলাম ২১৩
০ মুফলিস (مفلس)–নিঃস্ব/দেওলিয়া ২১৩
০ মুফাওয়াযাহ্ (مفوضة)–তালাক গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলা ২১৩
০ মুযদালিফা (مدلفة)–একটি স্থানের নাম ২১৩
০ মুযারা'আহ্ (مزارعة)–বর্গাচাষ ২১৩
০ মুযারাবা/মুদারাবা (مضاربة)– অংশীদার কারবার ২১৪
০ মূযিহা (موضحة)–গুরুতর জখম ২১৩
০ মুয়াল্লিফাতু কুলুবুহুম (المولفة قلوبهم)– হৃদয় আকৃষ্ট করা ২১৪
০ মুরাবাহাত (مرابحة)–লভ্যাংশ বণ্টনের ভিত্তিতে ব্যবসা ২১৪
০ মুশা' (مشاع)–সাধারণ/ একাধিক মালিকানাধীন বস্তু ২১৪
০ মুহাল্লিল (محلل)–তাহ্‌লীলকারী/যে অন্যের স্ত্রীকে হালাল করে দেয় ২১৪

য

০ যফার (ظفر)–নখ ২১৬
০ যাওজ (زوج)–স্বামী ২১৬
০ যাওয়ায়িদ (زوائد)– ২১৬
০ যাকাত (زكاة)– ২১৬
০ যাকাতুল ফিত্‌র (زكوة الفطر)– সাদকাতুল ফিত্‌র/ফিতরা ২১৯
০ যাবিল আরহাম (ذوى الارحام)– ২২০
০ যামান (ضمان)–ক্ষতিপূরণ ২২০
০ যারবুন (ضرب)–আঘাত ২২১
০ যারূরাহ্ (ضرورة)–প্রয়োজন/জরুরত ২২২
০ যাহাব (ذهب)–সোনা ২২২
০ যিকরুল্লাহি তা'আলা (ذكر الله تعالى)– আল্লাহর স্মরণ/আল্লাহর যিকির ২২২

www.amarboi.org

o যিনা (زنا)-ব্যভিচার/অবৈধ যৌন সম্ভোগ২২২
o যিবদা (ضبدع)-ব্যাঙ ২২৪
o যিম্মী (ذمی)-নিরাপত্তা প্রাপ্ত মুসলিম নাগরিক ২২৪
o যিহার (ظهار)-স্ত্রীকে মুহাররাম মহিলার সাথে তুলনা দেয়া ২২৪
o যুহর (ظهر)-যোহর নামায ২২৫

র

o রজম (رجم)-পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড ২২৭
o রদ (رد)-পুনরাবৃত্তি/প্রত্যাবর্তিত হওয়া ২২৭
o রমল (رمل)-তাওয়াফের সময় কাধ উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলা ২২৭
o রাজা'আত (رجعت)-তালাক প্রত্যাহার করা ২২৭
o রাযা'আত্ (رضاعة)-স্তন্যদান/দুধ পান করানো ২২৮
o রা'স (راس)-মাথা ২২৮
o রাহিম (رحم)-আত্মীয়তা ২২৮
o রিক্‌কুন (رق)-দাসত্ব ২২৯
o রিজলুন (رجل)-পা/পায়ের পাতা থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ ২৩৬
o রিদ্দাহ (ردة)-ফিরে যাওয়া/পরিত্যাগ করা/মুরতাদ হওয়া ২৩৬
o রিবা (ربا)-অতিরিক্ত/সূদ ২৩৬
o রুইয়া (رؤيا)-স্বপ্ন ২৩৮

ল

o লাহ্‌ভুন (لهو)-খেলাধুলা ২৪১
o লিওয়াতাত (لواطة)-সমকাম/পুংমৈথুন ২৪১
o লিবাস (لباس)-পোশাক-পরিচ্ছদ ২৪২
o লিহ্‌ইয়াহ (لحية)-দাড়ি ২৪২
o লুকতাহ্ (لقطة)-হারানো বস্তু প্রাপ্তি ২৪২

শ

o শাইবুন (شيب)-বার্ধক্য ২৪৬
o শাক্‌কুন (شك)-সন্দেহ/সন্দিহান হওয়া ২৪৬
o শাতাম (شتم)-গালি দেয়া/মন্দ বলা ২৪৬
o শার্‌ত (شرط)-শর্ত ২৪৬
o শা'রুন (شعر)-চুল/লোম ২৪৮
o শাহাদাত (شهادة)-সাক্ষ্য ২৪৮
o শির্‌ক (شرك)-বহু ঈশ্বরবাদ/ Pohytheirm ২৫১
o শিরকা/শরিকা (شركة)-অংশীদারকারবার ২৫১
o শিবহুল আমাদ (شبه العمد)- ২৫১
o শুফ'আ (شفعة)-ক্রয়ের অগ্রাধিকার ২৫১
o শুরুবুন (شرب)-পান করা ২৫২
o শূরা (شورى)-পরামর্শ দান/ উপেদেষ্টা পরিষদ ২৫২

স

o সগীরুন (صغير)-শিশু-কিশোর/ নাবালেগ ২৫৪
o সবগুন (صبغ)-রঙ করা ২৫৪
o সবিয়্যুন (صبى)-শিশু ২৫৪
o সাইদ (صيد)-শিকার ২৫৪
o সাঈ (سعى)-সাফা-মারওয়া দৌড়ানো ২৫৫
o সাদাকাহ্ (صدقة)-দান-সদকা ২৫৫
o সাদাকাতুল ফিতর (صدقة الفطر)-ফিতরা ২৫৫
o সাফার (سفر)-সফর/ভ্রমণ ২৫৫
o সাফাহ (سفه)-বোকামী/নির্বুদ্ধিতা ২৫৮
o সাব্বুন (سب)-গালি গালাজ ২৫৮
o সাবিয়্যুন (سبى)-কয়েদী/বন্দী ২৫৮
o সামহাক্ব (سمحاق)-মাথার এমন ক্ষত যাতে হাড়ের কাছের ঝিল্লি দেখা যায় ২৫৮

www.amarboi.org

o সিরকাহ্ (سرقة)-চুরি ২৫৮
o সালাত (صلوة)-নামায ২৬১
o সালাম (سلام)-সম্ভাষণ ২৭৪
o সায়িল (صائل)-আক্রমণকারী ২৭৫
o সিওয়াক (سواك)-মিসওয়াক ২৭৫
o সিদাক/সাদাক (صداق)- দেন মোহর/ মোহরানা/মোহর ২৭৫
o সিয়াম (صيام)-রোযা ২৭৫
o সিয়াল (صيال)-যুদ্ধের হুমকী দেয়া/ আক্রমণ করা ২৭৭
o সিরাইয়াহ্ (سراية)-অনুপ্রবেশ/বিস্তৃতি লাভ করা ২৭৮
o সিহ্‌র (سحر)-যাদুটোনা ২৭৮
o সুকরন (سكر)-নেশা/মাতলামী ২৭৮
o সুজূদ (سجود)-সিজদা ২৭৯
o সুত্‌রা (سترة)-আড়াল ২৮১
o সুবহ (صبح)-সকাল/প্রভাত ২৮১
o সুলহ্ (صلح)-সন্ধি/আপোষ চুক্তি ২৮১
o সূরাহ্ (صورة)-ছবি/চিত্র/প্রতিকৃতি ২৮২

হ

o হাইওয়ান (حيوان)-প্রাণী/জীব/পশু ২৮৭
o হাওয়ালা (حوالة)-দায় অর্পণ ২৮৮
o হাজব (حجب)-উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া ২৮৮
o হাজর (حجر)-বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ২৮৮
o হাজ্জ (حج)-হাজ্জ ২৯০
o হাজামাহ্ (حجامة)-শিঙ্গা লাগানো ২৯৪
o হাদ (حد)-শাস্তি ২৯৪
o হাদাস (حدث)-অপবিত্রতা/ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া/নতুনত্ব ২৯৯
o হাদিয়্যাহ্ (هدية)-দান/উপহার ২৯৯
o হাদীস (حديث)- ২৯৯
o হাবাল (حبل)-গর্ভ/ভ্রূণ ২৯৯
o হামাল (حمل)-গর্ভ/গর্ভের ভ্রূণ ২৯৯
o হামাম (حمام)-কবুতর ৩০০
o হাম্মাম (حمّام)-গোসলখানা/সুইমিং পুল ৩০১
o হামীল (حميل)-সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করা ৩০১
o হায়িয (حيض)-ঋতুস্রাব/মাসিক ৩০১
o হারবী (حربي)-সামরিক/মুসলিম দেশের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম ৩০২
o হারাম (حرام)-নিষিদ্ধ/সম্মানিত ৩০২
o হারাম (حرم)-পবিত্র স্থান/মক্কা ও মদীনার সংরক্ষিত স্থান ৩০২
o হালয়ুন (حلي)-অলংকার/গহনা/ কারুকাজ ৩০২
o হিজরত (هجرة)-নিজ দেশ ছেড়ে অন্যদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত ৩০৩
o হিজা (هجاء)-নিন্দা করা/ব্যঙ্গ করা/ বানান করা ৩০৩
o হিদাদ (حداد)-শোক পালন/শোক বস্ত্র ৩০৩
o হিবা (هبة)-দান/উপহার ৩০৩
o হিমা (حمى)-চারণভূমি ৩০৪
o হিরফাহ্ (حرفة)-পেশা/বৃত্তি ৩০৫
o হিরয্ (حرز)-সুরক্ষিত জায়গা/দূর্গ/ গোডাউন ৩০৫

www.amarboi.org

আ

আইনুন (عين)–চোখ

দু' চোখের দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি লোপ পাওয়াকে আ'মা বলে। ফিক্হী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিশেষ কিছু প্রভাব ও পরিণতি রয়েছে।–('আ'মা' শিরোনাম দেখুন)

–এক চোখে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়াকে পারিভাষিক অর্থে 'আওয়ার (عور) বলে। ফিক্হী দৃষ্টিকোণ থেকে এরও কিছু প্রভাব ও পরিণতি রয়েছে।–('আওয়ার' শিরোনাম দেখুন)

–চোখ ক্ষতিগ্রস্ত করার মত অপরাধ।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

আওরাহ (عورة)–সতর/শরীরের গোপন অংশ

১. সংজ্ঞা

'আওরাহ' বলতে শরীরের সেই অংশকে বুঝায় যা অন্য কারো সামনে খোলা নিষিদ্ধ এবং যা সর্বদা ঢেকে রাখা প্রয়োজন। (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষদের সতর এবং মুখমণ্ডল, দু' হাতের পাঞ্জা এবং দু' পায়ের পাতা ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত শরীর মহিলাদের সতরের অন্তর্ভুক্ত)।

২. শরীরের গোপন অংশ অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা

কারো শরীরের গোপন অংশের প্রতি অন্য কারো তাকানো জায়েয নয়। এমনকি নিজ স্ত্রীর বাঁদী সেও তার জন্য অপরিচিত জনের অন্তর্ভুক্ত। তাই স্ত্রীর বাঁদীর শরীরের গোপন অংশ দেখা তার জন্য জায়েয নয় এবং সেই বাঁদীও তার মনিবের স্বামীর শরীরের গোপন অংশের দিকে তাকাতে পারবে না। হযরত ওসমান (রা)-এর স্ত্রীর বাঁদী বানানাহ্ বর্ণনা করেছেন—'ওসমান (রা) যখন কোনো কাপড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোসল করতেন তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলতেন, 'তুমি কিন্তু আমার দিকে তাকাবে না, কারণ আমার নগ্ন শরীর দেখা তোমার জন্য জায়েয নেই।"[১] তবে একান্ত প্রয়োজনে কেউ কারো সতরের দিকে তাকাতে পারে। সেই প্রয়োজনের মধ্যে নিচের কাজগুলোও পড়ে। যেমন—বালেগ হয়েছে কিনা তার সত্যতা যাচাই করতে কোনো ছেলে কিংবা মেয়ের লজ্জাস্থানের লোম গজিয়েছে কিনা তা দেখা জায়েয। কেননা লজ্জাস্থানের লোম গজানো বালিগ হওয়ার লক্ষণ। হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট একবার এক বালককে হাজির করা হলো, যে চুরির অপরাধে ধরা পড়েছিলো। তিনি বললেন ঃ তার লজ্জাস্থান দেখো সেখানে লোম গজিয়েছে কিনা ? দেখা গেলো তখনো তার লজ্জাস্থানের লোম গজায়নি। ফলে তাকে নাবালেগ গণ্য করে তার হাত কাটা রহিত করা হলো।[২]

আ'ওয়ার (أعور)–একচোখ অন্ধ এমন ব্যক্তি

১. সংজ্ঞা

'আওয়ার' শব্দ দিয়ে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার এক চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। যিনি শুধু এক চোখ দিয়ে দেখে থাকেন।

www.amarboi.org

২. চাঁদ দেখার ব্যাপারে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য

হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন—এক চোখ অন্ধ ব্যক্তি পাতলা জিনিস যেমন প্রথম তারিখের চাঁদ ইত্যাদি ভালো মত দেখতে পান না সে জন্য তিনি চাঁদ দেখার ব্যাপারে এমন ব্যক্তির একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। এ কারণে তিনি হাশিম ইবনু ওতবা যিনি এক চোখে দেখতেন রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে অন্য কোনো সাক্ষ্য ছাড়া তার একক সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।[৩]

৩. এক চোখ অন্ধ এমন ব্যক্তির অপরাধের শাস্তি

[৩.১] এক চোখ অন্ধ এমন ব্যক্তি যদি দুচোখ ভালো এমন ব্যক্তির একটি চোখ নষ্ট করে দেয়, তো তার থেকে কিসাস নেয়া যাবে না। কারণ কিসাস নিতে গেলে তার পুরো দৃষ্টিশক্তিই নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য কথায় এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা মানে তার দু'টো চোখই নষ্ট করে দেয়া। এজন্য কিসাসের পরিবর্তে তাকে পূর্ণ 'দিয়াত' প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ তাকে একশো উট প্রদান করতে হবে। হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এমন একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। এক চোখ অন্ধ ব্যক্তি যার দুচোখ ভালো এমন ব্যক্তির একটি চোখ নষ্ট করে দেয়। এ মামলায় তিনি কিসাস নেয়ার পরিবর্তে পূর্ণ দিয়াত আদায়ের নির্দেশ দেন।[৪] এবং বলেন—যদি এক চোখ অন্ধ কোনো ব্যক্তি দুচোখ ভালো এমন কোনো ব্যক্তির একটি চোখ নষ্ট করে দেয় তাহলে তার থেকে পূর্ণ দিয়াত আদায় করা হবে।[৫]

[৩.২] আবার দুচোখই ভালো, এমন ব্যক্তি যদি এক চোখ ভালো এমন কোনো ব্যক্তির সেই চোখটি নষ্ট করে দেয়, এমতাবস্থায়ও কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। বরং তার থেকেও পূর্ণ দিয়াত আদায় করতে হবে। কারণ তার একটি চোখ দু'টো চোখের স্থলাভিষিক্ত। এজন্য হযরত ওসমান (রা) এক চোখ অন্ধ ব্যক্তির মোকদ্দমায় এক চোখ নষ্টের জন্য পূর্ণ দিয়াত আদায় করার রায় দিয়েছিলেন।[৬]

আখুন (أخ)—ভাই

উত্তরাধিকার আইনে ভাইদের অংশ।-(ইর্‌ছ শিরোনাম দেখুন)

আছার (آثار)—নিদর্শন/স্মৃতিচিহ্ন

আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের স্মৃতিচিহ্নের হিফাযত করা এবং সে জন্য অর্থ সম্পদ খরচ করা শরঈ দাবীসমূহের মধ্যে অন্যতম দাবী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সীলে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' (محمد رسول الله)-খোদাই করা ছিলো। যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন তা আবু বকর (রা)-এর হস্তগত হয়। আজীবন তাঁর নিকটই ছিলো। তিনি ইন্তিকাল করলে খিলাফতের উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সীলটি হযরত ওমর (রা)-এর নিকট চলে আসে। তিনি ইন্তিকাল করার পর সেটি তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা)-এর হস্তগত হয়। তার থেকে হিজরী ৩০ সনে তা 'আরীস' নামক কূপে পড়ে যায়। এ কূপটি মদীনা থেকে দু' মাইল দূরে অবস্থিত ছিলো। হযরত ওসমান (রা) সীলটি খুঁজেছিলেন কিন্তু পাননি। তা পুনরুদ্ধারের জন্য উল্লেখযোগ্য টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু সেই সীলের কোনো হদিসই আর পাওয়া যায়নি।[৭]

www.amarboi.org

আতাউন (عطاء)—অনুদান/ভাতা

১. সংজ্ঞা

'আতাউন' বলতে সেই ভাতা বা অনুদানকে বুঝায় যা ইসলামী রাষ্ট্রের 'ফাই'-এর খাত থেকে কোনো শহর বা এলাকার জন্য বরাদ্ধ দেয়া হয়।

২. বিভিন্ন শহরের জন্য অনুদান বা ভাতা বরাদ্দ করা

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ফাই থেকে বণ্টনের সময় দাস-দাসী সহ সকলের জন্যই সমান অংশ বরাদ্দ করতেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে বলতেন—হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা ! যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে দীনের জন্য ঘর বাড়ি ছেড়েছে আর যারা বাধ্য হয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে, সবার জন্য কি আপনি সমান হারে বরাদ্দ দিচ্ছেন ? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) উত্তর দিতেন—'তারা যাকিছু করেছেন, তা আল্লাহর জন্যই করেছেন। তার বিনিময় আল্লাহর কাছে অবশ্যই পাবেন। এতো দুনিয়ার সম্পদ এতে সকলের সমান অংশ হওয়া উচিত।

কিন্তু যখন হযরত ওমর (রা) খলীফা হোন তখন তিনি 'ফাই' থেকে অনুদান ও ভাতার জন্য লোকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন। নিচে তাঁর শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

প্রথম শ্রেণী ঃ এ শ্রেণীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটতম আত্মীয়দেরকে শামিল করা হয়েছিলো। এবং যারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যের কারণে উচ্চ মর্যাদা রাখতেন তাদেরকে ফাই থেকে অংশ প্রদানের ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেয়া হতো।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া (রা) ও উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া (রা) ছাড়া অবশিষ্ট সকল উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে বারো হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিলো। আর সাফিয়া (রা) ও জুয়াইরিয়া (রা)-এর জন্য বরাদ্দ ছিলো দু' হাজার দিরহাম করে। অন্য এক বর্ণনায় আছে—হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা)-এর জন্য বারো হাজার দিরহাম, সাফিয়া (রা) ও জুয়াইরিয়া (রা) উভয়ের জন্য ছ' হাজার দিরহাম করে এবং অবশিষ্ট উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য দশ হাজার দিরহাম করে ভাতা বরাদ্দ করা হয়েছিলো।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ বদর যুদ্ধে যেসব সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এ শ্রেণী আবার দু' ভাগে বিভক্ত ছিলো। এক ভাগে ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এমন মুহাজির সাহাবীগণ। তাদেরকে হযরত ওমর (রা) বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম করে ভাতা দিতেন। অন্য বর্ণনা মতে তাদেরকে বার্ষিক দু' হাজার দিরহাম করে দেয়া হতো।

অপর ভাগে ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ। তাদের জন্য বার্ষিক ভাতা বরাদ্দ ছিলো চার হাজার দিরহাম।

www.amarboi.org

চতুর্থ শ্রেণী ঃ যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এরূপ মুহাজির সাহাবীদেরকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। তাদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক চার হাজার দিরহাম ভাতা বরাদ্দ করা হয়েছিলো।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ এ শ্রেণীতে শামিল ছিলেন সেসব আনসার সাহাবী, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি কিন্তু পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক তিন হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো।

ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ যেসব সাহাবী হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। তাদের প্রত্যেকের জন্য দু' হাজার দিরহাম করে ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিলো।

সপ্তম শ্রেণী ঃ যেসব সাহাবী কাদিসিয়া ও ইয়ারমুকসহ পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক দেড় হাজার দিরহাম করে ভাতা বরাদ্দ করা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে যারা বিশেষ দায়িত্ব পালন করতেন তাদেরকে বার্ষিক দু' হাজার দিরহাম করে ভাতা দেয়া হতো।

এছাড়াও তিনি বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বিশেষ কারণে বিভিন্ন পরিমাণ ভাতা ও অনুদান প্রদান করতেন।[৮]

হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে আমি এমন কোনো বর্ণনা পাইনি, যাতে বুঝা যায় তিনি হযরত ওমর (রা)-এর শ্রেণী বিন্যাসে কোনোরূপ পরিবর্তন করেছিলেন। যদি তিনি কোনো পরিবর্তন করেই থাকতেন তাহলে অবশ্যই সেই বর্ণনা আমাদের নিকট কোনো না কোনোভাবে পৌঁছুতো।

৩. নবজাতক শিশুর ভাতা

হযরত ওসমান (রা) এবং তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা হযরত ওমর (রা) জন্ম তারিখ থেকেই নবজাতকের ভাতা প্রদান করতেন। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভাতার পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়া হতো। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর কার্যবিবরণী সংক্রান্ত যেসব বর্ণনা আমরা পেয়েছি তা থেকে জানা যায়—তিনি নবজাতক শিশুর জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ দিরহাম করে ভাতা নির্ধারিত করেছিলেন। শিশুর বয়স এক বছর পূর্ণ হলে ভাতা বাড়িয়ে একশ' দিরহাম করতেন। আবু উবাইদ তাঁর কিতাবুল আমওয়ালে বর্ণনা করেছেন—এক মহিলা হযরত ওসমান (রা)-এর বাড়িতে আসতেন। একদিন তাকে দেখতে না পেয়ে ওসমান (রা) বাড়িতে জিজ্ঞেস করলেন—সেই মহিলাকে তো দেখছি না? স্ত্রী জবাব দিলেন—তার তো গতকাল একটি ছেলে হয়েছে। তাই আসতে পারেননি। সেই মহিলা নিজেই বলেছেন—হযরত ওসমান (রা) আমার ব্যাপারে জানতে পেরে কাপড়ের একটি লম্বা টুকরা এবং পঞ্চাশটি দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেন এগুলো আপনার ছেলের ভাতা ও কাপড়। তার বয়স যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন ভাতা বাড়িয়ে একশ' দিরহাম করে দেবো।[৯]

আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন—আমার দাদা একদিন হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বংশধারা কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে? তিনি উত্তর

www.amarboi.org

দিলেন—আমার বংশের সদস্য সংখ্যা এতো। তখন ওসমান (রা) বললেন—তোমাকে তো ভাতা হিসেবে এতো দেয়া হয়। আর তোমার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য একশ' দিরহাম করে।

৪. গোলামের ভাতা

হযরত ওমর (রা)-এর মতো হযরত ওসমান (রা)ও গোলামের জন্য কোনো ভাতা নির্ধারণ করেননি। তবে তাদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বাইতুলমাল থেকে দেয়া হতো। হযরত ওসমান (রা)-এর সময় বাইতুলমালের (অর্থ মন্ত্রণালয়ের) দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)-এর ওপর। একদিন হযরত ওসমান (রা) বাইতুলমাল পরিদর্শনে গেলেন। দেখলেন এক গোলাম তাঁকে সাহায্য করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—সে কে? যায়িদ (রা) বললেন—ও আমার গোলাম। তিনি বললেন—যেহেতু তুমি এর সহযোগিতা নিচ্ছো তাই একে দু' হাজার দিরহাম করে ভাতা দিয়ো। যায়িদ (রা) তাকে এক হাজার দিরহাম করে ভাতা দিতেন, একথার পর তিনি তা বাড়িয়ে দু' হাজার দিরহাম করে দিলেন।[১০]

হারূন ইবনু আনতারা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন—তিনি জনসাধারণের মালিকানাধীন গোলামের জন্য হযরত ওসমান (রা)-কে ভাতা নির্ধারণ করতে দেখেছেন।[১১]

৫. আমীরুল মুমিনীন, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাতা

হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন যদি আমীরুল মুমিনীন সচ্ছল হন তাহলে বাইতুলমাল থেকে তাঁর ভাতা গ্রহণ না করা উচিত। তিনি নিজেও কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না।[১২]

-গোলামের ভাতা সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি সরকারী কাজে অংশগ্রহণের জন্য তিনি গোলামকে ভাতা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। (এ থেকে বুঝা যায় সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যও তিনি ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন।-(অনুবাদক)

৬. বিভিন্ন কারণে ভাতার অতিরিক্ত প্রদান

হযরত ওমর (রা)-এর মত হযরত ওসমান (রা)ও বিশেষ কারণে ও সময়ে বাইতুলমাল থেকে নির্দিষ্ট ভাতার চেয়ে অতিরিক্ত প্রদান করতেন। যেমন রমযান মাস এলে হযরত ওমর (রা) ইফতারীর জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে নির্দিষ্ট ভাতার অতিরিক্ত প্রতি দিন এক দিরহাম করে প্রদান করতেন। আর উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য প্রতিদিন দু দিরহাম করে অতিরিক্ত প্রদান করতেন। পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা) তাঁর পূর্বসূরীর এ কার্যক্রমকে শুধু বহালই রাখেননি বরং তিনি আরো বেশী দেয়ার চেষ্টা করেছেন।[১৩]

৭. ভাতা বৃদ্ধি

হযরত ওসমান (রা) ভাতা প্রদানের ব্যাপারে আবু বকর (রা)-এর নীতি অবলম্বন না করে তিনি হযরত ওমর (রা)-এর নীতিকে অবলম্বন করেছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, বাইতুল মালের আমদানি বেড়ে গেলেও তিনি অতিরিক্ত প্রদান করতেন না। ইনসাফের দাবী হচ্ছে—সম্পদ আল্লাহর দান আর সেই দান পাবার বেশী হক তো তাঁর বান্দাদেরই। এই সূত্রের ভিত্তিতে তিনি সৈন্যদের ভাতা বার্ষিক একশ' দিরহাম করে বাড়িয়ে দিতেন।[১৪]

৮. ওয়ারিশদের কাছে ভাতা হস্তান্তর

হযরত ওসমান (রা)-এর নীতি ছিলো তিনি বছরের শেষ দিকে নির্দিষ্ট ভাতা প্রদান করতেন। যদি এমন হতো যে, কারো জন্য ভাতা নির্দিষ্ট ছিলো কিন্তু তিনি বছরের মাঝামাঝি

www.amarboi.org

মারা গেলেন। এমতাবস্থায় তিনি তার ওয়ারিশদেরকে সেই বছরের ভাতা দিয়ে দিতেন। তাঁরই সময়ের ঘটনা—হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) ইন্তিকাল করলেন। তখন যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—ইবনু মাসউদ (রা)-এর ভাতা আমাকে দিন। তার পরিবার পরিজনই সেই ভাতার অধিক হকদার। তখন হযরত ওসমান (রা) তাকে পনেরো হাজার দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দিলেন।[১৫]

৯. ভাতা থেকে যাকাত গ্রহণ

'যাকাত' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

আতীয়্যাহ্ (عطية)—দান

আতীয়্যাহ্ বলতে কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ ছাড়া কাউকে আজীবনের জন্য কোনো জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়াকে বুঝায়। এ শব্দটির মধ্যে 'হিবা' ও 'সাদাকাহ'ও শামিল।

—(বিস্তারিত দেখুন 'হিবা' ও 'সাদাকাহ' শিরোনাম)

আবদুন (عبد)—দাস

আব্দ বা দাস বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন।

আবুন (اب)—পিতা

–জিহাদের জন্য পিতামাতার অনুমতি নেয়া।–('ইস্‌তিযান' শিরোনাম দেখুন)

–পিতার পক্ষ থেকে পুত্রকে দান করা।–('হিবা' ও 'ইশহাদ' শিরোনাম দেখুন)

–পিতা অভিভাবক হিসেবে সন্তানের পক্ষ থেকে দান গ্রহণ করতে পারেন।–('হিবা' শিরোনাম দেখুন)

–উত্তরাধিকারী হিসেবে পিতার অংশ।–('ইর্‌ছ' শিরোনাম দেখুন)

–সন্তানের বংশ পরিচয় পিতার দিক থেকে হওয়া।–('নসব' শিরোনাম দেখুন)

–পিতা যদি সন্তানকে কিছু দান করতে চান তাহলে সব সন্তানকে সমানভাবে দান করতে হবে।–('হিবা' শিরোনাম' দেখুন)

–পিতার বিবাহিত স্ত্রী, পুত্রের জন্য হারাম।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–কন্যার বিয়েতে পিতার অনুমোদন প্রয়োজন।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–প্রতারণার শিকার হয়ে কারো মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করার পর সেই বাঁদীর গর্ভে সন্তান হলে বাঁদীর মালিককে ফিদ্‌ইয়া দিয়ে সন্তানকে মুক্ত করা।–('ইসতিহ্‌কাক' শিরোনাম দেখুন)

–পিতার ওপর নির্ভরশীল পুত্রের পক্ষ থেকে পিতা কর্তৃক সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা।–('যাকাতুল ফিতর' শিরোনাম দেখুন)

–গোলাম বাঁদী বিক্রি কিংবা দান করার সময় পিতামাতা থেকে সন্তানকে পৃথক না করা।–('রিক্‌কুন' শিরোনাম দেখুন)

আ'মা (اعمى)—অন্ধ/দৃষ্টিহীন

১. সংজ্ঞা

আ'মা বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায় যার উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

www.amarboi.org

২. অন্ধত্বের প্রভাব।

[২.১] **অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য ঃ** হযরত ওসমান (রা) চাঁদ দেখা সম্পর্কে এক চোখ অন্ধ এমন ব্যক্তির (একক) সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না, যতোক্ষণ দ্বিতীয় কোনো সাক্ষ্য না পেতেন।[১৬] কারণ তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। অথচ চাঁদ দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়া উচিত। যদি একচোখ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে দু' চোখ যার প্রায় অন্ধ তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ারতো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

[২.২] **অন্ধ ব্যক্তির অপরাধের বিধান ঃ** যদি অন্ধ ব্যক্তির দ্বারা ভুলে তার পথপ্রদর্শক কিংবা তার কোনো সাথীর ক্ষতি হয়ে যায় সেজন্য তার থেকে কিসাস বা দিয়াত গ্রহণ করা যাবে না। কারণ অন্ধ ব্যক্তির মর্যাদা তার পথপ্রদর্শকের কাছে হাতের যন্ত্রের মত। তেমনিভাবে সাথী বা কাছে বসা ব্যক্তি যদি ভুলবশত অন্ধ ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা করেন, তাহলে তার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এতে তিনি বেঁচে যেতে পারেন কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে এ অনিচ্ছাকৃত কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এজন্যই হযরত ওসমান (রা) বলেছেন— কোনো ব্যক্তি যদি অন্ধলোকের নিকট বসে এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেজন্য অন্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে কিসাস বা দিয়াত গ্রহণ করা হবে না।[১৭]–(আরো জানার জন্য দেখুন, 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম)

আ'যল (عزل)—জরায়ুর বাইরে বীর্যপাত

১. সংজ্ঞা

আযল বলতে বুঝায় যাতে গর্ভ সঞ্চার না হয় সেজন্য বীর্য জরায়ুতে পৌঁছুতে বাধা প্রদান করা।

২. আযলের বৈধ-অবৈধতা

হযরত ওসমান (রা) আযলকে মাকরূহ মনে করতেন।[১৮] কারণ এর পরিণতিতে মানুষের জন্মহার হ্রাস পায়।

আযলুন (عضل)—বলপ্রয়োগ করা/বাধা দেয়া

–কোনো মহিলার বিয়েতে অভিভাবক কর্তৃক বাধা প্রদান করাকে 'আযলুন' বলে।

–যদি কোনো মহিলার নিকটতম অভিভাবক তার বিয়েতে বাধা প্রদান করে তাহলে ঐ মহিলার অভিভাবকত্ব প্রশাসকের নিকট পরিবর্তন হয়ে যায়।

আযহিয়্যাহ্ (اضحية)—কুরবানী

১. সংজ্ঞা

আযহিয়্যাহ্ বলতে বুঝায় পশু যবাহ্ করা। অর্থাৎ কুরবানীর নির্দিষ্ট দিনে কুরবানীর সুন্নাত আদায়ের জন্য কোনো পশু যবেহ্ করা।

২. যিনি কুরবানী করবেন তার চুল ও নখ না কাটা

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ) সাহাবা কিরাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি কুরবানীর পশু কিনবেন, তার উচিত হাজ্জের চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানীর দিন পর্যন্ত চুল নখ কাটা

৫—

www.amarboi.org

থেকে বিরত থাকা। ইমাম ইবনু হাযাম আল মুহাল্লীতে বলেন—ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু ইয়ামির খুরাসানে এ ফাতওয়া দিতেন, যখন কোনো ব্যক্তি কুরবানীর পশু কিনবেন তিনি যেন হাজ্জের মাসের প্রথম দশ দিন (কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত) চুল নখ কাটা থেকে বিরত থাকেন। সাঈদ ইবনু আবী আরূবাহ্ (যিনি বর্ণনাকারী) বলেছেন—কাতাদা বলেন, আমি একথা সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—হে আবু মুহাম্মদ ! আপনি একথা কার সূত্রে বলেন ? তিনি বললেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূত্রে। ইবনু হাযম (রহ) বলেছেন—প্রখ্যাত কোনো সাহাবী একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি।[১৯]

৩. কুরবানীর বিধান

হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন। কুরবানী করা সুন্নাত। সাহাবা কিরাম (রা) থেকে এমন কথা প্রমাণিত নেই যে, তাদের কেউ কুরবানী করাকে বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) মনে করেছেন।[২০]

৪. উট ও গরু কুরবানী

সাহাবা কিরাম এ সম্পর্কে সবাই একমত ছিলেন, একটি ছাগল মাত্র এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। আর একটি গরু কিংবা একটি উট সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। ইবরাহীম নখঈ (রহ) বলতেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ বলেছেন—প্রতিটি গরু কিংবা উট সাত ব্যক্তি মিলে কুরবানী করতে পারে।

আমির শা'বী বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক সাহাবাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাঁরা প্রতিটি গরু কিংবা উট সাতজন মিলে কুরবানী করতেন।[২১]

৫. কুরবানীর গোশ্‌ত জমা করা

কানযুল উম্মালে আবদুর রহমান ইবনু আযহারের মুক্ত করা গোলাম আবু ওবাইদার একথাটি বর্ণিত হয়েছে—আমি হযরত আলী (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-কে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযের পর খুতবার সময় লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের বেশী জমা রাখতে নিষেধ করেছেন।[২২] কিন্তু কানযুল উম্মাল গ্রন্থকার হযরত ওসমান (রা)-এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তবে অন্য কোনো ফকীহ্ সেই বক্তব্যকে ওসমান (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেননি। তারা সেই বক্তব্যকে হযরত আলী (রা) এবং হযরত ইবনু ওমর (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। প্রখ্যাত ফকীহ্ ইমাম ইবনু কুদামাহ এ বক্তব্যকে হযরত আলী (রা) এবং হযরত ইবনু ওমর (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন—

সম্ভবত এ দু'জন মনীষী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্পর্কে জানতেন না। আগে নিষেধ করতে শুনেছেন, তাই তারা নিষেধের কথাই বলেছেন।[২৩]

ইবনু কুদামাহ তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশ্‌ত সংরক্ষণের অনুমোদন সম্পর্কিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কথা বলেছেন—তার ভিত্তি হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত এ রিওয়ায়েতটি। জাবির (রা) বলেছেন—আমরা তিন দিনে

www.amarboi.org

কুরবানীর গোশ্‌ত খেয়ে শেষ করতে পারতাম না। অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (তিন দিনের বেশী জমা করে রাখার জন্য) অনুমতি দিলেন এবং বললেন —তোমরাও খাও এবং কিছু পাথেয়ও সংগ্রহ করো।

অন্য এক বর্ণনায় আছে—তিনি বলেছেন, তোমরা গোশ্‌ত খাও, তা দিয়ে (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ করো এবং প্রয়োজনে জমা করেও রাখতে পারো।[২৪]

আযান (اذان)—আযান, ঘোষণা

১. সংজ্ঞা

আযান বলতে শরীআহ্ কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু বাক্যের মাধ্যমে নামাযের ঘোষণা দেয়াকে বুঝায়।

২. আযানের আইনগত দিক

[২.১] আযান শুধু ফরয নামাযের জন্য প্রযোজ্য। নফল নামাযের জন্য কোনো আযান নেই। এ কারণে ঈদের নামাযের জন্য আযান দেয়া হয় না। হযরত ওসমান (রা) আযান ছাড়া ঈদের নামায পড়তেন।[২৫]

[২.২] **দুবার আযান দেয়া ঃ** যদি কেউ মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায না পান তাহলে ইচ্ছে করলে মসজিদে নামায পড়তে পারেন কিংবা বাড়িতে একাকী নামায পড়তে পারেন। চাইলে জামায়াতও করতে পারেন। সেজন্য পুনরায় আযান দিতে হবে না। তার জন্য শহরে দেয়া আযানই যথেষ্ট।[২৬]

৩. জুম'আর নামাযের জন্য অতিরিক্ত আযানের সূচনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় জুম'আর নামাযের ওয়াক্ত হলে তিনি মিম্বারের ওপর গিয়ে বসতেন, তখন মুয়াযযিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বসার জায়গা বরাবর ঠিক সামনের দরোজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়ও এভাবেই চলেছে। হযরত ওমর (রা)-এর সময়ও এভাবেই চলছিলো। কিন্তু যখন হযরত ওসমান (রা)-এর সময় এলো তখন মদীনা মুনাওয়ারার সীমানাও বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তাই মসজিদে নববীর দরোজায় দাঁড়িয়ে দেয়া আযানের আওয়াজ গোটা শহরে পৌঁছা সম্ভব ছিলো না। সে জন্য তখন হযরত ওসমান (রা) হিজরী ৩০ সনে জুম'আর নামাযের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি আযানের প্রচলন করেন। এ আযান আগে থেকে চলে আসা প্রথম আযানের বেশ আগে 'আয্ যুরা' নামক মহল্লায় অবস্থিত হযরত ওসমান (রা)-এর বাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দেয়া হতো। সেই আযানের আওয়াজ মদীনার প্রতিটি বাজারেই পৌঁছে যেত। এভাবেই জুম'আর নামাযে দু'টো আযান এবং একটি ইকামাতের প্রচলন শুরু হয়।[২৭] কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আতা ইবনু আবী রাবাহ্ (রহ)-এর অভিমত হচ্ছে—হযরত ওসমান (রা) আযানের পূর্বে যে জিনিসের প্রচলন করেছিলেন তা আযান নয় বরং জুম'আর নামাযের জন্য লোকদেরকে আহ্বান করা মাত্র। মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে হযরত আতা ইবনু আবী রাবাহ (রহ)-এর একথাটি সংকলন করা হয়েছে এভাবে—'এ বক্তব্য মোটেই সঠিক নয় যে, হযরত ওসমান (রা) জুম'আর আযানের পূর্বে আরেকটি আযানের প্রচলন করেছিলেন বরং

www.amarboi.org

সঠিক কথা হচ্ছে আযান তো একটিই দেয়া হতো। অবশ্য আযানের কিছুক্ষণ আগে লোকদেরকে জুম'আর নামাযের জন্য শুধু আহ্বান করা হতো।'[২৮]

৪. আযানের জবাব দেয়া

হযরত ওসমান (রা) যখন আযান শুনতেন তখন তার জবাবে আযানের সেই বাক্যগুলোই পুনরাবৃত্তি করতেন। যেমন মুয়ায্‌যিন 'আল্লাহু আকবার' বললে তিনিও জবাবে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। যখন মুয়াযযিন আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন, তখন তিনিও এভাবে সবগুলো বাক্যই পুনরাবৃত্তি করতেন। শুধু মুয়ায্‌যিন যখন 'হাইয়্যা আলাস্‌ সালাহ' বলতেন তখন তিনি 'মা-শা-আল্লাহ ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতেন।[২৯]

৫. মুয়াযযিনের বেতন-ভাতা

হযরত ওসমান (রা)-এর সময় মসজিদে নববীতে চারজন মুয়াযযিন ছিলেন।[৩০] তিনি তাদেরকে বাইতুলমাল থেকে বেতন দিতেন।[৩১] হযরত ওসমান (রা) প্রথম খলীফা যিনি মুয়াযযিনদের বেতন নির্ধারণ করেছিলেন।[৩২]-(আরো দেখুন-'ইজারা' ও 'জিআলাহ' শিরোনাম)

আয়িব (عيب)—দোষ

১. সংজ্ঞা :

আয়িব বলতে কোনো জিনিসের এমন ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বুঝায়, যার কারণে বস্তুটি আগের অবস্থায় থাকে না।

২. দু পক্ষের মধ্যে কোনো জিনিসের লেনদেন কিংবা ক্রয়-বিক্রয় হলে তা আয়িব (ত্রুটি) মুক্ত হওয়া শর্ত। কেনার পর কোনো বস্তুর ত্রুটি প্রকাশ পেলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার ক্রেতার থাকে।-('খিয়ার' শিরোনাম দেখুন)

আরদুন (ارض)—জমি/ভূমি

১. হযরত ওমর (রা)-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও আইন-কানুন একটি কাঠামো লাভ করে। হযরত ওসমান (রা)-এর সময় কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াই সেসব মৌলিক কাঠামো অবিকল রাখা হয়। যে কাঠামো হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে রূপ লাভ করেছিলো।[৩৩] অবশ্য হযরত ওসমান (রা) ভূমি মালিকানা আইনে কিছুটা পরিবর্তন করেন। হযরত ওমর (রা) যেসব জমি তার যিম্মী মালিকদের মালিকানায় রেখে দিয়েছিলেন তিনি সেগুলো মুসলমানদের জন্য বৈধ ঘোষণা করলেন। ফলে সেসব জমি অমুসলিমদের দখল থেকে মুসলিমদের দখলে চলে আসতে লাগলো।[৩৪] শর্ত ছিলো সেসব জমির পূর্ব নির্ধারিত খারাজ ও ভূমিকর হুবহু বহাল থাকবে। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর সময়ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর অভিমত ছিলো, যে ব্যক্তি জমির (ওশর না দিয়ে) খারাজ দেয়ার জন্য রাজী হয় সে যেন প্রকারান্তরে নিচুতা ও লাঞ্ছনাকেই কবুল করে নেয়। অথচ তিনিই হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে মুসলমানদের জন্য সেই জমি ক্রয় করা বৈধ বলে ঘোষণা করেন। এমনকি তিনি নিজেও এ ধরনের জমি কিনে খারাজ আদায় করতে থাকেন। এর কারণ অবশ্য এই ছিলো যে, তিনি তার পূর্বের মত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তিনি এ কাজ করেছেন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা)-এর জারীকৃত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও আনুগত্য প্রকাশ করতে।

www.amarboi.org

২. পতিত জমি আবাদ করা।–('ইহ্ইয়াউল মাওয়াত' শিরোনাম দেখুন)

৩. জায়গীর প্রদান করা।–('ইকতা' শিরোনাম দেখুন)

৪. মুসলমানের কল্যাণের জন্য কোনো ভূমিকে সংরক্ষণ করা।–('হিমা' শিরোনাম দেখুন)

আরব (عرب)–আরবের অধিবাসী

আরবের মুশরিক সম্প্রদায় ও তাদের সন্তানদের মধ্যে মিরাস সংক্রান্ত মাসয়ালা।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

আরাফাহ (عرفة)–আরাফাতের ময়দান

হাজ্জের সময় আরাফায় অবস্থান।–('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

আলে রাসূলুল্লাহ (ال رسول الله)–রাসূল (সা)-এর বংশধর

গনীমাতের মালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের অংশ।
–('গানীমাত' শিরোনাম দেখুন)

আশরাবাহ্ (اشربة)–সুরা

'আশরাবাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ–এমন পানীয় যা পান করা যায়। ইসলামী পরিভাষায় এ শব্দটি শুধু সুরা এবং নাবীয অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. নাবীয

[১.১] নাবীয (نبيذ)-শব্দটির উৎপত্তি নাব্য (نبذ)- ধাতু থেকে। অর্থ–ঢেলে দেয়া, নিক্ষেপ করা। মানবুয অর্থ–যা ঢেলে দেয়া হয়েছে কিংবা যা নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ শব্দটি দিয়ে পানিতে ঢেলে দেয়া হয় কিংবা মিশিয়ে দেয়া হয় এমন বস্তুকে বুঝায়, যেমন–খেজুর, কিশমিশ, আঙ্গুর ইত্যাদি।[৩৫] কিন্তু পরবর্তীতে এর ব্যবহার ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঐ সকল বস্তু থেকে তৈরী পানীয়কে নাবিয বলা শুরু হয়েছে। অবশ্য সেই পানীয়কে কেবল ততক্ষণই নাবিয বলা যায় যতক্ষণ তার মধ্যে মাদকের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়। নেশা সৃষ্টি হওয়া মাত্র তা খামর বা মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

[১.২] **নাবীয পান করা সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** নাবীয ততক্ষণ পর্যন্ত পান করা হালাল এবং জায়েয়, যতক্ষণ তার মধ্যে মাদকের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়। তাই হযরত ওসমান (রা)ও নাবীয পান করতেন। আবদুল ওয়াহিদ ইবনু সাফওয়ান বর্ণনা করেছেন—আমি আমার পিতাকে আমার দাদীর সূত্রে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার মা বলতেন আমি হযরত ওসমান (রা)-এর জন্য রাতে কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে রাখতাম তিনি সকালে তা পান করতেন। তিনি আরো বলেছেন, একবার হযরত ওসমান (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—মনে হয় তুমি এর সাথে খেজুরও ভিজিয়ে রাখো ? আমি বললাম—মাঝে মাঝে এরূপ করি। তখন তিনি বললেন—এরূপ করবে না।[৩৬]

[১.৩] অবশ্য হযরত ওসমান (রা) দু অবস্থায় নাবীয পান করতে অপসন্দ করতেন।

www.amarboi.org

এক. যখন দুটো উপাদান একত্রে ভেজানো হতো। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটো উপাদান একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ্ মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথাটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন–

لاتنتذوا الزهو والرطب جميعًا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعًا، ولكن انتبذوا كل واحد على حدته .

পাকা এবং আধা পাকা খেজুর মিলিয়ে তোমরা নাবীয বানাবে না বরং সেগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাবীয বানাবে। এ প্রসঙ্গে হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি। তিনি সেই মহিলাকে দু' জিনিস একত্রিত করে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছিলেন।

দুই. নাবীয তৈরীর জন্য এমন পাত্র ব্যবহৃত হলে যা সাধারণত সুরা তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন–দুব্বা[১] নাকীর[২], মুযাফ্ফাত,[৩] এবং হানতাম[৪] প্রভৃতি।

সহীহ মুসলিমে ছুমামা ইবনু হাযন আল কুশাইরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন— আমি আয়িশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন —আব্‌দ আল কায়িস গোত্রের এক প্রতিনিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে 'নাবীয' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন—দুব্বা, নাকীর, মুযাফ্ফাত এবং হানতামে নাবীয তৈরী করা যাবে না।[৩৭]

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট যখন এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো যিনি দুব্বায় পানীয় রাখতেন। তিনি তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং পানীয় মাটিতে ফেলে দিয়ে দুব্বাকে দুমড়ে মুচড়ে দিলেন।[৩৮]

সুরা তৈরী ও পরিবেশনের পাত্রে নাবীয রাখতে নিষেধ করার যৌক্তিকতা সম্ভবত এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরা বা মাদক দ্রব্য থেকে কঠোরভাবে তাদেরকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন। তাই মাদক দ্রব্য রাখার পাত্র পর্যন্ত ব্যবহার করতে বারণ করেছেন। যেন মাদক দ্রব্যের সাথে কারো দূরতম সম্পর্কও না থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

১. 'দুব্বা' বলা হয় লাউয়ের খোলকে। যা গ্রামের মহিলারা রান্না বান্নার চামচ রাখার জন্য ব্যবহার করে। আবার অনেকে এটি দিয়ে একতারা কিংবা 'দফ'ও তৈরী করে। তখন আরবে মাদক দ্রব্য তৈরী করার পাত্র হিসেবে দুব্বা ব্যবহার করা হতো।–অনুবাদক

২. খেজুর গাছের মূলের যে অংশ সেই অংশকে খোদাই করে তৈরী করা পাত্র। এ ধরনের পাত্রে জাহেলী যুগে মদ বা সুরা তৈরী করা হতো।–অনুবাদক

৩. মাটির তৈরী এক ধরনের পাত্র যা আমাদের দেশে হাড়ি বা কলস হিসেবে পরিচিত সেগুলোর ভেতর বাইরে আলকাতরা দিয়ে রোদে শুকিয়ে তারপর সেগুলো মদ তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হতো।–অনুবাদক

৪. হানতাম, সবুজ বর্ণের এক ধরনের পাত্র বিশেষ। যা সাধারণত মদ তৈরী ও পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হতো।–অনুবাদক

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ ! মাদক দ্রব্য, জুয়া, আস্তানা এবং লটারী এগুলো শয়তানী কাজ। এগুলো থেকে বেঁচে থাকো। সম্ভবত তোমরা সফল হবে।"-(সূরা আল মায়িদা ঃ ৯০)

২ খাম্‌র (মাদক দ্রব্য)

[২.১] সংজ্ঞা ঃ খাম্‌র বলতে এমন (কঠিন, বায়বীয় ও তরল) বস্তুকে বুঝায় যা সেবনে কিংবা ব্যবহারে নেশার সৃষ্টি হয়।

[২.২] মাকদ দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক ঃ মাদক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধিকে বিলোপ করে দেয়। ফলে মানুষ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজকর্মে লিপ্ত হয়। এজন্য হযরত ওসমান (রা) প্রায়ই বলতেন—মাকদ দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকো, কারণ যাবতীয় মন্দ কাজের শিকড় হচ্ছে মাদক দ্রব্য।[৩৯]

তিনি আরো বললেতন—মাদক দ্রব্য থেকে দূরে থাকো, কেননা এটি মন্দ কাজের রাস্তাকে মসৃণ করে দেয়।[৪০]

সুনানু নাসাঈ এবং বাইহাকীতে হযরত ওসমান (রা)-এর একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে। তার ভাষা এরূপ-

মাদক দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকো, কারণ মাদক দ্রব্য যাবতীয় অপকর্মের মূল। তোমাদের আগের যুগে এক বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাকে এক মহিলা প্রতারণা করে গুমরাহ্ করে দিয়েছিলো। একদিন বুজুর্গ ব্যক্তির নিকট ঐ মহিলা তার বাঁদীকে পাঠালো। বাঁদী গিয়ে বললো—আমার মালিকাহ্ আপনাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডেকেছেন। তিনি বাঁদীর কথায় বিশ্বাস করে তার সাথে চললেন। যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন বাঁদী বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ করে দিলো। বুজুর্গ ব্যক্তি দেখলেন ঘরের মধ্যে এক সুন্দরী মহিলা। পাশে একটি ছেলে। টেবিলের ওপর সাজানো মদের পাত্র এবং গ্লাস। মহিলা তাকে দেখে বললো, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকিনি। আমি ডেকেছি আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এক গ্লাস মদ পান করে নাও, তারপর আমার সাথে বিছানায় যাবে। পরিশেষে ছেলেটিকে হত্যা করবে। ঐ ব্যক্তি বললেন—(আমি নিজে পান করবো না) আমাকে পান করিয়ে দাও। মহিলা তাকে এক গ্লাস পান করিয়ে দিলো। তিনি বললেন—আরেক গ্লাস দাও, তারপর বললেন—আরেক গ্লাস, এভাবে পান করে চললেন। এক পর্যায়ে মহিলার সাথে বিবস্ত্র হয়ে বিছানায় গেলেন এবং ছেলেটিকে হত্যা করে ফেললেন। তাই তোমরা নেশা থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর কসম ! ঈমান এবং নেশা এ দুটো জিনিস এক সাথে থাকতে পারে না। একটি আরেকটিকে খুব দ্রুত তাড়িয়ে দেয়।[৪১]

এজন্য হযরত ওসমান (রা) মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধকৃত মাদক দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকতেন। এমন কি এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলাম গ্রহণের আগেই তিনি মাদক দ্রব্য গ্রহণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন—হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) জাহেলী যুগ থেকেই মাদক দ্রব্য পরিহার করেছিলেন। তাহলে ইসলাম গ্রহণের পর আর তা গ্রহণ করবে কেন ?[৪২]

www.amarboi.org

[২.৩] মাদক সেবীদের চিহ্নিত করার পদ্ধতি ঃ স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য, উপকরণ (যেমন—বমিতে মাদক দ্রব্যের আলামত পাওয়া) প্রভৃতির মাধ্যমে মাদক সেবীদের চিহ্নিত করা যায়। আবু সাসান হুসাইন ইবনু আল মুনযির আর রুকাশী (রহ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি তখন হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন ওয়ালীদ ইবনু ওকবাকে তাঁর দরবারে উপস্থিত করা হয়েছিলো। তিনি ফযরের নামায দু' রাকাআত পড়িয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আরো পড়াবো কি ? দু ব্যক্তি তাঁর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হামরান। তিনি বললেন—ওয়ালীদ মদ পান করেছিলেন। দ্বিতীয়জন সাক্ষ্য দিলেন—ওয়ালীদ যে বমি করেছেন তার মধ্যে মদের চিহ্ন দেখেছি। তখন হযরত ওসমান (রা) বললেন—সে যদি মদ না গিলবে তাহলে বমিতে মদ এলো কোত্থেকে ? তারপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন—যাও তাকে চাবুক মারো। হযরত আলী (রা) তাঁর ছেলে হাসান (রা)-কে বললেন—যাও, তাকে চাবুক মারো। হাসান (রা) বললেন—যে মাদক দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করেছে তাকে তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সম্ভবত তিনি এ নির্দেশ পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা)-কে বললেন—তুমি গিয়ে তাকে চাবুক মারো। তিনি চাবুক মারা শুরু করলেন এবং হযরত আলী (রা) গুণতে থাকলেন। যখন ৪০ ঘা চাবুক মারা শেষ হলো তখন তিনি থামতে বললেন। তারপর বললেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদক সেবীদেরকে ৪০ ঘা চাবুক মারতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)ও এরূপ করেছেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) ৮০ ঘা চাবুক মেরেছেন। সবগুলোই সুন্নাত। কিন্তু ৪০ ঘা চাবুক বা বেত্রাঘাতই আমার নিকট পসন্দনীয়।[৪৩]

[২.৪] মাদকাসক্তের শাস্তি ঃ মাদকাসক্তের শাস্তি সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রসিদ্ধ যে বর্ণনাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ৪০ ঘা বেত্রাঘাত এবং লাঞ্ছিত করার জন্য জুতো কিংবা কাপড় (গিঁট) দিয়ে পেটানো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)ও এ পদ্ধতির ওপর আমল করেছেন। এমনকি হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকেও তিনি এ পদ্ধতি বলবত রেখেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি সাহাবা কিরামের সাথে পরামর্শ করে মাদকাসক্তের সাজা ৪০ ঘা চাবুক থেকে বাড়িয়ে ৮০ ঘা করেন। কারণ মাদক সেবীরা এ শাস্তিকে মামুলী শাস্তি মনে করা শুরু করে দিয়েছিলো। ফলে তারা সহজে মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে চাইতো না।[৪৪]

হযরত ওসমান (রা) মাদক সেবীদের কখনো ৪০ ঘা আবার কখনো ৮০ ঘা চাবুক মারার নির্দেশ দিতেন। এ শাস্তি অপরাধের মাত্রা ভেদে নির্ধারণ করতেন। যারা মাদক গ্রহণকে অভ্যাসে পরিণত করেছিলো তাদেরকে ৮০ ঘা চাবুক লাগাতেন। আর যারা মাদকাসক্ত নয় কিন্তু নৈতিক স্খলনজনিত কারণে শরাব পান করে ফেলতো তাদেরকে তিনি ৪০ ঘা চাবুক মারার নির্দেশ প্রদান করতেন।[৪৫]

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি, হযরত ওসমান (রা) যারা মাদক দ্রব্য সেবনকে অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিলো তাদেরকে প্রথম ৪০ ঘা চাবুক 'হদ' হিসেবে এবং অবশিষ্ট ৪০ ঘা মারতেন 'তাযীর' হিসেবে।

www.amarboi.org

[২.৫] মাদক সেবী ক্রীতদাসের শাস্তি ঃ ক্রীতদাস যদি মাদকাসক্ত হয় তাহলে তাকে স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক শাস্তি প্রদান করতে হবে। হযরত ওসমান (রা)-এর এক গোলাম মাদক সেবনের অপরাধে অভিযুক্ত হলে তিনি তাকে স্বাধীন ব্যক্তির ওপর যে হাদ জারী করা হয় তার অর্ধেক অর্থাৎ ২০টি বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেন।[৪৬]

[২.৬] মাতালের তালাক ঃ হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন মাতাল অবস্থায় যাকিছু বলা হয় তা অর্থহীন। কাজেই না তার কোনো চুক্তি ধর্তব্য, আর না কোনো চুক্তির প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য। তেমনিভাবে কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে কিংবা স্ত্রীকে তালাক দিলে তাও ধর্তব্য নয়। কারণ মাতাল অবস্থায় সে যাকিছু বলে তা চিন্তাভাবনা ছাড়াই বলে। যাকিছু করে অনিচ্ছাকৃতভাবেই করে। যতক্ষণ সে ইচ্ছেকৃতভাবে কিছু না বলবে, সেজন্য তাকে দায়ী করা যাবে না। এজন্যই হযরত ওসমান (রা) বলতেন—মাতাল এবং পাগলের দেয়া তালাক গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৭] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَطَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِىْ غِلاَقٍ

ইচ্ছে অনুভূতি লোপ পাওয়া অবস্থায় তালাক কিংবা ক্রীতদাস মুক্ত করলে তা কার্যকরী হয় না।[৪৮]

আস্‌রুন (اسر)—বন্দী করা

১. সংজ্ঞা

যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষের লোকদের যুদ্ধ বন্দী করাকে আসরুন বলা হয়।

২. শত্রু পক্ষের হাত থেকে বন্দী মুক্ত করা

কোনো মুসলমান শত্রু পক্ষের হাতে বন্দী হলে তাকে মুক্ত করে আনার প্রচেষ্টা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব (ফরয)। যদি সেই ব্যক্তি ধনী হয় তাহলে তার মুক্তিপণ তাকেই প্রদান করতে হবে। আর যদি শত্রু পক্ষ মুক্তির সময় তার থেকে জোর করে শপথ নেয় যে, সে ফিরে গিয়ে ফিদইয়া (মুক্তিপণ) পাঠিয়ে দেবে, নইলে পুনরায় ফিরে আসতে হবে, এমতাবস্থায় সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা জরুরী নয়। যদি তারা সেই প্রতিশ্রুতি জোর করে না নিয়ে থাকে এবং পরিশোধের সামর্থ তার থাকে তাহলে তা পরিশোধ করা কর্তব্য। আর যদি মুক্তিপণ আদায় করার সামর্থ তার না থাকে এবং সে যদি মহিলা হয় তাহলে সে শত্রু পক্ষের কাছে আর ফিরে যাবে না। কারণ তাতে তার সম্ভ্রমহানির ভয় আছে। একই কারণে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর কোনো মহিলাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছিলো। অবশ্য বন্দী পুরুষ হলে, শত্রু পক্ষের কাছে ফিরে যাওয়া জরুরী। কারণ তার এ প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা অন্য কয়েদীদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেননা তখন আর কাউকে এ সুযোগ তারা দেবে না। মোটকথা সন্ধি চুক্তি যেভাবে মেনে চলা হয় ঠিক সেভাবেই এ প্রতিশ্রুতিও পূরণ করা জরুরী।[৪৯]

৩. অমুসলিম যুদ্ধ বন্দী

সাহাবা কিরাম (রা) এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান অমুসলিম যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে নিচের চারটি ফায়সালার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন।

www.amarboi.org

[৩.১] ইচ্ছে করলে সক্ষম পুরুষ যুদ্ধাদের হত্যা করে মহিলা ও বাচ্চাদেরকে গোলাম-বাঁদী বানিয়ে নিতে পারেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ـ

"তোমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দাও এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গিঁটে গিঁটে আঘাত কর।"
–(সূরা আল আনফাল ঃ ১২)

[৩.২] চাইলে মুক্তিপণ (ফিদইয়া) নিয়ে তাদেরকে ছেড়েও দিতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে–

حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ـ

"অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করে ফেলবে তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। তারপর হয় তাদেরকে অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করো। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে।"–(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

হযরত ওসমান (রা) হামাদানের এক বন্দী যাকে মুসলমানগণ বন্দী করেছিলেন চারশ' দিরহাম ফিদ্‌ইয়া নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।[৫০]

[৩.৩] যদি কোনো বিনিময় ছাড়া অনুগ্রহ করে তাদেরকে মুক্তি দিতে চান, তাও জায়েয আছে। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন ঃ

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً

"(তোমাদের) ইচ্ছে হয় তাদেরকে অনুগ্রহ করো কিংবা তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করো।"–(সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

[৩.৪] অবশ্য ইচ্ছে করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী হিসেবে সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়াও জায়েয আছে। হযরত ওসমান (রা) এরূপ করতেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রা) আরব যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম বানাতেন না।[৫১] আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, হযরত ওসমান (রা)-ও এর ব্যতিক্রম কিছু করেননি।

আসাবা (عصبة)–পিতৃসূত্রে আত্মীয়

১. আসাবা বলতে এমন আত্মীয়কে বুঝায় যার সম্পর্ক পিতার সাথে। যেমন পিতা কিংবা দাদার সন্তানগণ।

২. যাবিল ফুরূযদের মধ্যে অংশ বন্টনের পর অবশিষ্ট যা থেকে যায় তা আসাবাগণ পেয়ে থাকেন।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

'আ' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৬৮ ; তাবাকাত ইবনু সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৯।
২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮ ; ১০ম খণ্ড, পৃ-৭৮ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৫৮।
৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৬৭।
৪. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯৪; আল মুগনী- ১০ম খণ্ড, পৃ-৪১৯-৪২০।
৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩৩ ; আল মুগনী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪২১ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭১৭।
৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩০-৩৩১।
৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৫।
৮. ফিক্‌হে হযরত ওমর (রা) 'ফাই' শিরোনাম।
৯. কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদ, পৃ-২৩৭।
১০. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৪৮।
১১. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৪৮।
১২. আল মাবসূত, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৯।
১৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসীর, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৮।
১৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৮।
১৫. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৬০ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-৩০০।
১৬. মুসন্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৬৭।
১৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪২১ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৯৮।
১৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৬ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৭১।
১৯. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৬৯-৩৭০।
২০. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৫৮।
২১. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৮২।
২২. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১৯।
২৩. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬৩৪।
২৪. সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ ; সহীহ মুসলিম ও সুনানু নাসাঈ, কিতাবুল আযহিয়্যাহ্ মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩১৭।
২৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৮৭।
২৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৫১২।
২৭. সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল জুম'আ ; সুনানু আবী দাউদ ; জামি আত তিরমিযি ; সুনানু নাসাঈ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯৭; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২০৬ ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৬।
২৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২০৬।
২৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৬৩ ; ২য় খণ্ড, পৃ-১৫৫।
৩০. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪২৯।
৩১. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮ ; সুনানু বাইহাকী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪২৯।
৩২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৮৩।
৩৩. ফিক্‌হে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), 'আরদুন' শিরোনাম।
৩৪. তারিখ আত তাবারী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৪।
৩৫. তাজুল আরূস, 'নাবয' শিরোনাম।
৩৬. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৫১৩।
৩৭. সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল আশরাবাহ।
৩৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২২৭ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪১।
৩৯. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৮৭ ; সুনানু নাসাঈ, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩১৫ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৮৬।

www.amarboi.org

৪০. সুনানু নাসাঈ, কিতাবুল আশরাবাহ, সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৮৭, ১০ম খণ্ড, পৃ-৫।
৪১. সুনানু নাসাঈ, সুনানু বাইহাকী।
৪২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৬৭।
৪৩. সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল হুদূদ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৩।
৪৪. ফিক্‌হে আবু বকর সিদ্দীক (রা) 'খামর' শিরোনাম ; ফিক্‌হে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), আশরাবাহ।
৪৫. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৩২, ৩৫৬ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১৫ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩৭৩, ৪৮২, হাদীস নং-১৩৬৮৫।
৪৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৮৩ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৮৪২; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ-২৬৮ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৬ ; আল মুহাল্লী ১০ম খণ্ড, পৃ-২০৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩১২ ; কাশফুল গুম্মাহ ২য় খণ্ড, পৃ-১৪০ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৭৩।
৪৭. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তালাক ; উমদাতুল কারী শরহে বুখারী, ২০শ' খণ্ড, পৃ-২৫১; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৬-২৩৭ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১৫।
৪৮. সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং-২১১৯ ; ইবনু মাজা, হাদীস নং-২০৪৬।
৪৯. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪৮২।
৫০. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-১৩৪।
৫১. ফিক্‌হে ওমর ইবনুল খাত্তাব।

www.amarboi.org

ই

ইক্ত্বা' (اقطاع)–জায়গীর দান/জমিদারী প্রদান

১. সংজ্ঞা

সরকারী জায়গা কিংবা 'ফাই'-এর জায়গা থেকে সরকার কর্তৃক কাউকে কোনো জমি জায়গীর কিংবা বরাদ্দ হিসেবে প্রদান করাকে 'ইক্ত্বা' বলে।

২. হযরত ওসমান (রা) পাঁচজন বিশিষ্ট সাহাবাকে জায়গীর প্রদান করেছিলেন।"
–('ইহ্ইয়াউল মাওয়াত' শিরোনাম দেখুন)

ইক্তিহাল (اكتحال)–সুরমা ব্যবহার করা

যারা ইহ্রাম বাঁধেন তাদের সুরমা ব্যবহারের বিধান।–('ইহ্রাম' শিরোনাম দেখুন)

ইক্রাহ (اكراه)–অবৈধ বলপ্রয়োগ/জবরদস্তি

১. সংজ্ঞা

ইকরাহ্ বলতে বুঝায়–কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কোনো কাজ করার জন্য বাধ্য করা।

২. ইকরাহ্র প্রভাব-পরিণতি

ইকরাহ্র ফলে নিম্নরূপ প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়।

[২.১] একথায় সবাই একমত যে, ইকরাহ্ বা জবরদস্তির কারণে সংঘটিত তৎপরতার জন্য আল্লাহর নিকট গুনাহ্ মুলতবী হয়ে যায়। তার প্রমাণ যখন কুরাইশরা হযরত আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা)-কে নির্যাতন করে কুফরী কথা বলতে বাধ্য করেছিলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهٖٓ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

"ঈমান আনার পর যাকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয় কিন্তু তার অন্তর ঈমানে সন্তুষ্ট (এজন্য কোনো অপরাধ ধরা হবে না) পক্ষান্তরে যে ঈমান গ্রহণের পর সন্তুষ্টচিত্তে কুফরীকে কবুল করে নেবে, তার ওপর আল্লাহ্র গযব। এ ধরনের লোক ভীষণ আযাবে পড়ে যাবে।"–(সূরা আন নাহ্ল ঃ ১০৬)

[২.২] কাউকে দিয়ে জোর করে কোনো অন্যায় কাজ করালে, দুনিয়ার শাস্তিও তার জন্য মুলতবী হয়ে যায়। এ ধরনের লোকের ওপর হাদ কার্যকর হবে না।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'হাদ' শিরোনাম দেখুন)

[২.৩] কাউকে দিয়ে জোর করে কিছু বলালে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এরূপ অবস্থায় কোনো চুক্তি করা কিংবা চুক্তি বাতিল করা সহ অন্য কোনো কাজ করলে তা বাতিল ও অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে।–(আরো দেখুন–'আসরুন' এবং 'নিকাহ' শিরোনাম)

www.amarboi.org

ইকামাতুস সালাত (اقامة الصلوة)—নামাযের জন্য ইকামাত বলা

১. সংজ্ঞা

ইকামাত সেসব নামাযের জন্য যেগুলো ফরযে আইন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, জানাযা নামায (যা ফরযে কিফায়া)-এর জন্য ইকামাত বলার প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ ঈদের নামায (যা ফরয নয়, ওয়াজিব)-এর জন্যও ইকামাত বলা যাবে না।[১]–(আরো জানার জন্য দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

২. ইকামাতের সময় কী বলতে হবে

হযরত ওসমান (রা) যখন—মুয়ায্‌যিনকে ইকামাতের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতে শুনতেন, তিনিও সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। যখন 'আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে শুনতেন তখন তিনিও সাথে সাথে 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতেন। আর 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার সময় তিনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলতেন। মুয়ায্‌যিনকে যখন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ' বলতে শুনতেন, তিনি তখন 'মা-শা-আল্লাহু ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতেন। আর মুয়ায্‌যিন যখন 'ক্বাদ কামাতিস সালাহ্' বলতেন তখন তিনি উত্তরে বলতেন—'মারহাবা বিল ক্বায়িলীন আদ্‌লান ওয়া সাদ্‌কান ওয়া বিস সালাতি মারহাবান ওয়া আহ্‌লান', তারপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।[২]

ইকামাতুল মুসাফির (اقامة المسافر)—মুসাফিরের মুকীম হয়ে যাওয়া

কোনো মুসাফির (ভ্রমণকারী) মুকীম হওয়ার পর মুসাফির হিসেবে যে সুযোগ সুবিধা থাকে তা শেষ হয়ে যায়।–('হাজ্জ' দেখুন)

ইখতিলাফ (اختلاف)—মতবিরোধ/মতানৈক্য

ইজতিহাদ বা গবেষণা কর্মে ইখ্‌তিলাফকে পরস্পর হিংসা বিদ্বেষের কারণ বানানো ঠিক নয়। কানযুল উম্মালে বলা হয়েছে—হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে কেউ যদি সেখানে থাকতেন তিনি মনে করতেন কোনোদিন তাঁরা আর একমত হতে পারবেন না। কিন্তু যখন তারা পৃথক হয়ে যেতেন তখন একজন আরেকজনের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ ও সৌজন্য প্রদর্শন করতেন।

ইছবাত (اثبات)—প্রমাণ করা/সত্য প্রতিষ্ঠিত করা

সংজ্ঞা

বিচারকের নিকট তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনকে ইছ্‌বাত বলে।

–রমযানের চাঁদ ওঠার স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করা।–('সিয়াম' ও 'শাহাদাত')

–ব্যভিচারের প্রমাণ।"–('যিনা' শিরোনাম দেখুন)

–হদূদের প্রমাণ।–('হাদ' শিরোনাম দেখুন)

–সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় প্রমাণ উপস্থাপন।–('শাহাদাত' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

–মহিলাদের এমন বিষয়ের প্রমাণ, যা পুরুষরা অবহিত নয়।
–('শাহাদাত' ও 'রিযা'আ' শিরোনাম দেখুন)

–সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ।–('শাহাদাত' শিরোনাম দেখুন)

–একজন সাক্ষ্য এবং শপথের মাধ্যমে প্রমাণ।–('কাযা' শিরোনাম দেখুন)

ইজতিহাদ (اجتهاد)–গবেষণা

ইজতিহাদের ফলাফল ভিন্নধর্মী হলেও পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা। অর্থাৎ কারো ইজতিহাদের বিপরীতে শুধু ইজতিহাদ দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।–(বিস্তারিত দেখুন 'হাদ' শিরোনাম)

ইজারা (اجارة)–ভাড়া

১. সংজ্ঞা

ইজারা এমন এক চুক্তিকে বুঝায় যে চুক্তিবলে কোনো ব্যক্তির বিশেষ খিদমত কিংবা কোনো কাজ সম্পাদনের বিনিময়ে তাকে চুক্তি মুতাবিক অর্থ বা সম্পদ প্রদান করা হয়।

২. ইজারার শর্তাবলী

ইজারার শর্ত হচ্ছে—কাজের ধরন ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক আদায় করা যায়। আর পারিশ্রমিকের পরিমাণও উল্লেখ এবং নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন, যেন ঝগড়া বিবাদের কোনো অবকাশ না থাকে।[৩]

৩. ইজারার বিধান

[৩.১] হযরত ওসমান (রা) শিঙ্গা লাগানোকে পেশা হিসেবে নেয়া এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থকে মাকরূহ মনে করতেন। এর একটি কারণ শিঙ্গা লাগানোর সময় রক্ত ও পূঁজের মত নাপাক জিনিস মুখে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী ঃ

كَسْبُ الْحِجَامِ خَبِيْثٌ

"শিঙ্গা লাগিয়ে যে অর্থ উপার্জন করা হয় তা নাপাক এবং অপসন্দনীয়।"[৪]

[৩.২] ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট (যেমন আযান দেয়া), এমন কাজের জন্য হযরত ওসমান (রা) রীতিমতো বেতন প্রদান করতেন। এ ধরনের কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতেন না। ইমাম শাফিঈ বলেছেন—

হযরত ওসমান (রা) মুয়ায্‌যিনকে রীতিমতো বেতন প্রদান করতেন।[৫]

ইত্‌কুন (عتق)–মুক্ত করে দেয়া

গোলামী বা দাসত্ব শেষ করে দেয়াকে 'ইতকুন' বলে।

ইত্‌লাফ (اتلاف)–নষ্ট করা/ক্ষতি করা

www.amarboi.org

১. সংজ্ঞা

ইতলাফ অর্থ কোনো জিনিসকে ব্যবহার উপযোগী না রাখা বিশেষ করে যে উদ্দেশ্যে তা বানানো হয়েছে এবং সাধারণত তা দিয়ে যেসব কাজ করা হয়।

২. ইত্‌লাফের বিধান

[২.১] ইত্‌লাফের ক্ষতিপূরণ।−('জিনাইয়া' এবং 'যিমান' শিরোনাম দেখুন)

[২.২] ঐ বস্তুর ইতলাফ যার লেনদেন নিষিদ্ধ কিংবা যা মৌলিকভাবে হারাম।"

−('আশরাবাহ' শিরোনাম দেখুন)

[২.৩] তাযীরের শাস্তি স্বরূপ অরপাধের উপকরণ নষ্ট করে দেয়া।

−('তাযীর' শিরোনাম দেখুন)

ইদ্দাহ্‌ (عدة)−ইদ্দত

১. সংজ্ঞা

কোনো মহিলার স্বামী ইন্তিকাল করলে কিংবা তাকে তালাক দিলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার নাম ইদ্দাহ্‌ বা ইদ্দত।

২. তালাক প্রাপ্তার ইদ্দত

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে কিংবা পরে তালাক দিতে পারে। কিন্তু উভয় অবস্থার বিধান ভিন্ন ভিন্ন। নিচে আলোচনা করা হলো—

[২.১] একথার ওপর সকলেই ঐকমত্য যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস কিংবা নিভৃতে মিলিত হওয়ার আগে তালাক দিলে তার কোনো ইদ্দত নেই।

[২.২] স্বামী যদি স্ত্রীকে ভোগ করার পর তালাক দেন—তাহলে স্ত্রীকে অবশ্যই তালাকের ইদ্দত পালন করতে হবে। তেমনিভাবে সহবাস হয়নি কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নির্জনে মিলিত হয়েছে যেখানে সহবাসে কোনো বাধা ছিলো না, এ ক্ষেত্রে সহবাস হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। উভয় অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাকের ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব।[৬]

স্বাধীন মহিলা ও বাঁদী, উভয়ের ক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দত এক নয়। পৃথক পৃথক।

[ক] তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বাধীন হয় এবং তার নিয়মিত মাসিক হয়, তাকে মাসিকের হিসাবে ইদ্দত গণনা করতে হবে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে—

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ـ(البقرة : ١٦٨)

"তালাকপ্রাপ্তা তিন হায়িয পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখবে।"−(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

হযরত ওসমান (রা)-এর মতে আয়াতে বর্ণিত 'কুরূ' শব্দটি দিয়ে হায়িয (মাসিক) বুঝানো হয়েছে। আকাবির (প্রধান প্রধান) সাহাবা কিরাম (রা)-এর অভিমতও অনুরূপ।[৭] তাই যদি কোনো ব্যক্তি তার এমন স্ত্রীকে তালাক দেন যার নিয়মিত মাসিক হয়। কিন্তু তালাক দেয়ার পর একবার মাসিক হয়ে কোনো কারণে (যেমন দুধ পান করানো কিংবা কোনো অসুখ বিসুখের কারণে) বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যতদিন ঐ মহিলার আরো দু'বার মাসিক না হবে ততদিন তার ইদ্দত অবশিষ্ট থাকবে। হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ের প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা

www.amarboi.org

হচ্ছে—হিব্বান ইবনু মুনকায তার স্ত্রীকে সুস্থাবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। তার এক দুগ্ধপোষ্য সন্তান ছিলো। সন্তানকে দুধ পান করানোর কারণে সেই মহিলার একাধারে সাত আট মাস ঋতুস্রাব বন্ধ রইলো। সাত আট মাস পর হিব্বান (রা) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লোকজন বললো—তাঁর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীতো তার সম্পদে ওয়ারিশ হবে। তিনি বললেন—তোমরা আমাকে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট নিয়ে চলো। তাকে ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন। সেখানে হযরত আলী (রা) এবং হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)ও বসা ছিলেন। হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের অভিমত কী ? তাঁরা বললেন—হিব্বান যদি (স্ত্রী ইদ্দত শেষ হওয়ার) আগে মারা যায় তাহলে স্ত্রী ওয়ারিশ হবে। আর স্ত্রী যদি আগে মারা যায় তাহলে হিব্বান ওয়ারিশ হবে। কারণ সে তো এমন বয়সে পৌঁছেনি যে, আর কোনোদিন হায়িয হবে না কিংবা বয়স এতো কমও নয় যে, এখনো হায়িয আসা শুরু হয়নি। তাছাড়া সে হায়িযের হিসেবেই ইদ্দত পালন করছে। সাময়িক কারণে হয়তো তা বন্ধ আছে। হিব্বান (রা) বাড়িতে এসে স্ত্রীর নিকট থেকে সন্তান নিয়ে এলেন। দুধ পান বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তার মাসিক শুরু হয়ে গেলো। পর পর দু মাসে দুবার মাসিক হলো কিন্তু তৃতীয়বার মাসিক শুরু হওয়ার পূর্বেই হিব্বান (রা) ইন্তিকাল করলেন। তখন স্ত্রী বিধবার ইদ্দত পালন করলো এবং স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিশও হলো।[৮]

তালাক প্রাপ্তার তিনটি মাসিক অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দত পুরো হয়ে যায় এবং সে ইচ্ছে করলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারে। এমতাবস্থায় স্বামী আর তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। এমনকি রিজঈ তালাক হলেও না।[৯]

[খ] যদি কোনো মহিলার বয়স বেশী হওয়ার কারণে কিংবা অল্প হওয়ার কারণে হায়িয না আসে, তাহলে তার ইদ্দত গণনা করতে হবে মাসের হিসেবে। এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

[গ] যদি তালাক প্রাপ্তা গর্ভবতী হয়, তাহলে তার ইদ্দত প্রসব হওয়া পর্যন্ত। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—'গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত প্রসব হওয়া পর্যন্ত। প্রসব হওয়া মাত্র তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং তাকে বিয়ে করাও জায়েয হয়ে যায়।[১০] আল্লাহ নিজেই বলেছেন—

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط -(الطلاق : ٤)

"গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত।"-(সূরা আত তালাক ঃ ৪)

[২.৩] বাঁদীর ইদ্দত ঃ বাঁদীর ইদ্দত স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের অর্ধেক সময়কাল। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন, তালাকের মূল্যায়ন করা হবে স্বামীর কথার ভিত্তিতে আর ইদ্দতের মূল্যায়ন করা হবে স্ত্রীর কথার ওপর ভিত্তি করে।[১১]

৩. খুলা' গ্রহণকারী মহিলার ইদ্দত

স্বামী থেকে খুলা' গ্রহণকারী মহিলার কোনো ইদ্দত নেই। এ ধরনের মহিলাদের জন্য গর্ভমুক্ত আছে কিনা তা জানার জন্য শুধু এক হায়িয অতিবাহিত করাই যথেষ্ট।-(আরো জানার জন্য 'খুলা' শিরোনাম দেখুন)

৭—

www.amarboi.org

৪. ঈলার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তার ইদ্দত

যে মহিলা থেকে ঈলা করা হয়েছে তার ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তা মহিলার অনুরূপ। তবে ইদ্দত গণনা শুরু হবে ঈলার চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে। শর্ত হচ্ছে যদি চার মাসের মধ্যে স্বামী তাকে ফিরিয়ে না নেয়।-('ঈলা' শিরোনাম দেখুন)

৫. চতুর্থ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পর নতুন বিয়ে করা

যদি কারো চারজন স্ত্রী থাকে এবং তাদের একজনকে তিন তালাক প্রদান করেন, তাহলে ঐ স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই স্বামী ইচ্ছে করলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। কারণ তিন তালাক প্রদানের পর ঐ মহিলা আর তার স্ত্রী থাকে না। হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার চতুর্থ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। হযরত ওসমান (রা) তাকে বলেছিলেন, এখন তুমি তার ওয়ারিশ হবে না এবং সেও তোমার ওয়ারিশ হবে না, তুমি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারো।[১২] কিন্তু সে যদি তার ঐ স্ত্রীকে এক কিংবা দু'টি রিজঈ তালাক দিতো, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য ততোদিন বিয়ে জায়েয হতো না যতোদিন স্ত্রী ইদ্দত পালন করে পুরোপুরি পৃথক হয়ে না যেতো।[১৩]

৬. স্বামীর মৃত্যুতে (বিধবার) ইদ্দত

[৬.১] স্বামী মারা গেলে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তার ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যেমন আল্লাহ বলেছেন—

وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط .(الطلاق : ٤)

'গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত।'-(সূরা আত তালাক ঃ ৪)

যদি সেই মহিলা গর্ভবতী না হয়, তবে ইদ্দত চার মাস দশ দিন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ع -

"তোমাদের মধ্যে যে মৃত্যুবরণ করবে, স্ত্রী রেখে। সে (স্ত্রী) চার মাস দশ দিন পর্যন্ত (পুণ বিয়ে থেকে) নিজেকে বিরত রাখবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪)

[৬.২] স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকালীন সময়ে শোক প্রকাশ ঃ শোক পালনের জন্য দুটো জিনিস মেনে চলা প্রয়োজন। এক রূপচর্চা থেকে বিরত থাকা। দুই. যেখানে স্বামীর ইন্তিকাল হয়েছে সেই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও রাত না কাটানো। যদি কঠিন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়। ইদ্দত পালনরত মহিলা প্রয়োজনে দিনের বেলা বাইরে যেতে পারবে কিন্তু রাতের বেলা স্বামীর বাড়িতেই তাকে অবস্থান করতে হবে।[১৪]

আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বোন ফারী'আহ্ বিনতে মালিক ইবনু সিনান বলেছেন— "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম, আমার স্বামী তার গোলামদের খোঁজে গিয়েছিলেন। তারা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। সেই সাথে আমি একথাও বললাম—স্বামী আমার জন্য থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই করে যেতে পারেননি। না কোনো ঘর আর না কোনো খাদ্য। আমি আমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারি ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—'হাঁ তুমি থাকতে পারো।' একথা শুনে আমি ফিরে এসে মাত্র আমার ঘরে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় তিনি আমাকে নিজে ডাকলেন কিংবা কাউকে

বললেন আমাকে ডেকে দেয়ার জন্য। আমি গেলাম। তিনি বললেন—তোমার ব্যাপারে যেন কি বলছিলে? আমি পুনরায় সবকিছু বললাম। তিনি নির্দেশ দিলেন, আমি যেন ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামীর বাড়িতেই থাকি। অতপর আমি আমার ঘরে চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন করলাম।" তিনি আরো বলেন—

যখন হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকাল এলো তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং পুরো ঘটনাটি জানতে চাইলেন। আমি সব ঘটনা তাঁর কাছে বললাম। তিনি এ ঘটনাকে নজীর বানিয়ে (সামনে রেখে) এ ধরনের সমস্যার সমাধান দিতে লাগলেন।[১৫] এজন্য হযরত ওসমান (রা) ইদ্দত পালনরত (বিধবা) মহিলাকে তার স্বামীর বাড়িতে রাত কাটানোর ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করতেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে এক (বিধবা) মহিলা যিনি স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন করছিলেন। একদিন আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। সফরের কারণে পথে তার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেলো। লোকজন হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কী করা যায়? তিনি বললেন—তাকে তার স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাও। কেননা এখনো তার প্রসব বেদনা হচ্ছে।[১৬] (প্রসব তো আর হয়নি যে, ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে)।

স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন করছে, এমন মহিলা যদি হাজ্জ কিংবা ওমরার জন্য রওয়ানা হতেন হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে যুহ্‌ফা অথবা যুল হুলাইফা নামক স্থান থেকে ফিরিয়ে দিতেন।[১৭]

৭. নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রীর ইদ্দত

স্বামী নিখোঁজ এমন মহিলার ইদ্দত বিধবা মহিলার ইদ্দতের অনুরূপ। তবে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষার সময় পার হওয়ার পর থেকে তার ইদ্দত গণনা শুরু করতে হবে।-('মাফকূদ' শিরোনাম দেখুন)

৮. মনিবের মৃত্যুতে উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দত

উম্মু ওয়ালাদের মনিবের মৃত্যু হলে তাকে জরায়ুমুক্ত করার জন্য কতদিন ইদ্দত পালন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা) থেকে দুটো বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিন হায়িয ইদ্দত পালন করতে হবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী এক হায়িয (মাসিক)।

-('ইসতিবরা' শিরোনাম দেখুন)

৯. যে বাঁদী স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনরত অবস্থায় আছে, সেই বাঁদীর সাথে মনিবের সহবাস করা জায়েয নেই।-('তাসাররুয়ূন' শিরোনাম দেখুন)

ইদ্দিখার (ادخار)—জমা করা/সংরক্ষণ করা

১. সংজ্ঞা

ইদ্দিখার অর্থ কোনো জিনিসকে এজন্য পৃথক করে রাখা যেন প্রয়োজনের সময় তা ব্যবহার করা যায়।

www.amarboi.org

২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো জিনিস সংরক্ষণ করা হযরত ওসমান (রা) জায়েয মনে করতেন। কারণ অতিরিক্ত জিনিস ছাড়া না কোনো ব্যক্তি চলতে পারে আর না কোনো প্রশাসন। পক্ষান্তরে হযরত আবু যর গিফারী (রা) অতিরিক্ত জিনিস জমা করে রাখাকে অপসন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই জরুরী ভিত্তিতে আল্লাহর পথে দান করে দিতে হবে। তিনি কুরআনে কারীমের এ আয়াতটিকে দলিল হিসেবে পেশ করতেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ٥(التوبة : ٣٤)

"যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে, আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন, এ আয়াত থেকে এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা ঠিক নয়। তিনি আবু যর গিফারী (রা)-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেননি। ফলে ওসমান (রা) তাকে রাবযায় গিয়ে বসবাস করার নির্দেশ দেন। অনেকের মতে আবু যর গিফারী (রা) নিজেই স্বেচ্ছায় রাবযায় গিয়ে বসবাসের অনুমতি চেয়েছিলেন। যাহোক তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।[১৮]

–কুরবানীর গোশ্‌ত জমা রাখা।–(বিস্তারিত দেখুন–'আযহিয়া' শিরোনাম)

ইনসাত (انصات)–মনযোগ দিয়ে শোন।

খতীব খুতবা শুরু করে দিলে তা মনযোগ দিয়ে শোনা ওয়াজিব।–('খুতবা' শিরোনাম দেখুন)

ইনাউন (اناء)–থালা বাসন

–যে সকল পাত্রে নাবীয তৈরী করা নিষিদ্ধ।–('আশরাবাহ' শিরোনাম দেখুন)

–যেসব পাত্রে ওযু করা জায়েয।–('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

ইফতার (افطار)–পানাহারের মাধ্যমে রোযার অবসান করা

–রোযাদার ব্যক্তির ইফতার করার পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করা।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

ইফ্‌তিদা (افتداء)–ফিদ্‌ইয়া দেয়া

–কোনো ব্যক্তি তার সন্তানকে (যার মা অন্য কারো বাঁদী) মুক্ত করার জন্য ফিদইয়া প্রদান করা।–('ইসতিহ্‌কাক' শিরোনাম দেখুন)

–শপথ ভঙ্গের ফিদইয়া বা কাফ্‌ফারা প্রদান করা।–('কাদা' শিরোনাম দেখুন)

ইফরাদ (افراد)–হাজ্জের একটি পদ্ধতি

–ইফরাদ হাজ্জ একটি উত্তম পদ্ধতির হাজ্জ।–('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

ইফলাস (إفلاس)–দেওলিয়া হয়ে যাওয়া

বিস্তারিত জানার জন্য 'ফাল্‌স' শিরোনাম দেখুন।

ইবনু (ابن)–ছেলে

'ওয়ালাদ' শিরোনাম দেখুন।

ইবনুস সাবীল (ابن السبيل)–পথিক/ভ্রমণকারী

১. সংজ্ঞা

ইবনুস সাবীল দ্বারা এমন পথিক বা ভ্রমণকারীকে বুঝায় যার কাছে গন্তব্যস্থানে পৌঁছার মত পর্যাপ্ত পাথেয় থাকে না।

২. যাকাতে ইবনুস সাবীলের অংশ।–('যাকাত' শিরোনাম দেখুন)

৩. গানীমাতের মালে ইবনুস সাবীল এর অংশ।–('গানীমাত' শিরোনাম দেখুন)

ইবাক (إبق)–গোলাম পালিয়ে যাওয়া

১. সংজ্ঞা

গোলাম তার মনিবের সাথে বিদ্রোহ করে পালিয়ে যাওয়াকে 'ইবাক' বলা হয়।

২. পলাতক গোলামের ওপর চুরির অভিযোগ করা।–('সিরকাহ' শিরোনাম দেখুন)

ইবিল (إبل)–উট

–ঈদ অথবা হাজ্জের সময় কুরবানীর জন্য একটি উটে সাতজনের অংশগ্রহণ।–('আযহিয়া' শিরোনাম দেখুন)

–দিয়াত (রক্তপণ) বাবদ প্রদেয় উটের সংখ্যা।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

ইমামত (امامت)–নেতৃত্ব/ইমামত

১. ইমামত আয়্‌মা বা খিলাফত।–('ইমারাত' শিরোনাম দেখুন)

২. নামাযের ইমামত।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

ইমারাত (امارة)–নেতৃত্ব

১. সংজ্ঞা

ইমারত বলতে এখানে আমরা মুসলমানদের খিলাফতকে বুঝাতে চেয়েছি। তেমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানকেও বুঝানো হয়েছে।

–বিভিন্ন শহরে প্রশাসক হিসেবে গোলামদেরকে নিয়োগ দান।–('রিককুন' শিরোনাম দেখুন)

২. হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিতে ইমারাত বা নেতৃত্বের জন্য নিম্নোক্ত দুটো বিষয়ের যে কোনো একটি অপরিহার্য ঃ

www.amarboi.org

এক. বাইয়াত ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর পূর্ববর্তী দুজন খলীফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) বাইয়াতের মাধ্যমে খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য একথাও ঠিক, হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা)-কে খলীফা হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) ততোক্ষণ খলীফার দায়িত্বভার গ্রহণ করেননি যতোক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ তাঁর কাছে বাইয়াত না করেছেন। অবশ্য হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতের বাইয়াত ভিন্ন পদ্ধতিতে হয়েছিলো। হযরত ওমর (রা) পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছ'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে একটি কমিটি করে গিয়েছিলেন, যেন তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করে পরবর্তী খলীফা কে হবেন তা ঠিক করতে পারেন। সেই ছ'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হচ্ছেন—হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা), হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা), হযরত তালহা ইবনু আবদুল্লাহ (রা), হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)। হযরত ওমর (রা) খিলাফতের জন্য কাউকে মনোনীত করে যাওয়া পসন্দ করেননি। তিনি বলেছেন—এতো বড়ো একটি বোঝা দুনিয়া ও আখিরাতে বয়ে বেড়ানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আল্লাহ যদি আপনাদের কল্যাণ চান, তাহলে যিনি আপনাদের মধ্যে উত্তম তার ব্যাপারে আপনাদেরকে ঐকমত্য করে দেবেন। যেভাবে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করার ব্যাপারে আপনাদেরকে ঐকমত্য করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা)-এর শাহাদাতের পর যখন সেই কমিটির মিটিং বসলো, তখন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) হযরত আলী (রা)-এর নাম প্রস্তাব করলেন। হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-এর নাম প্রস্তাব করলেন। যখন হযরত তালহা (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নাম প্রস্তাব করলেন তখন আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-কে বললেন—আপনাদের দুজনের মধ্যে একজনের নাম প্রস্তাব করুন তাহলে আমরা তাঁর ওপর এ যিম্মাদারী অর্পণ করবো। তাঁরা দুজন চুপ রইলেন। কেউ কিছুই বললেন না। তখন আবদুর রহমান ইবনু আওফ বললেন—আমার ব্যাপারে যে প্রস্তাব এসেছে আমি তা থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং ইসলামের পক্ষ থেকে আমার ওপর যে যিম্মাদারী এসেছে যেন সঠিক ফায়সালায় পৌঁছতে পারি সে জন্য আমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবো। তারপর দুজনের মধ্যে যাকে উত্তম মনে করবো তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করবো। উভয়ে একথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) উভয়ের মর্যাদা বর্ণনা করে বক্তৃতা দিলেন। তারপর উভয়কে পৃথকভাবে ডেকে নিয়ে তাদের থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন, যদি তাঁর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাহলে তিনি আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি অন্যজনের ওপর দায়িত্ব এসে যায় তাহলে তিনি পুরোপুরি আনুগত্য করবেন। অতপর তিনি দুজনের ব্যাপারে জনমত যাঁচাইয়ে (জরিপে) নেমে পড়লেন। কার পক্ষে কতজন মতামত দিলেন তাও তিনি রেকর্ড করলেন। এজন্য তিনি পর্দার আড়ালের মহিলা, মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্রসহ সকল শ্রেণীর জনসাধারণের নিকট গেলেন। এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেদুঈন এবং তিনদিনের মধ্যে যেসব বহিরাগত মদীনায় এলেন তাদেরও মতামত নিলেন।

জরিপের ফলাফলে তিনি বুঝতে পারলেন লোকেরা হযরত ওসমান (রা)-কেই খলীফা হিসেবে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন। তখন তিনি হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-কে

www.amarboi.org

মসজিদে ডেকে নিলেন। তারপর হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য ঘোষণা দিলেন। এভাবে হযরত ওসমান (রা) হযরত ওমর (রা)-এর পর মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত হলেন।[১৯]

দুই. বিজয় এবং প্রাধান্য বিস্তার ঃ হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন, যদি কোনো ব্যক্তি খলীফার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটান এবং জনসাধারণের সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেন তাহলে তিনি শরঈ এবং আইনত খলীফা হিসেবে গণ্য হবেন। তখন আর তার বিরুদ্ধাচারণ জায়েয নেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু রাবাহ বলেন—যখন হযরত ওসমান (রা) অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন আমি এবং আবু কাতাদা (রা) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে হাজ্জে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি আমাদেরকে হাজ্জে যাবার অনুমতি দিলেন। তো আমরা বললাম—আমীরুল মুমিনীন ! আপনি তো দেখছেন আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের তৎপরতা কতদূর পৌঁছে গেছে, এরূপ অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দেন ? তিনি উত্তর দিলেন—আপনারা জামায়াতবদ্ধ থাকবেন। আমি বললাম—আমার আশংকা হচ্ছে সেই জামায়াতের ফায়সালা আবার না বিদ্রোহীদের অনুকূলে যায়। তিনি বললেন—সে যাই হোক সর্বাবস্থায় জামায়াতের সাথে থাকবেন।

আবদুল্লাহ ইবনু রাবাহ বলেন—আমরা তার থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। পথে হাসান ইবনু আলী (রা)-এর সাথে দেখা, যিনি হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে যাচ্ছিলেন। আমরাও তাঁর সাথে ফিরে চললাম। দেখি তিনি কী বলেন। হাসান (রা) বললেন—আমীরুল মুমিনীন ! আমি হাসান ইবনু আলী (রা)। আপনি এ অবস্থায় আমাকে কী নির্দেশ দেন ? হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান (রা) বললেন—'ভাতিজা বসে যাও, দেখো আল্লাহ্ তা'আলা কী ফায়সালা করেন। সত্যি কথা বলতে কি, দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ আমার নেই।' অন্য বর্ণনায় আছে—'যুদ্ধে আমার কোনো আসক্তি নেই।'[২০]

হযরত ওসমান (রা)-এর একথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় তিনি মনে করতেন কোনো ব্যক্তি যদি প্রাধান্য বিস্তার করে ক্ষমতা লাভ করেন যার পেছনে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ, তাহলে শরঈ ও আইনগতভাবে তিনি খলীফা।

৩. খলীফার বক্তৃতা

কোনো ব্যক্তি খলীফা হওয়ার পর তাঁর নীতি ও পলিসি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে বক্তৃতা দেয়া খলীফার কর্তব্য। যখন হযরত ওসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হন তখন দুপুরের কিছু আগে মতান্তরে আসরের পর মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে হাম্‌দ, সানা ও দরূদ শরীফ পাঠের পর তিনি বলেন—তোমরা এক ঠুনকো ঘরে (দুনিয়ায়) জীবনের শেষ সময়টুকু কাটাচ্ছো, তাই মৃত্যুর পূর্বে যতটুকু সম্ভব কল্যাণমূলক কাজ করে নাও। কারো সামনে সকালে আবার কারো সামনে সন্ধ্যায় মৃত্যু এসে দাঁড়িয়ে যাবে। মনে রেখো, দুনিয়া শুধু ধোঁকা আর প্রতারণা। জীবনটাকে এর পেছনে শেষ করে দিয়ো না। তোমাদের জন্য বড়ো ধোঁকাবাজ (শয়তান) আল্লাহ্ সম্পর্কেও তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করো যারা তোমাদের আগে চলে গেছেন। গাফলতি থেকে বাঁচার জন্য এবং পরকালের সফলতার জন্য সর্বদা চেষ্টা-সাধনা করতে থাকো। তারা আজ কোথায় যারা তোমাদের পূর্বে এ দুনিয়াকে আবাদ ও ভোগ করেছিলেন ?

www.amarboi.org

দুনিয়া কি তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করেনি ? দুনিয়াকে সেভাবে গ্রহণ করো যেভাবে আল্লাহ তা গ্রহণ করতে বলেছেন। আখিরাতের অনুসন্ধান করো। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া সম্পর্কে সুন্দর এক উপমা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ

فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○ (الكهف : ٤٥)

"হে নবী ! তাদেরকে দুনিয়ার মর্ম কথাটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন। আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি আর সেই পানি পেয়ে জমিন গাছ-পালা লতা-গুল্মে সুশোভিত হয়ে ওঠে। আবার সেগুলো কদিন পর খড়-কুটা-ভূষি হয়ে যায়। যেগুলোকে বাতাস বয়ে বেড়ায়। আল্লাহ সবকিছুর ওপরই ক্ষমতাবান।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৫)

৪. খলীফা বা আমীরের দায়িত্ব-কর্তব্য

[৪.১] জনসাধারণের অবস্থা জানা ঃ জনসাধারণের হাল অবস্থা জানার চেষ্টা করা খলীফার অন্যতম দায়িত্ব। যেন তাদের দুঃখ দুর্দশা বুঝে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। মূসা ইবনু তালহা বর্ণনা করেছেন—আমি জুম'আর দিন আযানের সময়ও হযরত ওসমান (রা)-কে মানুষের খোঁজ খবর নিতে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজার দর জানার চেষ্টা করতে দেখেছি।[২২]

[৪.২] জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা ঃ খলীফার আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে—জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা। ঐ সমস্ত কথা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা, যার কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায় এবং রক্তপাত হয়। যখন ওসমান (রা) তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে—বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তখন সাতশ' মুহাজির ও আনসার সাহাবা তাঁর সমর্থনে ছিলেন। তারা তাঁকে পুরোপুরি সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু তিনি শুধু নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য মুসলমানদেরকে খুনোখুনিতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে বলেছিলেন—'সেসব লোক যাদের সাথে আমার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে, তাদেরকে আমি কসম দিচ্ছি তারা যেন লড়াই থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে যার যার বাড়িতে চলে যায়। সেই সাথে তিনি নিজের গোলামকে লক্ষ্য করে বললেন—'যারা তরবারি কোষবদ্ধ করে রাখবে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হবে।[২৩]

হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা)-ও একজন। তিনি বলেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-এর বাড়িতে অন্যদের সাথে অবরুদ্ধ ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন বাইরে থেকে আসা তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করলেন। আমিও ওসমান (রা)-কে বললা—'এখনো কি যুদ্ধের উপযুক্ত সময় আসেনি ? অথচ তারা আমাদের এক ভাইকে শহীদ করে দিয়েছে।'

হযরত ওসমান (রা) জবাব দিলেন—'আবু হুরাইরা ! আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, তোমার তরবারি ফেলে দাও। আসল কথা হচ্ছে তারা শুধু আমার জান চাচ্ছে ------------ কিন্তু আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও মুসলমানদের জীবন বাঁচাতে চাই। এতে আমি সফল হবো।'

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন—'ওসমান (রা)-এর কথা শুনে আমি তরবারি ফেলে দিলাম। আমি আজও জানি না সেই তরবারিটি কোথায় আছে।[২৪]

[৪.৩] জনগণের মালের হিফাযত করাও খলীফার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—খলীফার আর্থিক অবস্থা যদি সচ্ছল হয় তাহলে বাইতুলমাল থেকে তার ভাতা না নেয়া উচিত। তিনি নিজেও বাইতুলমাল থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না, নিজের ব্যবস্থাপনায় সংসার চালাতেন।

[৪.৪] স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য পরিহার করে সাধারণভাবে চলা ঃ খলীফার দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি এমনভাবে চলবেন, যাতে জনসাধারণের চেয়ে তাঁকে পৃথক মনে না হয়। হযরত ওসমান (রা) যখন খলীফা তখনো তিনি মসজিদেই কাইলুলা (দুপুরের খাওয়ার পর বিশ্রাম বা একটু গড়াগড়ি) করতেন। যখন তিনি কাইলুলা থেকে ওঠতেন তখন তার শরীরে পাথর কণার দাগ সুস্পষ্ট দেখা যেত।[২৬]

হযরত হাসান (রা) বলেন—আমি দেখেছি হযরত ওসমান (রা) মসজিদে নববীতে মাথার নিচে চাদর দিয়ে শুয়ে আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সেখানে বসলেন। কিছুক্ষণ পর আরেক ব্যক্তি এলেন। তিনিও তার কাছে গিয়ে বসলেন। তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো তিনিও সাধারণ লোকদের একজন।[২৭]

[৪.৫] আহকামে শরীআহ্‌র বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ ঃ খলীফার দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে এটিও একটি যে, তিনি অন্যদের মত নিজেও শরঈ বিধান মেনে চলবেন। এ ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে নিজেকে পৃথক মর্যাদার অধিকারী মনে করবেন না। এজন্যই হযরত ওসমান (রা) খলীফা হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কিসাসের জন্য পেশ করেছিলেন। যদিও তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হয়নি।[২৮]

[৪.৬] নিজের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার স্বীকারোক্তি ঃ খলীফার উচিত তিনি তার ভুলত্রুটি ও দুর্বলতার কথা স্বীকার করবেন এবং তা শুধরানোর চেষ্টা করবেন।

বর্ণিত আছে—হযরত ওসমান (রা) কোনো এক ব্যাপারে কুফাবাসীকে পত্র লিখলেন। যার কারণে সেখানকার লোকজন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো। তখন তিনি বললেন—'আমি তো আর নিক্তি নই যে, আমার কোনো কথা বেশকম হবে না।'[২৯]

[৪.৭] পদক্ষেপ গ্রহণে প্রজ্ঞা ও গভীর চিন্তা-ভাবনা ঃ খলীফা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বিজ্ঞচিত পদক্ষেপ নেবেন এটি তার অন্যতম কর্তব্য। বিশেষ করে যখন কোনো মুসলমানকে ছাড় দেয়ার প্রশ্ন আসে। যেমন আমরা দেখতে পাই হযরত ওমর (রা) যখন অগ্নি উপাসক আবু লুলুর হাতে আহত হন, আগের দিন সকালে ওমর (রা)-এর ছেলে উবাইদুল্লাহ আবু লুলুর কন্যাকে হত্যা করেন। সেই সাথে জুফাইনা নামক এক খৃষ্টান এবং হরমুজান নামক আরো দুজনকে হত্যা করেন। বলা হয়ে থাকে তাদের লোকজনই হযরত ওমর (রা)-কে শহীদ করার জন্য আবু লুলুকে উৎসাহিত করেছে। হযরত ওমর (রা) জানতে পেরে তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। তারপর মামলার শুনানী শুরু হলো। ইতোমধ্যে ওমর (রা) শাহাদাত বরণ করলেন এবং হযরত ওসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। [খলীফা হওয়ার পর তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর বিষয়টি নিয়ে পরামর্শে বসলেন] হযরত আলী (রা) পরামর্শ

www.amarboi.org

দিলেন—তার থেকে কিসাস না নেয়া ইনসাফের কথা নয়। আপনি এ লোকগুলোকে হত্যার অপরাধে কিসাস স্বরূপ উবাইদুল্লাহকে হত্যার নির্দেশ দিন। একথা শুনে কতিপয় মুহাজির সাহাবা (রা) বললেন—কী আশ্চর্য ! কাল এর পিতাকে শহীদ করা হয়েছে আর আজ কিসাস স্বরূপ তাঁর ছেলেকেও হত্যা করা হবে ! তখন ওসমান (রা) নিহত তিনজনের দিয়াত (রক্তপণ) বাইতুলমাল থেকে আদায় করে দিলেন। তাদের কোনো ওয়ালী (অভিভাবক) না থাকায় সেই দিয়াতের সম্পদ পুনরায় বাইতুলমালেই জমা করা হলো। এটি ছিলো খলীফা ওসমান (রা)-এর সময়োপযোগী এবং বিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত। এভাবে হযরত ওসমান (রা) উবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করলেন।[৩০] হযরত ওসমান (রা)-এর এ ফায়সালার আরেকটি দিকও আছে, যে সম্পর্কে আমরা 'জিনাইয়া' শিরোনামে আলোচনা করেছি।

অনুরূপভাবে যখন মিসর থেকে আগত বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো—তিনি চারণভূমি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন এবং কুরআন মজীদ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি হাজ্জের সময় মক্কায় কসর নামায না পড়ে পুরো নামাযই পড়ে থাকেন। আর যুবকদেরকে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এমনকি ভাতা দানের ব্যাপারেও অন্যদের থেকে বনী উমাইয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

একথার জবাবে হযরত আলী (রা) লোকদেরকে বললেন—চারণ ভূমি সম্পর্কে আপনারা যে অভিযোগ করেছেন তা পুরোপুরি সত্যি নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে তিনি নিজের উট চরানোর জন্য চারণ ভূমি নির্দিষ্ট করে রাখেননি, বাইতুলমালের উট চরানোর জন্য তা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। যেন বাইতুলমালের উটগুলো সেখানে চরে মোটাতাজা হতে পারে। হযরত ওমর (রা)-এর সময়ও তো এরূপ ব্যবস্থাপনা ছিলো। আর কুরআন মজীদ পুড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে যে অভিযোগ আপনারা এনেছেন, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে—যেসব কপিতে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার উপকরণ ছিলো সেগুলো তিনি পুড়িয়ে দিয়েছেন। আর ঐসব কপি সংরক্ষণ করেছেন যে সম্পর্কে সাহাবাদের ঐকমত্য আছে এবং তা সেই তারতীব অনুযায়ী লিখিত যে তারতীব অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষবারের মত জিবরাঈল (আ) শুনিয়েছিলেন। এবার রইলো, তিনি হাজ্জের সময় মক্কা মুকাররমায় নামায কসর না পড়ে পুরো নামায পড়েন। এর কারণ তিনি সেখানে বিয়ে করেছেন এবং হাজ্জের সময় সেখানে থাকার নিয়ত করেছিলেন। যুবকদেরকে গভর্নর বানানোর ব্যাপারে যে অভিযোগ আপনারা করেছেন, তা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক নয়, কারণ যাদেরকে গভর্নর করেছেন তারা সবাই বালেগ, বুদ্ধিমান এবং ন্যায়বিচারক। এ ধরনের লোক থেকে সহযোগিতা নেয়ার দৃষ্টান্ত স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ও ছিলো। তিনি হযরত আত্তাব ইবনু উসাইদ (রহ)-কে বিশ বছর বয়সে মক্কার গভর্নর বানিয়ে ছিলেন। তেমনিভাবে হযরত ওসামা ইবনু যায়িদ (রা)-কে (যিনি কেবল যৌবনে পা দিয়েছিলেন) তিনি সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। যে সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তি আপত্তিও করেছিলেন। আপনাদের সর্বশেষ অভিযোগ হচ্ছে—তিনি ভাতার ব্যাপারে বনী উমাইয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কোনো কোনো সময় কুরাইশদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।

এরপর হযরত ওসমান (রা) অনেক সাহাবাদের উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অভিযোগ খণ্ডনের মনস্থ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, যে অভিযোগ তারা উত্থাপন করেছে—যুক্তি-

www.amarboi.org

তর্কে এর কোনো সমাধান হবে না, এতো বিদ্রোহের পূর্বাভাষ। তার চেয়ে ভালো নিজের ভুল স্বীকার করে তাওবা করে নেয়া এবং হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর পথে চলার প্রতিশ্রুতি দেয়া। তাহলে হয়তো ফিতনা শেষ হয়ে যাবে।

একথা ভেবে তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যতিক্রম এক বক্তৃতা দিলেন। পেছনের যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করলেন। এবং আল্লাহর দরবারে এ বলে প্রার্থনা কললেন—'হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। আর আমার যেসব ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে সে জন্য তাওবা করছি।'

একথা বলার সাথে সাথে তাঁর চোখ থেকে অঝরধারায় পানি ঝরতে লাগলো। অবস্থা দেখে লোকজনও কান্না জুড়ে দিলো। চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে গেলো। তখন হযরত ওসমান (রা) লোকদেরকে সাক্ষ্য রেখে শায়খাইন—অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই সাথে তিনি তার বাড়ির দরোজা সকলের জন্য খোলা রাখার নির্দেশ দিলেন। কারো প্রবেশেই কোনো বাধা রইলো না।[৩১]

এখানেও আমরা দেখতে পাই—হযরত ওসমান (রা) ফিতনা নির্মূলের জন্য কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও হিকমত অবলম্বন করেছেন এবং মুসলমানগণ যেন দলে উপদলে বিভক্ত না হয়ে সংঘবদ্ধ থাকেন, সেই চেষ্টাই তিনি আপ্রাণ চালিয়ে গেছেন।

[৪.৮] নামাযের ইমামত ঃ আমীর বা খলীফার এটিও একটি দায়িত্ব যে, তিনি লোকদেরকে জামায়াতের সাথে নামায পড়াবেন। যদি কোনো কারণে তিনি না পড়াতে পারেন তাহলে যে কোনো মুসলমান তার পরিবর্তে ইমামত করতে পারবেন। এমনকি বিদ্রোহীদের মধ্য থেকেও কোনো ব্যক্তি নামায পড়াতে পারেন। যেমন উবাইদুল্লাহ ইবনু আদী ইবনু খিয়ার বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) যখন অবরুদ্ধ ছিলেন তখন আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি আমীরুল মুমিনীন কিন্তু আপনার বর্তমান অবস্থাতো আমরা দেখতেই পাচ্ছি, এদিকে এমন এক ব্যক্তি আমাদেরকে নামায পড়াচ্ছেন যিনি বিদ্রোহীদের অন্যতম। ব্যাপারটি আমাদের পসন্দ নয়। তিনি বললেন—নামায মানুষের সর্বোত্তম আমল। যখন কোনো লোক ভালো কাজ করতে চায় তখন তার সঙ্গ দেয়া উচিত। যদি কেউ অন্যায় কাজ করে, তার থেকে বেঁচে থাকা উচিত।[৩২]

[৪.৯] গভর্নর, বিচারক সহ অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়ার দায়িত্বও খলীফার।-(কাযা শিরোনাম দেখুন)

[৪.১০] হাদ কার্যকরী করা ঃ হাদ ঠিকমত কার্যকর করা হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য।-('হাদ' শিরোনাম দেখুন)

৫. খলীফার ব্যাপারে নাগরিকদের যিম্মাদারী

[৫.১] নসীহত এবং কল্যাণ কামনা ঃ খলীফার কল্যাণ কামনা করা এবং তাঁকে সবসময় সদুপদেশ দেয়া জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য। খলীফার কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের উপদেশ ও পরামর্শ শোনা এবং তা মেনে চলা। হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে হিমস্ এর

www.amarboi.org

অধিবাসী এক ভদ্রলোক যার নাম ছিলো কুরাইব ইবনু সাইফ কিংবা সাইফ ইবনু কুরাইব হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। ওসমান (রা) তাকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনি কিভাবে এসেছেন ? অর্থাৎ অনুমতি নিয়ে নাকি জোর করে ? আগন্তুক জবাব দিলেন—আমি তো আপনাকে কল্যাণকর কিছু পরামর্শ দেবো এ আবেগ নিয়েই এসেছি। তিনি বললেন—কী পরামর্শ ? আগন্তুক বলতে লাগলেন—হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনি যতক্ষণ কোনো মুসলমানের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ না করবেন ততক্ষণ তার ঈমানের ব্যাপারটি তার ওপর ছেড়ে দেবেন না। কোনো মানুষকে আমানতদারীর ব্যাপারে যাঁচাই না করে তার নিকট আমানত অর্পণ করবেন না। কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে কোনো সুস্থ ব্যক্তির নিকট চিকিৎসার জন্য পাঠাবেন না তাহলে সেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। অসুস্থ ব্যক্তির নিরাময় তো আল্লাহ তাআলাই করবেন।'

. হযরত ওসমান (রা) তার কথা শুনে বললেন—আপনার এ পরামর্শের পেছনে কল্যাণ কামনা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য দেখি না।[৩৩]

[৫.২] **প্রকাশ্যে মতবিরোধ করা ঃ** যদি কোনো সময় খলীফা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে পাশ কাটাতে চান তখন তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-কে মদীনা আল মুনাওয়ারা ও মক্কা আল মুকাররমার মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায় কথা বলতে শুনেছি। হযরত ওসমান (রা) লোকদেরকে হাজ্জে তামাত্তু (অন্য বর্ণনায় আছে–হাজ্জে কিরান) থেকে বিরত রাখছিলেন। এটি দেখে হযরত আলী (রা) হাজ্জ এবং ওমরার একত্রে নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করতে লাগলেন এবং বললেন—'হে আল্লাহ ! আমি হাজ্জ এবং ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম বেধেছি।' একথা শুনে হযরত ওসমান (রা) বললেন—'আপনি দেখছেন আমি লোকদেরকে এরূপ করতে বাধা দিচ্ছি আর আপনি নিজেই এরূপ করলেন !' আলী (রা) জবাব দিলেন—'আমি কোনো মানুষের কথায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে পারি না।'[৩৪]

[৫.৩] **খলীফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার না করা ঃ** আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি বিশেষ ক্ষেত্রে খলীফার সাথে মতবিরোধ করা জায়েয। তাই বলে খলীফার বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমে যাওয়া জায়েয নেই। মতবিরোধ ও অপপ্রচারের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমরা ইতোপূর্বে আরো বলেছি আবেগে কিছু লোককে হত্যার অপরাধে উবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-কে হযরত ওসমান (রা) মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে বরং বাইতুলমাল থেকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করে দিয়েছিলেন। তখন যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল বায়াযী এ প্রসঙ্গে একটি কবিতাও রচনা করেন। .যা উবাইদুল্লাহকে দেখলেই তিনি আবৃত্তি করা শুরু করে দিতেন। কবিতাটি নিম্নরূপ—

হে আবদুল্লাহ ! তুমি কোথায় লুকোতে
কিংবা আশ্রয় নিতে,
যদি না ওসমান থাকতেন ধরাতে ?
তুমি অন্যায়ভাবে করেছো খুন
বহায়ে দিয়েছো রক্ত বান

www.amarboi.org

যেভাবে মহান ব্যক্তিকে অকারণে
হত্যা করেছে হরমুজান।
যদি কেউ বলে ওমর হত্যার ব্যাপারে
এটি কি নয় উৎস ভাই ?
বিপদে আক্রান্ত এক নির্বোধ বলবে
হা, উৎস যে ঠিক তাই।
তাকে হত্যার ইঙ্গিত ও হুকুম
সেথায় যে আমরা পাই।

উবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন। তিনি যিয়াদকে ডেকে পাঠালেন। যিয়াদ স্বয়ং হযরত ওসমান (রা)-কে অভিযুক্ত করে আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন।

হে আবু আমর ! আপনি কি জানেন না
হরমুজানের হত্যার জের চলছে
যে হত্যা ঘটিয়েছে উবাইদুল্লাহ
তার ব্যাপারে কি আপনি এখনো
খাচ্ছেন সন্দেহ-সংশয়ে দোলা ?
এমন এক ব্যক্তিকে করেছেন ক্ষমা
যার অপরাধের হয় না কোনো তুলনা
তাছাড়া তাকে ক্ষমার অধিকারও ছিলো না।

হযরত ওসমান (রা) যিয়াদকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। ফলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলা ছেড়ে দিলেন।[৩৫]

ইযিন (اذن)—অনুমতি/সম্মতি

বিস্তারিত জানার জন্য 'ইস্‌তিযান' শিরোনাম দেখুন।

ইয়াওমু আরাফা (يوم عرفة)—আরাফাতের দিন

৯ই যিলহাজ্জ তারিখকে 'ইয়াওমু আরাফা' বলে।

—সেদিন আরাফাতে অবস্থান।—('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

—আরাফাতের দিনে রোযা।—('সিয়াম' শিরোনাম দেখুন)

ইয়াওমুশ্‌ শাক্কি (يوم الشك)—সন্দেহের দিন

শাবান মাসের ২৯ তারিখের পরের দিনকে ইয়াওমুশ শাক্কি বা সন্দেহের দিন বলে, যদি ২৯ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা না যায়।

—সন্দেহের দিনের রোযা।—('সিয়াম' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

ইয়াতীম (يتيم)–ইয়াতিম

ইয়াতীম ঐ বাচ্চাকে বলে যার পিতা ইন্তিকাল করেছেন এবং এখনো সে বালেগ হয়নি।

–ইয়াতীমের অভিভাবকত্ব।–('ওয়াসী' শিরোনাম দেখুন)

–গানীমাতের সম্পদে ইয়াতীমের অংশ।–('গানীমাত' শিরোনাম দেখুন)

ইয়াদুন (يد)–হাত

হাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মত অপরাধ।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

ইয়ামীন (يمين)–শপথ

১. আল্লাহর নামে কিংবা আল্লাহর কোনো গুণবাচক নামকে কোনো কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করে শপথ করাকে 'ইয়ামীন' বলে।

২. বিচারকের সামনে শপথ করা।–('কাযা' শিরোনাম দেখুন)

৩. অনমনীয় শপথ।–('কাযা' এবং 'রিযা' শিরোনাম দেখুন)

[৩.১] হত্যা সংক্রান্ত শপথ।–('কাসামাত' শিরোনাম দেখুন)

[৩.২] স্ত্রীর সাথে বিছানায় না যাওয়ার শপথ।–('ঈলা' শিরোনাম দেখুন)

৪. শপথের কাফ্‌ফারা ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শপথের কাফ্‌ফারা সংক্রান্ত বিধান দিয়েছেন এভাবে ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ (المائدة : ٨٩)

"আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য, কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা মজবুতভাবে করে থাক। এর কাফফারা—প্রতিকার—দশজন মিসকীনকে আহার করানো। মধ্যম মানের আহার, যা তোমাদের নিজের পরিজনদের করিয়ে থাক ! অথবা তাদেরকে কাপড় পরাবে কিংবা একজন গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করে দেবে। এ ধরনের প্রতিকারের সামর্থ যার নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটি হচ্ছে তোমাদের কৃত শপথের কাফ্‌ফারা। তোমরা শপথ রক্ষার্থে সচেষ্ট হবে।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৮৯)

ইরছ (ارث)–উত্তরাধিকার/মীরাস

মীরাস বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অবস্থান জানার জন্য আমরা নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো।

www.amarboi.org

১. হযরত ওসমান (রা)-এর মীরাস (উত্তরাধিকার) সংক্রান্ত ইল্‌ম। ২. ঐ সমস্ত কারণ যার ভিত্তিতে একজন লোক ওয়ারিশ হয়। ৩. ওয়ারিশ হওয়ার শর্তাবলী এবং বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ৪. ওয়ারিশদের বর্ণনা। [৪.১] প্রসঙ্গ কথা। [৪.২] ওয়ারিশ হিসেবে পিতার বিভিন্ন অবস্থা। [৪.৩] স্বামীর অংশ। [৪.৪] স্ত্রীর অংশ। [৪.৫] দাদার অংশ। [৪.৬] দাদীর অংশ। [৪.৭] মায়ের অংশ ও অবস্থা। [৪.৮] বৈপিত্রেয় ভাই বোনের অংশ। [৪.৯] মাওয়ালীর অংশ। [৪.১০] যাবিল আরহামের অংশ। [৪.১১] বাইতুলমাল এবং ৫. 'রদ'।

১. হযরত ওসমান (রা)-এর মীরাস সংক্রান্ত ইল্‌ম

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে যারা মীরাস সংক্রান্ত ইল্‌মে গভীর জ্ঞান রাখতেন তাদের সংখ্যা বেশী ছিলো না। সেই অল্প সংখ্যক সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা)ও একজন। ইমাম যুহ্‌রী বলেন—এমন একটি সময় এসেছিলো, তখন যদি হযরত ওসমান (রা) ও হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) জীবিত না থাকতেন তাহলে উত্তরাধিকারের ইলম পৃথিবী থেকে শেষ হয়ে যেত। কারণ সেই সময় তাদের দুজন ছাড়া ফারাইয সম্পর্কে জানা আর কোনো লোক ছিলেন না।[৩৬] কিন্তু আমরা ইমাম যুহ্‌রীর এ মন্তব্যের সাথে একমত নই। কারণ আমরা ফিকহে আলী (রা) ও ফিকহে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) এ উভয় মনীষীর ফারাইয সংক্রান্ত যেসব রায় ও বক্তব্য তুলে ধরেছি, যুহ্‌রীর মন্তব্যকে অসার প্রমাণিত করার জন্য সেটিই যথেষ্ট। অবশ্য ইমাম যুহ্‌রীর কথা থেকে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওসমান (রা) ফারাইয সংক্রান্ত ব্যাপারে অগাধ পাণ্ডিত্য রাখতেন।

২. ঐ সমস্ত কারণ যার ভিত্তিতে একজন লোক ওয়ারিশ হয়

কোনো ব্যক্তি নিম্নোক্ত কারণসমূহের কোনো এক কারণে ওয়ারিশ হয়। যেমন—

[২.১] **আত্মীয়তার সম্পর্ক ঃ** [ক] আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে যারা ওয়ারিশ হন তারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

–আসাবা (পিতার দিক থেকে আত্মীয়) যেমন–ফুফু, তিনি মায়ের দিক থেকে আত্মীয় নন।

–আসহাবুল ফরূয (এমন আত্মীয় যাদের অংশ নির্দিষ্ট)।

–যাবিল আরহাম (মায়ের দিক থেকে আত্মীয়) যেমন, সন্তান, বৈপিত্রেয় ভাই প্রমুখ।

[খ] যদি অমুসলিম কোনো মহিলা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসে এবং তার সাথে সন্তান থাকে আর সেই মহিলা দাবী করে যে, এটি আমার সন্তান (পারিভাষিক অর্থে এ ধরনের সন্তানকে 'হামীল' বলে।) তার দাবী ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারবে। একবার হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এ ধরনের একটি মামলা দায়ের করা হলো। তিনি অন্যান্য সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা প্রত্যেকে তাদের মতামত জানালেন। অতপর হযরত ওসমান (রা) বললেন—'আমরা আল্লাহর সম্পদ বিনা প্রমাণে লোকদের মাঝে বন্টন করতে থাকবো, এটি আমার নিকট সংগত মনে হয় না। তাই প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের সন্তানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে অংশ দেয়া যাবে না।[৩৭]

www.amarboi.org

[গ] হযরত ওসমান (রা) অনারব মুশরিক এবং তাদের শির্কের সময়কালিন সন্তানদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়ার উপযুক্ত মনে করতেন না। যদিও সে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যেত। এর কারণ হচ্ছে ইসলাম পূর্ব সময়ে এমন অবাধে যিনা ব্যভিচার চলতো, হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন কোনো মানুষের ব্যাপারে নিশ্চিত বলা যেতে পারে না যে, অমুক অমুকের ছেলে। পক্ষান্তরে আরবের মুশরিক ও ইসলামপূর্ব যুগে তাদের সন্তানদের বেলায় তাঁর অভিমত হচ্ছে—তারা পরস্পর একে অপরের ওয়ারিশ হবে। (কারণ আরবে ইসলামপূর্ব সময়েও এতো ব্যাপকভাবে যিনার প্রচলন ছিলো না)। মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে—ইসলামপূর্ব সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে এমন অনারব সন্তান ও পিতার মধ্যে ইসলামী আইন অনুযায়ী ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারটি হযরত ওসমান (রা) মেনে নিতেন না। অন্য বর্ণনায় আছে—মুশরিকদের সন্তানের বেলায়ও তাঁর একই অভিমত ছিলো।[৩৮]

[২.২] বিয়ে ঃ বিয়ের কারণে স্বামী স্ত্রী একে অপরের সম্পদে অংশ পায়। যদি মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় থাকে।

[ক] এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন কিন্তু তখনো স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হয়নি। এমতাবস্থায় কোনো একজন মারা গেলেন। তো যিনি জীবিত থাকবেন তিনি অন্য জনের (পরিত্যক্ত) সম্পদে ওয়ারিশ হবেন।[৩৯] হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর স্ত্রীর ইদ্দতের তৃতীয় হায়িয শুরু হয়ে যায় (এবং শেষ না হয়), এমতাবস্থায় তাদের একজন মারা গেলে অন্যজন তার সম্পদে ওয়ারিস হবে।[৪০] তদ্রূপ কোনো কারণে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত যদি দীর্ঘ হয় যেমন এক কিংবা দু হায়িযের পর তৃতীয় হায়িয শুরু হতে বিলম্ব হলো। এমতাবস্থায় যদি দুজনের কোনো একজন মারা যায় তাহলে অন্যজন ওয়ারিস হবে। হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতের সময়ের প্রসিদ্ধ ঘটনা। হিব্বান ইবনু মুনকায (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। তখন তিনি সুস্থ ছিলেন। তাঁর এক সন্তান ছিলো এবং সেই সন্তান তার স্ত্রীর দুধপান করতো। একাধারে সতেরো মাস পর্যন্ত সেই মহিলার হায়িয হলো না। হিব্বান (রা) স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ৭/৮ মাস পর অসুস্থ হয়ে গেলেন। কেউ তাকে বললেন —এ অবস্থায় আপনি মারা গেলে আপনার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীতো আপনার সম্পদের ওয়ারিশ হবে। তিনি বললেন—আমাকে ওহযরত সমান (রা)-এর কাছে নিয়ে চলুন। লোকেরা তাকে ওসমান (রা)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সেই সময় ওসমান (রা)-এর নিকট হযরত আলী (রা) এবং হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন—এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী? তাঁরা উভয়ে জবাব দিলেন—আমরা মনে করি তারা একে অপরের ওয়ারিশ হবে। যদি হিব্বান (রা) মারা যায় তাহলে স্ত্রী তার সম্পদের অংশ পাবে আর স্ত্রী মারা গেলে হিব্বান (রা) তার সম্পদে অংশ পাবে। কারণ এ মহিলার বয়স এতোবেশী নয় যে তার আর হায়িয হবে না। আবার সে এতো কম বয়সেরও নয় যে তার হায়িয শুরুই হয়নি। তাই তার ইদ্দত হায়িযের হিসেবেই গণনা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটিই তার ইদ্দতের সময়কাল। তখন হিব্বান (রা) ফিরে গিয়ে স্ত্রী থেকে তাঁর দুধের সন্তানকে ফিরিয়ে আনলেন। বাচ্চা ফিরিয়ে আনার পর যখন দুধ খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গেলো তখনই সেই মহিলার হায়িয শুরু হলো। দু' হায়িয শেষ হয়ে তৃতীয় হায়িয চলাকালিন সময় হিব্বান (রা) ইন্তিকাল করলেন। তখন স্ত্রী বিধবার ইদ্দত পালন করলেন এবং তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদে ওয়ারিশ হলেন।[৪১]

www.amarboi.org

অবশ্য যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে স্বামী স্ত্রীর কোনো একজন মারা গেলে একজন আরেকজনের ওয়ারিশ হবেন না।

[খ] তালাকুল ফিরার এর অবস্থায় ওয়ারিশ হওয়া ঃ 'তালাকুল ফিরার বলতে এমন তালাককে বুঝায় যা মারজুল মাওত (মৃত্যু–অসুখ)-এর সময় স্ত্রীকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য দেয়া হয়।

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি দুজনের কোনো একজন মারা যায় তাহলে অপরজন মৃত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত) সম্পদে অংশ পাবেন। কিন্তু কেউ যদি মারজুল মাওত (মৃত্যু–অসুখ)-এর সময় তার স্ত্রীকে তালাক দেন এবং মারা যান তাহলে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পরও তিনি স্বামীর (পরিত্যক্ত) সম্পদে অংশীদার হবেন। কারণ মারজুল মাওতের সময় স্ত্রীকে তালাক দেয়া মানেই তাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা করা। কাজেই তার সাথে এরূপ আচরণই করা দরকার যাতে তার উদ্দেশ্য সফল না হয়। তা হচ্ছে তার মৃত্যুর আগে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেও তাকে স্বামীর সম্পদের ওয়ারিশ ঘোষণা করা।

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ের আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে—আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-এর একজন স্ত্রী ছিলেন। নাম তামাযুর বিনতুল আসবাগুল কালবিয়্যা। তার সাথে তিনি এ্যাডজাষ্ট করতে পারেননি। এজন্য তিনি সুন্নাত পদ্ধতিতে তালাক দেয়ার ইচ্ছে করে দু পবিত্রাবস্থায় তাকে দু তালাক দেন। অতপর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত ওসমান (রা) জানতে পেরে আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-কে পরামর্শ দিলেন—স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে। বললেন—এ অবস্থায় আপনার মৃত্যু হলে স্ত্রী অংশ পাবে। (তার চেয়ে ভালো ফিরিয়ে নিয়ে খেদমত নেয়া)। অতপর স্ত্রী যখন আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-কে তৃতীয় তালাকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন তোমার পবিত্রাবস্থা যখন শুরু হবে তখন আমাকে বলবে। পবিত্রাবস্থা শুরু হওয়ার পর তিনি আবদুর রহমান (রা)-কে অবহিত করলেন। তখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় শেষ তালাকটিও দিয়ে দিলেন। তার কদিন পর সেই অসুখেই তিনি মারা গেলেন। তখন ওসমান (রা) তাঁর সম্পদ থেকে ঐ স্ত্রীকে অংশ দিলেন।[৪২]

এরূপ আরেকটি ঘটনা হচ্ছে, আবদুর রহমান ইবনু মুকাম্মাল (রা)-এর। তাঁর প্যারালাইসিস হলে তিনিও তাঁর দু স্ত্রীকে তালাক দিলেন। তালাক দেয়ার পর তিনি দু বছর জীবিত রইলেন। ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি ইন্তিকাল করলেন। হযরত ওসমান (রা) তার দু স্ত্রীকেই অংশ দিয়ে দিলেন।[৪৩]

[গ] তদ্রূপ কোনো ব্যক্তি যদি সারাক্ষণ (নিরাপত্তার অভাবে) নিজের জীবনকে সংকটপূর্ণ মনে করেন, আর এরূপ অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেন, তাহলে এ মাসয়ালা সেই ব্যক্তির ওপর কিয়াস করা যায় যিনি মারজুল মাওত এর সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। আমাদের জানা নেই, এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর অবস্থান কী ছিলো। অবশ্য এ সংক্রান্ত যে বর্ণনা আমাদের কাছে এসে পৌঁছুছে তা হচ্ছে—ওসমান (রা)-এর এক স্ত্রীর নাম ছিলো উম্মুল বানীন বিনতু উ'আইনাহ ইবনু হাসান। তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে যখন বিদ্রোহীরা তার বাড়ি অবরোধ করে রাখে তখন তিনি সেই স্ত্রীকে তালাক দেন। অতপর যখন তিনি শাহাদাত বরণ করেন তখন উম্মুল বানীন হযরত আলী (রা)-এর নিকট এসে ফায়সালা চাইলেন। হযরত

www.amarboi.org

আলী (রা) বললেন—হযরত ওসমান (রা) প্রথমে তো তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখেছিলেন কিন্তু যখন মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এলো তখনই তাকে তালাক দিলেন। তখন হযরত আলী (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার অংশ দিয়ে দিলেন।[৪৪]

[২.৩] ওয়ালা'র ভিত্তিতে ওয়ারিশ ঃ ওয়ালা ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে তৃতীয় কারণ। যা ইতকুন (যা দাসত্ব মুক্তি)-এর সাথে জড়িত। হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন 'ওয়ালা' এর ভিত্তিতে একে অপরের ওয়ারিশ হয়।[৪৫]

'ওয়ালা'র আরেক অবস্থা হচ্ছে—দু' ব্যক্তির মধ্যে এমন চুক্তি পাওয়া যাওয়া যাতে বুঝা যায় তাদের একজনের মৃত্যুতে অন্যজন ওয়ারিশ হবে। যেমন তারা চুক্তি করলেন, তাদের একজন কোনো অপরাধ সংঘটিত করলে অন্যজন তার পক্ষ থেকে ফিদইয়া বা রক্তপণ (দিয়াত) পরিশোধ করবে। আমাদের পক্ষে এটি বলা কষ্টকর যে, হযরত ওসমান (রা) ওয়ালার এ অবস্থা অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক ওয়ালাকে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছেন কিনা। কারণ এ সম্পর্কে আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর অবস্থানের ব্যাপারে কোনো রিওয়ায়েত পাইনি।

৩. ওয়ারিশ হওয়ার শর্তাবলী ও বঞ্চিত হওয়ার কারণসমূহ

দু ব্যক্তির মাঝে ততক্ষণ ওয়ারিশী সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না যতক্ষণ নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া না যাবে। এ সম্পর্কে সমস্ত উম্মত ঐকমত্য।

[৩.১] মৃত্যু ঃ মৃত্যু সংঘটিত হতে হবে। সেই মৃত্যু, সত্যিকারের মৃত্যুই হোক, কিংবা ঘোষণাকৃত মৃত্যু। সত্যিকার মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই অবহিত, ঘোষণা কৃত মৃত্যুর উদাহরণ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ, বিচারক তার ব্যাপারে রায় দিলেন—তাকে মৃত মনে করা যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় তার পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে।

[৩.২] ওয়ারিশদের জীবিত থাকা ঃ হতে পারে সত্যিকার অর্থে জীবিত কিংবা আনুমানিক জীবিত। সত্যিকার জীবিতাবস্থা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। তবে আনুমানিক জীবিতাবস্থার নির্দেশ দেয়ার উদাহরণ হচ্ছে কোনো সন্তান মায়ের পেটে আছে এখনো ভূমিষ্ট হয়নি তাকে জীবিত বলে মনে করা।

[৩.৩] মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় হওয়া ঃ এর অর্থ মৃত ব্যক্তির এমন কোনো আত্মীয় না থাকা যিনি উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তার চেয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। যে কারণে তিনি ওয়ারিশ হতে বঞ্চিত হতে পারেন। সামনে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

[৩.৪] ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। এ প্রতিবন্ধকতা কয়েক রকম হতে পারে। যেমন—

[ক] ওয়ারিশ এবং মূরিস (মৃত ব্যক্তি, যিনি সম্পদ রেখে মারা যান) উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দীনের অনুসারী হওয়া। অর্থাৎ তাদের একজন মুসলিম এবং আরেকজন অমুসলিম হলে কেউ কারো ওয়ারিশ হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ -

"মুসলিম কোনো অমুলিমের এবং অমুসলিম কোনো মুসলিমের ওয়ারিশ হতে পারে না।"[৪৬]

www.amarboi.org

এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—

اَلْكَافِرَةُ يَرِثُهَا اَهْلُ دِيْنِهَا ـ

"অমুসলিম মহিলার ওয়ারিশ তার স্বধর্মী কেউ হবে।"

তাঁর আরেকটি মন্তব্য হচ্ছে—

لَايَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ ـ

"পৃথক পৃথক দীনের অনুসারী হলে একে অপরের ওয়ারিশ হবে না।"[৪৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পত্তি বন্টনের মুহূর্ত পর্যন্ত যদি দীনি পার্থক্য থাকে তাহলে ওয়ারিশ হতে পারবে না, অন্যথায় পারবে। যেমন—একজন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুকালে তার পিতা অমুসলিম ছিলেন কিন্তু (পরিত্যক্ত) সম্পদ বন্টনের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি ছেলের পরিত্যক্ত সম্পদে অংশ পাবেন। আর যদি সম্পদ বন্টনের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে কোনো অংশ পাবেন না।[৪৮] মুহাম্মাদ ইবনু আশআছ (রহ) বর্ণনা করেছেন—তার এক ফুফু ইহুদী অথবা খৃষ্টান অবস্থায় মারা যান। তিনি হযরত ওমর (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তার পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হবেন কে ? হযরত ওমর (রা) বললেন—যারা তার স্বধর্মে আছে তারাই তার সম্পদের ওয়ারিশ। অতপর তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলেন। হযরত ওসমান (রা) বললেন—তুমি কি মনে করেছো আমি ওমরের সেই কথা ভুলে গেছি যা তোমার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছেন। তিনি তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন—তার স্বধর্মী কেউ তার সম্পদের অংশীদার হবে।[৪৯]

আইউব আবু কিলাবা থেকে এবং তিনি অন্য এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—আমাকে এ চিঠি লেখা হয়েছিলো—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আপনি আমাকে লিখেছেন। আমি ইয়াজীদ ইবনু কাতাদার নিকট যেন আপনার মাসয়ালাটি জিজ্ঞেস করি। আমি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করেছি। আমার মা খৃস্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার মায়ের পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে ত্রিশজন গোলাম একজন বাঁদী এবং দুশ' খেজুর গাছ ছিলো। আমি তা বন্টন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য হযরত ওমর (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি এ ফায়সালা দিলেন—আমার মায়ের পরিত্যক্ত সম্পদ তার খৃষ্টান পিতা এবং ভাতিজা পাবে।

ইয়াজীদ ইবনু কাদাতা (রহ) বলেন—এরপর আমার দাদাও ইন্তিকাল করেন। তিনি মুসলমান ছিলেন। এমনকি তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত করেছিলেন এবং তাঁর সাথে হুনাইনের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার এক মেয়ে ছিলো যিনি খৃস্টান ছিলেন। তার সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য তার এক ভাই, সেই খৃষ্টান মেয়ে এবং আমি সকলে মিলে হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে যাই। তিনি তার

www.amarboi.org

পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পদ আমাকে দিয়ে দিলেন। কিন্তু সমস্ত সম্পদ কার্যত এক কিংবা দু বছর সেই খৃষ্টান মেয়ের দখলে ছিলো। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আমি তার ওয়ারিশের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট যাই। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম (রা) বললেন—যিনি সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতেন হযরত ওমর (রা) তাকে তার জন্য নির্দিষ্ট অংশ দিতেন। তখন হযরত ওসমান (রা) দাদার মেয়েকে তার প্রাপ্য অংশ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কারণ হযরত ওসমান (রা)-এর প্রথম ফাসয়ালা তখনও কার্যকরী হয়নি। এসব কিছুর সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

[খ] দাসত্ব ঃ দাসত্বের হিসেবও সেই কারণসমূহের মধ্যে ধরা হয় যে কারণে একজন লোক মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়। সকল ধরনের দাসত্বই এর অন্তর্ভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব-ই হোক কিংবা অপূর্ণাঙ্গ দাসত্ব। যেমন—মুকাতাব (অর্থাৎ এমন দাস যে তার মালিকের সাথে নির্দিষ্ট অর্থ দেয়ার বিনিময়ে মুক্তি-চুক্তি করেছে)।

[গ] হত্যা ঃ অদ্রূপ যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদে ওয়ারিশ হবে না। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর কোনো ভাষ্য আমরা পাইনি। সম্ভবত তিনি হযরত ওমর (রা)-এর অভিমতকেই মেনে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর অভিমত ছিলো—হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদের অংশ পাবে না। চাই সে হত্যা কাণ্ড স্বেচ্ছায় সংঘটিত হোক কিংবা ভুলে।[৫১]

[ঘ] এমন ব্যক্তির বর্তমান থাকা যিনি মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। যেমন—পিতা কিংবা দাদা থাকলে ভাইয়েরা ওয়ারিশ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

৪. ওয়ারিসদের বর্ণনা

[৪.১] ওয়ারিশদের ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর এমন কোনো রিওয়ায়েত আমাদের কাছে পৌছেনি বা আমরা পাইনি। যাতে বিভিন্ন ওয়ারিশদের মিরাসের সকল অবস্থা সম্বলিত বক্তব্য পাওয়া যায়। এর কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে, সমস্ত সাহাবাগণ যেসব ব্যাপারে ঐকমত্য ছিলেন সেসব ব্যাপারে রাবীগণ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজনবোধ করেননি। তাঁরা শুধু ঐসব রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন ওয়ারিশদের সম্পর্কে যেসব ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর দ্বিমত ছিলো। আমরা খুব শীঘ্রই সেসব রিওয়ায়েত বিস্তারিত বর্ণনা করবো।

[৪.২] পিতার অংশ ঃ ওয়ারিশ হিসেবে পিতার তিনটি অবস্থা আছে। একথা সকলেই জানেন এবং এ ব্যাপারে সবাই ঐকমত্য। কিন্তু উত্তরাধিকারে পিতার অংশের সেই বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সাহাবা কিরাম (রা) একমত থাকা সত্ত্বেও রাবীগণ হযরত ওসমান (রা) থেকে কিছু রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তার কারণ এই হতে পারে যে, রিওয়ায়েতগুলো প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারের এমন কিছু বিষয়ের, যার মধ্যে পিতা একটি পক্ষ। পিতার সর্বসম্মত অবস্থা তিনটি—

www.amarboi.org

[ক] যদি মৃত ব্যক্তির ছেলে অথবা নাতি (ছেলের ছেলে) থাকে তাহলে পিতা তার সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন। তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী–

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج -(النساء : ١١)

"যদি মৃত ব্যক্তির ছেলে থাকে তাহলে তার পিতা পাবেন এক ষষ্ঠাংশ।"

[খ] যদি মৃত ব্যক্তির শুধু এক মেয়ে থাকে তার কোনো ভাই না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির পিতা প্রথমে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবেন, তারপর ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করার পর অবশিষ্ট যা থাকবে তাও তিনি (আসাবা হিসেবে) পাবেন।

[গ] যদি মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হন। তার কোনো ছেলে মেয়ে কিংবা নাতি নাতনী না থাকে তাহলে ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের পর যা অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো পিতা পাবেন। ইরশাদ হচ্ছে—

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج -(النساء : ١١)

"যদি মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হয়, পিতা ওয়ারিশ হয় তাহলে মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ।"

এ নির্দেশের তাৎপর্য হচ্ছে—মা এক-তৃতীয়াংশ অবশ্যই পাবেন কিন্তু অবশিষ্ট যা থাকবে তার সমস্তই পিতা পাবেন। কারণ এ আয়াতে সব ওয়ারিশের অংশের বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিন্তু পিতার অংশের কোনো বর্ণনা দেয়া হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ পিতা পাবেন। [এখানে কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর কোনো বর্ণনা আনা হলো না। সামনে যথাসময়ে সেসব বর্ণনা আনা হবে]।

[৪.৩] স্বামীর অংশ ঃ ওয়ারিশ হিসেবে স্বামীর দুটো অবস্থা।

[ক] স্ত্রী যদি নিঃসন্তান হন তাহলে স্বামী তার (পরিত্যক্ত) সম্পদের অর্ধেক পাবেন।

[খ] যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে (সবাই ছেলে হোক কিংবা মেয়ে) তাহলে স্বামী, স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদের এক-চতুর্থাংশ অংশ পাবেন। যেমন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ج -(النساء : ١٢)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পাবে যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমরা এক-চতুর্থাংশ পাবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২)

[৪.৪] স্ত্রীর অংশ ঃ ওয়ারিশ হিসেবে স্ত্রীরও দুটো অবস্থা।

[ক] স্বামী যদি নিঃসন্তান হন তাহলে স্ত্রী একজন হোন কিংবা একাধিক সবাই মিলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের এক-চতুর্থাংশ অংশ পাবেন।

[খ] আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে (ছেলে হোক কিংবা মেয়ে) তাহলে স্ত্রী একজন হোন কিংবা একাধিক সবাই মিলে এক-অষ্টমাংশ অংশ পাবেন। ইরশাদ হচ্ছে—

www.amarboi.org

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ .(النساء : ١٢)

"তোমরা যা রেখে যাবে তোমাদের স্ত্রীগণ তা থেকে এক-চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তারা এক-অষ্টমাংশ পাবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২)

[৪.৫] দাদার অংশ ঃ যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত না থাকেন তাহলে ওয়ারিশী সম্পদে পিতার অংশ দাদা পেয়ে যাবেন। তার সন্তান থাক বা না থাক কিন্তু শর্ত হচ্ছে ভাই যদি না থাকেন। আর যদি ভাই থাকেন তাহলে দাদার অংশ নিয়ে জটিলতা আছে। এ ব্যাপারে সাহাবাগণ ভীষণ ইখ্‌তিলাফ (মতবিরোধ) করেছেন।

যেমন আমি আমার কিতাব ফিকহে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর 'ইরছ' শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মৃত ব্যক্তির দাদা জীবিত থাকলে হযরত আবু বকর (রা) তার ভাইকে কিছুই দিতেন না। কিন্তু ওমর (রা) মৃত ব্যক্তির দাদার সাথে তার ভাইকেও অংশ দিয়েছেন।[৫২] এ সম্পর্কে ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এ 'ইরছ' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আরো বলা হয়েছে—তিনি মৃত ব্যক্তির দাদা ও ভাইকে সমান অংশ দিতে গিয়ে যদি দেখতেন দাদা এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী পাচ্ছে তাহলে তাদেরকে সমান সমান অংশ দিতেন। আর যদি দেখতেন দাদাকে সমান দিতে গিয়ে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম পাচ্ছেন তাহলে আগে দাদাকে এক-তৃতীয়াংশের বুঝ দিয়ে তারপর অবশিষ্ট অংশ ভাইকে দিতেন।[৫৩] এখানে উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির ভাইয়ের উপস্থিতিতে দাদাকে অংশ দেয়ার ব্যাপারে ওমর (রা) সংশয়ে ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর ইজতিহাদের ফলাফলকে বারবার পরিবর্তন করেছেন কিন্তু সর্বশেষ তিনি সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যা আমরা ওপরে বর্ণনা করলাম।

যখন হযরত ওমর (রা) গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি তাঁর চারপাশে যারা উপস্থিত ছিলেন [তাদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা)ও ছিলেন] তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন—আমি দাদার অংশের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যদি আপনারা সঠিক মনে করেন তাহলে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) জবাব দিলেন —যদি এ ব্যাপারে আমরা আপনার সিদ্ধান্তকে মেনে নেই তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত হিদায়াতের ওপর অবিচল থাকারই নামান্তর। আর যদি আমরা আপনার পূর্বসূরী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সিদ্ধান্তের অনুসরণ করি তাহলে তিনিও সিদ্ধান্ত দেবার মত এক খলীফা ছিলেন।[৫৪]

হযরত ওমর (রা)-এর ওফাতের পর হযরত ওসমান (রা) যখন খলীফা হলেন তখন এ মহান ব্যক্তির মধ্যে কার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি এ সংক্রান্ত ফায়সালা করতেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে বলেছেন—তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত না থাকলে এবং দাদা জীবিত থাকলে তিনি পিতার অংশ দাদাকে দিতেন। পিতার উপস্থিতিতে যেমন ভাইবোন কোনো অংশ পান না তেমনিভাবে পিতা না থেকে যদি দাদা থাকেন তাহলে তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে

www.amarboi.org

ভাইবোনের অংশ রহিত করে দেন। সেই ভাইবোন সহোদর হোক কিংবা বৈমাতৃক বা বৈপিতৃক।[৫৫]

অবশ্য অনেকে বলেছেন—এ ব্যাপারে তিনি হযরত ওমর (রা)-এর রায়কে অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি দাদার সাথে মৃত ব্যক্তির ভাইকেও অংশ দিতেন। দাদার এক-তৃতীয়াংশের কম হলে আগে দাদাকে এক-তৃতীয়াংশ পুরো করে তারপর অবশিষ্ট সম্পদ ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

ইমাম মালিক মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন—হযরত মুয়াবিয়া (রা) যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)-কে দাদার অংশ সম্পর্কে জানতে চেয়ে পত্র দিয়েছিলেন। হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) জবাবে লিখেছিলেন—'আপনি আমাকে দাদার অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। এ সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীনগণ যে ফায়সালা করতেন তাদের দুজন [হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)]-এর ফায়সালার সময় আমি সেখানে ছিলাম। তারা মৃত ব্যক্তির এক ভাই থাকলে দাদাকে অর্ধেক আর ভাই দুজন থাকলে দাদাকে এক-তৃতীয়াংশ দিতেন। আর যদি ভাই দুজনের চেয়ে বেশী থাকতো তবু দাদাকে এক-তৃতীয়াংশ দিতেন। দাদার অংশে এর চেয়ে কম করতেন না।'[৫৬]

ইমাম ইবনু হাযম শু'বা ইবনু তাওয়াম থেকে বর্ণনা করেছেন। শু'বা বলেন, হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে আমাদের এক ভাই ইন্তিকাল করেন। ওয়ারিস হিসেবে দাদা এবং কয়েক ভাই রেখে যান। আমরা তার সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর নিকট যাই। তিনি ভাইদের সাথে দাদাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তখন ওমর (রা) মৃত ব্যক্তির ভাই থাকলে দাদাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিতেন। কিছুদিন পর আমাদের আরেক (দীনি) ভাই ইন্তিকাল করলেন। তিনি কয়েক ভাই এবং দাদা রেখে মারা গেলেন। তখন খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন হযরত ওসমান (রা)। তার সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারটি নিয়ে পুনরায় আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি দ্বিতীয়বার ফায়সালা দিলেন এভাবে—দাদা পাবেন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি প্রথমবার দাদাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেয়ার নির্দেশ দিলেন, এখন এক-তৃতীয়াংশ দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন কেন? হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বললেন—আমি দুবারই ক্ষমতাসীন খলীফার সিদ্ধান্তের আলোকে ফায়সালা দিয়েছি।[৫৭]

একবার হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এমন একটি মোকদ্দমা দায়ের করা হলো, যেখানে মৃত ব্যক্তির মা, সহোদর বোন এবং দাদার মধ্যে মৃত ব্যক্তি সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে ফায়সালা চাওয়া হলো। তিনি মা, বোন এবং দাদা প্রত্যেককে এক-তৃতীয়াংশ করে দেয়ার ফায়সালা দিলেন।[৫৮]

সত্যিকথা বলতে কি, এটি এমন এক মাসয়ালা যে সম্পর্কে সাহাবাগণ ঐকমত্য হতে পারেননি। এমনকি বেশী মতানৈক্যের কারণে এ মাসয়ালার নামই উম্মুল ফুরূ' রাখা হয়েছে। বর্ণিত আছে এ মাসয়ালার ব্যাপারে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ সাকাফীও ইমাম আমির ইবনু শুরাহীল আশ শাবীর নিকট ফতোয়া জানতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন—হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি মা, বোন এবং দাদা রেখে মারা যায় তার সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? আমি তাকে বললাম—এটি এমন এক মাসয়ালা

www.amarboi.org

যে সম্পর্কে পাঁচজন জালীলুল কদর সাহাবী—হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ওসমান (রা), হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)—একমত হতে পারেননি। হাজ্জাজ বললেন—এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)-এর অভিমত কী ? নিসন্দেহে তিনি বড়ো মুত্তাকী সাহাবী ছিলেন। আমি জবাবে বললাম—তিনি দাদাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত মনে করে তাকে সেই অংশ প্রদান করতেন যে অংশ পিতার জন্য নির্দিষ্ট। বোনকে কিছু দেননি, মাকে এক-তৃতীয়াংশ দিয়েছেন। হাজ্জাজ আবার জিজ্ঞেস করলেন—এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) কী রায় দিয়েছেন ? আমি বললাম—তিনি পরিত্যক্ত সম্পদকে ছয়ভাগে ভাগ করে এক ভাগ বোনকে, দুই ভাগ দাদাকে এবং এক ভাগ মাকে দিয়েছেন।

হাজ্জাজ আবার জিজ্ঞেস করলেন—এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর অভিমত কী ? আমি বললাম—তিনিও পুরো সম্পত্তিকে ছয় অংশে বিভক্ত করে তিন অংশ বোনকে, দুই অংশ মাকে এবং এক অংশ দাদাকে দেয়ার ব্যাপারে রায় দিয়েছেন। তারপর হাজ্জাজ যায়িদ ইবনু সাবিতের ফতোয়া জানতে চাইলেন। আমি বললাম—তিনি সমস্ত সম্পত্তিকে ন' ভাগে ভাগ করে তিন অংশ মাকে, চার অংশ দাদাকে এবং বোনকে দুই অংশ দেয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি বিচারককে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেন।[৫৯]

[৪.৬] দাদীর ও নানীর অংশ ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর রায় হচ্ছে–দাদী অথবা নানী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। তারা সংখ্যায় একজন হোন কিংবা বেশী। বেশী হলে সকলে এক-ষষ্ঠাংশকে সমান ভাগে ভাগ করে নেবেন। তবে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট দাদী বা নানীর ওয়ারিশ হওয়ার শর্ত হচ্ছে—যার মাধ্যমে তারা দাদী বা নানী হয়েছেন (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা) তারা কেউ জীবিত না থাকা। তারা জীবিত থাকলে দাদী কিংবা নানী কোনো অংশ পাবেন না। কারণ আত্মীয়তার দিক থেকে দাদী অথবা নানীর চেয়ে তারা নিকটতর। এজন্য হযরত ওসমান (রা) মৃত ব্যক্তির পিতা অর্থাৎ দাদীর ছেলের উপস্থিতিতে দাদীকে কোনো অংশ দিতেন না।[৬০]

[৪.৭] মায়ের অংশ ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর মতে মীরাসে মায়ের অংশের বিভিন্ন অবস্থা আছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো—

[ক] যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান (ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী যত নিচেই হোক না কেন) থাকে অথবা দুজন ভাই, দুজন বোন থাকে এমতাবস্থায় মা পাবেন ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)-এর অভিমত হচ্ছে ভাই তিনজনের কম হলে মা এক-তৃতীয়াংশ পাবেন নাকি এক-ষষ্ঠাংশ তা নিয়ে তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে বিতর্কও করেছেন, কিন্তু ওসমান (রা) নিজের মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুনানু বাইহাকী ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন—যদি মৃত ব্যক্তির ভাই শুধু দুজন হয় তাহলে মা এক-তৃতীয়াংশ পাবেন, এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন না। আল্লাহ নিজেই বলেছেন—

www.amarboi.org

فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ج -(النساء : ١١)

"যদি মৃত ব্যক্তির ভাই থাকে তাহলে মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১১)

আরবী ভাষার اخوة শব্দটি দুজন ভাইয়ের কথা বুঝাতে ব্যবহৃত হয় না। দুইয়ের অধিক ভাইকে বুঝানোর জন্য اخوة শব্দটি ব্যবহৃত হয়। হযরত ওসমান (রা) জবাবে বললেন—আমি এ ব্যাপারে আমার সম্মানিত পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত থেকে নড়তে পারি না। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি অঞ্চলে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমতের ওপরই কার্যক্রম অব্যাহত ছিলো এবং লোকজন সেই নীতিমালার ভিত্তিতে মীরাসে তাদের অংশ পেতেন।[৬১]

[খ] যদি মৃত ব্যক্তি নিসন্তান হয় এবং তার দুজন ভাই কিংবা দুজন বোন থাকে, তাহলে মা এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন—

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج -(النساء : ١١)

"যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে পিতামাতা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে আর যদি নিসন্তান হয় তাহলে উভয়ে তিন ভাগের এক করে পাবে।"-(সূরা নিসা ঃ ১১)

[গ] যদি মৃত ব্যক্তির পিতা, মা এবং স্ত্রী থাকে (মৃত ব্যক্তি স্ত্রী হলে এ ক্ষেত্রে যদি স্বামী থাকে) তো স্ত্রীকে (এ ক্ষেত্রে মৃত স্ত্রী হলে স্বামীকে) তার অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশের এক-তৃতীয়াংশ মাকে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, পুরো সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মাকে না দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মাকে দেবার ব্যাপারে যিনি প্রথম সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তিনি হযরত ওমর (রা)। তাঁর বক্তব্য ছিলো মাকে পুরো সম্পদ থেকে এক-তৃতীয়াংশ দিলে অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টনে মৃতের নিকটাত্মীয় প্রত্যেক ছেলে প্রত্যেক মেয়ের দ্বিগুণ পাবে এ পদ্ধতিতে বণ্টন কষ্ট সাধ্য হয়ে যাবে।[৬২] হযরত ওসমান (রা) এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-এর অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যেমন এক ব্যক্তি স্ত্রী ও পিতামাতা রেখে মারা গেলে তিনি স্ত্রীকে এক-চতুর্থাংশ অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মাকে এবং বাকী অংশ পিতাকে দেয়ার নির্দেশ দিতেন।[৬৩]

আরেক মামলায় দেখা যায় এক মহিলা স্বামী, পিতা এবং মা রেখে মারা গেলে, হযরত ওসমান (রা) স্বামীকে অর্ধেক, মাকে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ এবং বাকীটুকু পিতাকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬৪]

[৪.৮] বৈপিত্রেয় ভাই বোনের অংশ ঃ বৈপিত্রেয় ভাইবোন উত্তরাধিকার হিসেবে অংশ পাওয়ার জন্য কয়েকটি অবস্থা আছে। যেমন—

[ক] বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বোন যদি একজন হয় তাহলে সে পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

www.amarboi.org

[খ] বৈপিত্রেয় ভাইবোনের সংখ্যা যদি একাধিক হয় তাহলে সকলে মিলে এক-তৃতীয়াংশ পাবে। এবং সেই অংশ ভাইবোন সকলে সমানভাবে ভাগ করে নেবে। এর ভিত্তি হচ্ছে মহান আল্লাহর এ বাণী ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِامْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ ـ(النساء : ١٢)

"আর সেই পুরুষ কিংবা মহিলা যদি নিঃসন্তান হয় এবং পিতামাতাও জীবিত না থাকে কিন্তু তার এক বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বোন থাকে, তাহলে তারা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি ভাইবোন দুজনের বেশী হয় তাহলে সকলে মিলে এক-তৃতীয়াংশ পাবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২)

[গ] মৃত ব্যক্তির যদি ছেলে অথবা মেয়ে অথবা নাতি কিংবা পিতা অথবা দাদা জীবিত থাকে তাহলে বৈপিত্রেয় ভাই বোন কিছুই পাবে না। মৃত ব্যক্তি যদি 'কালালাহ্' হয় তখন বৈপিত্রেয় ভাই বোন অংশ পাবে। আওলাদ ফরজন্দ থাকলে তারা কিছুই পাবেন না।

[ঘ] যদি মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের সাথে সহোদর ভাই-বোনও থাকে যারা তার পিতার পক্ষের আত্মীয়, যাবিল ফরুজদের মধ্যে অংশ বন্টনের পর যদি সহোদর ভাই বোনের জন্য কিছু না থাকে তাহলে তাদেরকে বৈপিত্রেয় ভাই বোনের সাথে মিলিয়ে অংশ প্রদান করতে হবে। তারা সকলে মিলে তাদের অংশ সমান ভাবে ভাগ করে নেবে। কারণ তারা সবাই একই মায়ের সন্তান। যেমন হযরত ওসমান (রা) এক মহিলার পরিত্যক্ত সম্পদের মামলায়, যে স্বামী, মা, সহোদর ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গিয়েছিলো নির্দেশ দিয়েছিলেন—স্বামীকে অর্ধেক, মাকে এক-ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সহোদর ও বৈপিত্রেয় ভাই বোন সকলে মিলে সমানভাবে ভাগ করে নেবে।[৬৫]

এখানে উল্লেখ থাকে যে, সহোদর ভাই বোনের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই বোনকে শামিল করে অংশ বন্টনের প্রথাটি সর্বপ্রথম হযরত ওমর (রা) প্রচলন করেন।

[৪.৯] মাওয়ালীর অংশ ঃ ইসলামী পরিভাষায় যিনি গোলাম আযাদ করেন এবং আযাদকৃত গোলাম উভয়কেই মাওয়ালী (موالى)–বলা হয়। এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর রায় ছিলো—গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদে আসহাবুল ফারাইয থাকে না এবং পিতার পক্ষের কোনো আত্মীয়ও থাকে না তাই তার পরিত্যক্ত সম্পদ তার মাওয়ালী (যিনি তাকে দাসত্ব মুক্তি দিয়েছেন) পাবেন।[৬৬]

[৪.১০] যাবিল আরহামের অংশ ঃ যাবিল আরহাম বলতে বুঝায় মায়ের পক্ষের আত্মীয় স্বজন। যাবিল আরহাম সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর যে অভিমত পাওয়া যায় ইমাম বদরউদ্দীন আইনী সহীহ্ আল বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ওমদাতুল কারীতে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন—হযরত ওসমান (রা) যাবিল আরহামকে উত্তরাধিকারের অংশ দেয়ার প্রবক্তা ছিলেন না।[৬৭] কিন্তু একথা সত্যি নয়। কাযী আবু হাযম বলেছেন—যাবিল আরহামকে অংশ দেয়ার ব্যাপারে খুলাফা-ই-রাশিদীনের মধ্যে ঐকমত্য ছিলো। আবার যখন মুতাযিদ আবু হাযমকে এ

www.amarboi.org

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বলেন—হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) ছাড়া সকল সাহাবী একমত ছিলেন যে, উত্তরাধিকারী হিসেবে যাবিল আরহাম অংশ পাবে। সমস্ত সাহাবাদের ইজমার মুকাবেলায় যায়িদ ইবনু সাবিতের একক মতামতের কোনো গুরুত্বই থাকতে পারে না। মুতাযিদ জিজ্ঞেস করলেন—হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য নেই যে, তাঁরাও যায়িদ ইবনু সাবিতের অভিমতের সাথে একমত ছিলেন? আবু হাযম জবাব দিলেন—কখনো নয়। যে তাদের সম্পর্কে এরূপ বলে সে ভুল বলে। কাওরানী বলেন—আবু হাযমের বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক।[৬৮]

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, ফিক্‌হে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং ফিক্‌হে আলী ইবনু আবী তালিব (রা) এ আমরা একথা বলেছি—এ দু মনীষী যাবিল আরহামকে মীরাসে অংশ দিতেন। অবশ্য আবু বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে এমন কোনো বর্ণনা পাইনি যাতে বুঝা যায় তিনি যাবিল আরহামকে অংশ দিয়েছেন কিংবা দেননি। শুধু এখানে যে বর্ণনার উল্লেখ করেছি এটি ছাড়া।[৬৯]

[৪.১১] বাইতুল মাল ঃ যদি মৃত ব্যক্তি এমন হয় যার আসহাবুল ফারাইয কিংবা মাওয়ালী অথবা যাবিল আরহাম কিছুই নেই, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ (ইসলামী) রাষ্ট্রের বাইতুলমালে জমা হবে। বর্ণিত আছে—হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে মুক্তকৃত এক ক্রীতদাস মারা যায়, যার কোনো অভিভাবক বা ওয়ালা ছিলো না। হযরত ওসমান (রা) তার পরিত্যক্ত সম্পদ বাইতুলমালে জমা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭০]

৫. রদ

'রদ'-এর ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে—মীরাস আসহাবুল ফারাইযের মধ্যে বণ্টনের পর যদি অবশিষ্ট রয়ে যায় এবং পিতার পক্ষের এমন কোনো নিকটাত্মীয়ও না থাকে যাকে অবশিষ্ট অংশ দেয়া যায় তাহলে পুনরায় আসহাবুল ফারাইযদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিতে হবে। এ কারণেই 'রদ'-এর বণ্টনে হযরত ওসমান (রা) আসহাবুল ফারাইযকে যাবিল আরহামের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন। কেননা আসহাবুল ফারাইযের উপস্থিতিতে যাবিল আরহামগণ কোনো ওয়ারিস হয় না।

হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি রদ এর বণ্টনের সময় স্বামীকেও অংশ দিয়েছেন। যদিও আহলে ইল্‌মদের সম্মিলিত রায়—স্বামী বা স্ত্রী কেউই রদ এর হকদার নয়। একথার ব্যাখ্যায় ইবনু কুদামাহ বলেছেন—হতে পারে হযরত ওসমান (রা) কোনো স্বামীকে মৃত ব্যক্তির যাবিল আরহাম সম্পর্কিত আত্মীয় হওয়ার কারণে তাকে পুনরায় রদ এর অংশ দিয়েছেন। সেই অতিরিক্ত অংশ কাউকে পুনরায় না দিয়ে অবশ্য তা বাইতুলমালেও জমা করা যেতে পারে।[৭১]

ইলম (علم)-অবগতি/জ্ঞান

কোনো নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণে যদি কারো ওপর হাদ জারী করতে হয় তাহলে কাজটি নিষিদ্ধ ছিলো তা জেনেই সে করেছে একথা নিশ্চিত হয়েই তাকে হাদ প্রয়োগ করতে হবে।

www.amarboi.org

ই'লান (إعلان)—ঘোষণা

কেউ তার নাবালেগ সন্তানকে কিছু হিবা (দান) করতে চাইলে সে জন্য ঘোষণা দিতে হবে এবং সাক্ষ্য রাখতে হবে।–('ইশহাদ' শিরোনাম দেখুন)

ইশহাদ (إشهاد)—সাক্ষ্য বানানো

যখন কোনো নাবালেগ সন্তান দান হিসেবে কোনো কিছু পায়, অভিভাবক তার পক্ষ থেকে সেই দান গ্রহণ করতে পারেন। এ সূত্রের ভিত্তিতে যদি অভিভাবক নিজেই সেই সন্তানকে কোনো কিছু দান করতে চান,তাহলে তার পক্ষ থেকে তিনিই গ্রহণ করবেন। এমতাবস্থায় যেহেতু দানের বস্তু গ্রহণকারী এবং দানকারী একই ব্যক্তি এজন্য দাতব্য বস্তুর ঘোষণা করা এবং সাক্ষ্য বানানো প্রয়োজন। যেন নাবালেগের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অভিভাবক ভবিষ্যতে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ না পান। হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা) বলেছেন—যদি কোনো ব্যক্তি তার এমন কোনো নাবালেগ সন্তানকে কিছু দান করে যা সে নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তাহলে সে তার ঘোষণাও দেবে এবং সে সম্পর্কে সাক্ষ্য বানাবে তাহলে তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা জায়েয আছে। যদিও সেই দানকৃত জিনিস ওলী হওয়ার কারণে পিতার আয়ত্বাধীনই থাকে।[৭২]

'ইশা (عشاء)—'ইশার নামায

–ইশার নামাযে কী পড়া উচিত ?–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–বিত্‌র নামায ইশার নামাযের পর আদায় করা।–('সালাত' শিরোনম দেখুন)

–ইশার নামাযের পর কিয়ামুল লাইল' করা।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

ইস্‌তি'আযাহ্‌ (استعاذة)—আউযুবিল্লাহ পড়া

ইমাম ইবনু হাযম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুহাল্লীতে লিখেছেন—"সাহাবা কিরাম এবং তাবিঈগণ নামাযে কুরআনের যে অংশই পড়তেন, তার শুরুতে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম অবশ্যই পড়তেন। তিনি আরো লিখেছেন—আমরা যতদূর জানি কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি।[৭৩]

ইসতিতাবাহ্‌ (استتابة)—তাওবার জন্য আহ্বান জানানো

বিস্তারিত জানার জন্য 'রিদ্দাহ' শিরোনাম দেখুন।

ইসতিবরা (استبراء)—জরায়ু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

১. সংজ্ঞা

ইস্‌তিবরা বলা হয় কোনো বাঁদী অথবা এমন কোনো মহিলা যার বিয়ে শুদ্ধ হয়নি, অন্যত্র বিয়ের জন্য এতটুকু সময় অপেক্ষা করা৹যেন নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তার গর্ভে কোনো সন্তান নেই।

www.amarboi.org

২. ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা

এতটুকু নিশ্চিত হতে হবে যে, তার গর্ভে কোনো সন্তান নেই।

[২.১] যদি বাঁদীর প্রকৃত মালিকানা পরিবর্তন হয় তার ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা এক হায়িয বা মাসিক। যিনি বাঁদী কিনবেন কিংবা যিনি দান হিসেবে বাঁদী গ্রহণ করবেন, গর্ভ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া তার দায়িত্ব। যিনি বাঁদী বিক্রি কিংবা দান (হিবা) করবেন তার দায়িত্ব নয়। কারণ এমন যেন না হয় যে, বাঁদীর পেটে প্রাক্তন মালিকের বাচ্চা রয়েছে, তার সাথে সহবাস করার কারণে বংশ পরিচয় মিশ্রণ ঘটে গেলো।

ইমাম ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফে মাকহুল ও মুশাক্‌কা থেকে এ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, আমি ইমাম যুহুরী (রহ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি জানেন হযরত ওমর (রা) শেষ জীবন পর্যন্ত এবং ইরাকে বসবাসরত ইবনু মাসউদ (রা) তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত এবং হযরত ওসমান (রা)-ও একথার প্রবক্তা ছিলেন যে, বাঁদীর ইস্‌তিব্‌রা এক হায়িয ? পরে মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে তারা সেই সময় সীমাকে বাড়িয়ে দু হায়িয করেন ? ইমাম যুহরী বললেন—বাঁদীর ইস্‌তিব্‌রার সময়কাল এক হায়িয একথার প্রবক্তাদের মধ্যে হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রা)-কেই আমি বেশী প্রাধান্য দেই।[৭৪]

[২.২] **উম্মু ওয়ালাদ ঃ** উম্মু ওয়ালাদের মনিব যদি ইন্তিকাল করেন, তার ইস্‌তিব্‌রার সময়সীমা তিন হায়িয।[৭৫] কারণ মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথে সে মুক্ত হয়ে যায়। এজন্য তার ইদ্দত স্বাধীন মহিলার ইদ্দতের মত, তিন হায়িয।

ইবনু কুদামা এ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা)-এর এ অভিমতও তুলে ধরেছেন যে, মালিকের মৃত্যু হলে উম্মু ওয়ালাদের ইসতিব্‌রার মেয়াদ এক হায়িয।[৭৬] কারণ এ ইসতিবরা হচ্ছে দাসত্ব থেকে মুক্তির। এমনিভাবে সেই সকল বাঁদীও সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বাঁদীর মতই গণ্য হবে। তাদের সকলের ইসতিব্‌রার মেয়াদ এক হায়িয।

৩. আল মুস্‌তাব্‌রাহ (এমন মহিলা যার ইস্‌তিব্‌রা প্রয়োজন)

এমন মহিলা যাদের ইসতিব্‌রা প্রয়োজন, তারা নিম্নরূপ—

[৩.১] আগে আমরা বলেছি—যখন বাঁদীর সাথে সহবাস করার অধিকার এক মালিক থেকে আরেক মালিকের কাছে হস্তান্তর হবে তখন তার জন্য ইস্‌তিবরা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

[৩.২] তেমনিভাবে যিনায় লিপ্ত হয়েছে এমন মহিলাকে যদি কেউ বিয়ে করতে চায়, তবে তার জন্যও বিয়ের পূর্বে ইস্‌তিব্‌রা পালন অপরিহার্য। যেন বিয়ের পর বংশধারার মিশ্রণ না ঘটতে পারে। আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে সাহাবা কিরামের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিলো না।

[৩.৩] কোনো বিবাহিত অমুসলিম মহিলা যদি যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে কিংবা কোনো অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে অমুসলিম দেশ থেকে মুসলিম দেশে হিজরত করে চলে আসে তাহলে সেই মহিলার জন্যও বিয়ের পূর্বে ইস্‌তিব্‌রা প্রয়োজন। তাদের ইস্‌তিব্‌রার মেয়াদ হবে এক হায়িয। সাহাবা কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারেও কোনো দ্বিমত ছিলো না।[৭৭]

www.amarboi.org

ইস্‌তিযান (استئذان)—অনুমতি চাওয়া

১. সংজ্ঞা

ইস্‌তিযান শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এমন কোনো ব্যক্তি থেকে কোনো কাজের অনুমতি প্রার্থনা করা, যে সেই কাজের অনুমতি দেয়ার অধিকারী।

২. কখন অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজন

[২.১] ঘরে প্রবেশের অনুমতি ঃ সাহাবা কিরাম এ ব্যাপারে একমত, নিজের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নেয়া ওয়াজিব (অপরিহার্য)। ইরশাদ হচ্ছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের ঘর ছাড়া আর কারো ঘরে প্রবেশ কোরো না, যতক্ষণ সালাম করে তাদের অনুমতি না নেবে।"-(সূরা আন নূর ঃ ২৭)

এ আয়াতে কারীমায় استئناسُ শব্দের অর্থ استئذانُ (অনুমতি প্রার্থনা)। ইমাম আবু বকর আল জাস্‌সাস (রহ) বলেছেন—এ আয়াতে استئذانُ কে استئناس (ইস্‌তিনাস) এজন্য বলা হয়েছে—যখন কোনো ব্যক্তি কারো ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চান এবং তাকে সালাম করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই (তাদের মধ্যে) সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি সালাম না দিয়ে এবং অনুমতি না নিয়েই কারো ঘরে প্রবেশ করে তাহলে সেখানে ভয় ও বিব্রতকর অবস্থা বিরাজ করে এবং ফলে কেউ কাউকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না।[৭৮]

[২.২] বিয়ের সময় অভিভাবক কর্তৃক কনের অনুমতি গ্রহণ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি তার প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে বিয়ে দিতে চান, তার উচিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁর থেকে অনুমতি নেয়া। যদি কন্যা সম্মত হয় তাহলে ওলী তার বিয়ে দিতে পারবেন, নইলে তাকে বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা ওলীর নেই। এজন্য হযরত ওসমান (রা) যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইতেন তখন তিনি মেয়ের কাছে পর্দার নিকট গিয়ে বসতেন এবং তাকে বলতেন, অমুক তোমার নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছে।[৭৯]

[২.৩] গোলামের বিয়েতে তার মনিবের অনুমতি নেয়া ঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা গোলামের জন্য বৈধ নয়। যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো গোলাম বিয়ে করে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৮০] এমনকি যদি বিয়ের পর দাম্পত্য জীবন শুরু করে দেয় তখনো তিনি তাদেরকে পৃথক করে দিতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে গোলামের মালিক নির্ধারিত মোহরের দুই-পঞ্চমাংশ প্রদান করবেন।[৮১]

বর্ণিত আছে—হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর এক ক্রীতদাস যে তাঁর উট চড়াতো, বনী জাদাহ্ গোত্রের এক বাঁদীকে বিয়ে করে। একদিন পাঁচটি উট সহ সে বনী জা'দাহ্ গোত্রে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আবু মূসা আশ'আরী (রা) যখন জানতে পারলেন তখন সেই গোত্রে প্রস্তাব পাঠান—আমার দাস এবং উটগুলো মেহেরবাণী করে আমার কাছে ফেরত পাঠাবেন। তারা জবাব পাঠালেন—আপনার গোলাম আপনিই পাবেন কিন্তু আপনার গোলাম আমাদের দাসীকে

www.amarboi.org

বিয়ে করেছে সেই দাসীর মোহরানা বাবদ উটগুলো আমরা রেখে দেবো। উভয় পক্ষ হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট মামলা দায়ের করলেন। তিনি রায় দিলেন—পাঁচ ভাগের দু ভাগ উট মোহরানা বাবদ তারা পাবেন আর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ উট আবু মূসা আশ'আরীকে ফেরত দিতে হবে।[৮২]

আমাদের মতে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে, মোহর কিংবা 'হাদ' অপরিহার্য হয় দৈহিক মিলন সংঘটিত হলে। এজন্য মোহরের হিসাব সেসব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা দৈহিক মিলনের ফলে ওয়াজিব হয়। গোলামের ওপর প্রয়োগকৃত হদ যেমন স্বাধীন মানুষের ওপর প্রয়োগকৃত হদের চেয়ে কম। তদ্রূপ তার মোহরও স্বাধীন ব্যক্তির চেয়ে কম হওয়া উচিত। অথবা এটিও হতে পারে যে, মোহর যেহেতু বিয়ের দুটো বিনিময়ের একটি, এজন্য দাম্পত্য ব্যাপারে গোলামের অধিকার স্বাধীন ব্যক্তির চেয়ে কম। সেজন্য তার মোহরও স্বাধীন ব্যক্তির চেয়ে কম। অথবা এটিও হতে পারে যে, তিনি সেই মামলায় দাসীকে মোহর হিসেবে যা প্রদানের রায় দিয়েছেন তা পরস্পরের আপোষের ভিত্তিতে দিয়েছেন।

[২.৪] জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য পিতামাতার অনুমতি ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে যারা স্বেচ্ছায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন তাদেরকে তিনি পিতামাতা থেকে অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন, যেন তারা স্বীয় পিতামাতা থেকে অনুমতি চেয়ে নেয়। যারা অনুমতি পাবে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে আর যারা পিতামাতার অনুমতি পাবে না, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা তাদের জন্য বৈধ নয়।[৮৩] মুহাম্মদ ইবনু তালহা (রা) হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে জিহাদে অংশগ্রহণের প্রোগ্রাম করেছিলেন। তাঁর মা হযরত ওমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ছেলের প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানালেন। তিনি তাকে ডেকে এনে বললেন—এ ব্যাপারে তুমি তোমার মায়ের নির্দেশ মানবে। হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলেও তিনি দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে করেছিলেন। এবার তাঁর মা হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে এসে ছেলের অভিপ্রায় জানালেন। তিনি তাকে ঘরে থেকে মায়ের সেবা-যত্ন করার নির্দেশ দিলেন। মুহাম্মদ ইবনু তালহা বললেন—হযরত ওমর (রা)-ও আমাকে বাড়িতে থেকে মায়ের সেবা-যত্নের কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি আমাকে এরূপ করতে বাধ্য করেননি। হযরত ওসমান (রা) বললেন—আমি তোমাকে তোমার মায়ের আনুগত্য ও সেবা-যত্নের জন্য যে কোনোভাবেই হোক বাধ্য করবো।[৮৪]

আমরা মনে করি হযরত ওসমান (রা)-এর এ সিদ্ধান্তের মূলে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা হচ্ছে—পিতামাতার সেবা-যত্ন করা ফরযে আইন আর স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটা ফরযে কিফায়া। যাকিছু মুসলমান আদায় করলে সকল মুসলমানই দায়মুক্ত হয়ে যায়। কারণ ফরযে আইন ফরযে কিফায়ার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—দারুল ইসলাম যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে।[৮৫] কেননা তখন ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে দেশের কল্যাণটা বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

৩. নিজের মালিকানাভুক্ত জিনিস ব্যবহারের জন্য অনুমতি নিষ্প্রয়োজন।
-('ইসতিহ্‌কাক' শিরোনাম দেখুন)

ইস্‌তিন্‌জা (استنجاء)—পেশাব পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করা

www.amarboi.org

১. সংজ্ঞা

পেশাব পায়খানা করার পর পেশাব পায়খানার রাস্তা পরিষ্কার করার নাম ইস্তিনজা।

২. ইস্তিনজার কাজ বাম হাত দিয়ে করা উচিত। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিলো, তিনি পবিত্র কাজ ডান হাত দিয়ে এবং পেশাব পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন সহ বিশেষ অঙ্গের যাবতীয় কাজ বাম হাত দিয়ে করতেন। হযরত ওসমান (রা)-ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত আমল করতেন। তিনি বলেছেন—আমি যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি তখন থেকে ডান হাত দিয়ে আমি আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।[৮৬]

ইস্তিনশাক (استنشاق)—নাকে পানি দেয়া

ইস্তিনশাক বা নাকে পানি দেয়া ওযুর অংশ। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন 'ওযূ' শিরোনাম।

ইসতিয়াক (استياك)—দাঁতন করা/মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা

–মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করাকে ইসতিয়াক বলে। এটি একটি সুন্নাত কাজ। হযরত ওসমান (রা) একে এতোবেশী গুরুত্ব দিতেন যে, একবার জুম'আর নামাযের প্রস্তুতির সময় মিসওয়াক করতে ভুলে গিয়েছিলান। যখন মনে হয়েছে, তিনি মিসওয়াক করেননি, সাথে সাথে তিনি লোকদেরকে উদ্দেশ করে বললেন—'আমি মিসওয়াক করতে ভুলে গেছি।' একথা বলেই তিনি মিম্বার থেকে নেমে গেলেন। মিসওয়াক করে কিছুক্ষণ পর এসে তিনি খুতবা (ভাষণ) দিলেন।[৮৭]

–গোসলের সময় মিসওয়াক করা।–('গুসল' শিরোনাম দেখুন)

ইস্তিযলাল (استظلال)—ছায়া গ্রহণ করা

মুহরিম ব্যক্তির (যিনি ইহরাম বেঁধেছেন) ছায়ায় যাওয়া (কিংবা বসা) জায়েয।
-(বিস্তারিত 'ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

ইস্তিস্কা (استسقاء)—বৃষ্টি প্রার্থনা করা

দীর্ঘ সময় বিনয় ও কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করাকে ইস্তিসকা বলে।

–ইস্তিসকার নামায সম্পর্কে দেখুন–'সালাত' শিরোনাম।

ইস্তিহ্কাক (استحقاق)—যোগ্য হওয়া/অধিকারী হওয়া

১. সংজ্ঞা

ইস্তিহ্কাক' বলতে বুঝায় এমন কোনো বস্তু যা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন আছে এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, তার ওপর অন্য কারো হক আছে কিংবা তা করায়ত্বকারী ব্যক্তির করায়ত্বে রাখা অবৈধ (নাজায়েয)।

www.amarboi.org

২. ইস্তিহকাকের প্রভাব ও পরিণতি

[২.১] যদি কোনো বস্তুর ওপর কারো ইস্তিহ্কাক (অধিকার) প্রমাণিত হয় তাহলে হকদারকে তা ফেরত দেয়া ওয়াজিব (অপরিহার্য) হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে এতটুকু অনুমতি আছে, যদি কোনো বস্তু কারো অবৈধ দখলে থাকে তাহলে প্রকৃত মালিক তার অনুমতি ছাড়াই সেই জিনিস নিতে পারেন। কারণ সেই জিনিসের ওপর তার মালিকানা রয়েছে। আর নিজের জিনিস স্থানান্তর করতে কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। আমাদের জানামতে কোনো সাহাবা এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেননি।–('সিরকাহ্' শিরোনাম দেখুন)

[২.২] যে জিনিসে কারো ইস্তিহ্কাক (অধিকার/হক) প্রমাণিত হয়, সেই জিনিস থেকে অর্জিত লাভকে ফিকহী পরিভাষায় যাওয়াইদু মুস্তাহাক বলে। অর্জিত সেই লাভ মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত হোক কিংবা বিযুক্ত, সর্বাবস্থায় তা মূল বস্তুর হুকুম রাখে। মূল জিনিসের সাথেই তা তার মালিককে ফেরত দিতে হবে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) এমন এক বাঁদীর সন্তানের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন, যে বাঁদীর ওপর প্রকৃত মালিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, ঐ সন্তান প্রকৃত মনিবের দাস হিসেবেই গণ্য হবে।[৮৮] খাল্লাস ইবনু আমর থেকে বর্ণিত—এক বাঁদী বনী তাঈ গোত্রে গিয়ে দাবী করলো, সে আযাদ বা মুক্ত। তখন সেই গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করলেন। সেই ঘরে সন্তানও হলো। পরে মালিক তার সন্ধান পেলেন। তখন ওসমান (রা)-এর নিকট তিনি মামলা দায়ের করলেন। হযরত ওসমান (রা) সেই মামলার রায় দিলেন—সন্তান এবং বাঁদীকে মালিক ফেরত পাবেন। স্বামী শুধু সেই সম্পদের মালিক হবেন যা বাঁদীর কাছে অবিকল অবস্থায় পাবেন। আরো বলা হলো (স্বামী যদি তার সন্তানদেরকে ফিরে পেতে চান তাহলে) সেই বাঁদীর গর্ভের প্রত্যেক সন্তানের বিনিময়ে প্রকৃত মালিককে দুজন বাদী কিংবা দুজন গোলাম ফিদইয়া হিসেবে দিতে হবে।[৮৯] অর্থাৎ যদি সন্তানের পিতা তার সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে চান তাহলে প্রত্যেক ছেলের বিনিময়ে দুজন গোলাম এবং প্রত্যেক মেয়ের বিনিময়ে দুজন বাঁদী মালিককে প্রদান করতে হবে।

ইস্তিহাযা (استحاضة)–রক্ত প্রদর

১. সংজ্ঞা

হায়িয কিংবা নিফাস ছাড়া মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত রক্তস্রাবকে ইস্তিহাযা বা রক্তপ্রদর বলে।

২. ইস্তিহাযার প্রভাব ও পরিণতি

আয়িশা (রা) মনে করতেন—ইস্তিহাযার অবস্থায় নামায, রোযা ও স্বামী সহবাস বৈধ। শুধু প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য সে নতুন করে ওযু করে নেবে।[৯০]

ইবনে হাযাম বলেন—এ ব্যাপারে আয়িশা (রা)-এর সাথে কোনো সাহাবা দ্বিমত পোষণ করেননি।

ইসতিলকা (استلقاء)–চিৎ হয়ে শোয়া

যিনি চিৎ হয়ে শুইবেন তিনি ইচ্ছে করলে এক পা আরেক পায়ের ওপর রাখতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) যখন শুইতেন তখন তিনি এক পা আরেক পায়ের ওপর রাখতেন।[৯১]

www.amarboi.org

ইস্‌ফার (اسفار)–ফর্সা হওয়া

এখানে ইসফার বলতে বুঝানো হয়েছে, ফজর নামাযে এতটুকু বিলম্ব করা যাতে রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায় এবং সব জিনিস পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

–(বিস্তারিত জানার জন্য 'সালাত' শিরোনাম দেখুন)

ইসবা' (اصبع)–আঙ্গুল

আঙ্গুল সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দেখুন–'জিনাইয়াহ' শিরোনাম।

ইসরাফ (اسراف)–অপচয়/অপব্যয়

হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট ইসরাফ হচ্ছে বৈধ খরচের ব্যাপারে সমাজের সমান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে যাওয়া। এজন্যই হযরত ওসমান (রা) যিনি ছিলেন একজন ধনকুবের একশ' দিরহামের ইয়েমেনী চাদর ব্যবহারকেও অপব্যয় মনে করতেন না। তাঁর বেগমগণও এমন উৎকৃষ্ট রেশম চাদর ব্যবহার করতেন যার প্রতিটির মূল্য ছিলো দু'শ দিরহাম। এটিকেও তিনি অপব্যয় মনে করতেন না।[৯২]

ইহ্ইয়াউল লাইল (احياء الليل)–শবেবেদারী/রাত্রি জাগরণ

১. সংজ্ঞা

রাতের বেশীর ভাগ অংশ জেগে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করাকে ইহ্ইয়াউল লাইল (বা শবেবেদারী) বলে।

–রাতে ঘুম থেকে জেগে যে নামায পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ নামায বলে। তাহাজ্জুদ নামাযের রাকায়াত সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। কমবেশী পড়া যায়। হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা) অনেক সময় (দু রাকায়াত) তাহাজ্জুদের এক রাকয়াতে সারা রাত জেগে পুরো (খতম) কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[৯৩] সম্ভবত তিনি মনে করতেন বেশী সিজদার চেয়ে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা উত্তম।

ইহ্ইয়াউল মাওয়াত (احياء الموات)–পতিত জমি আবাদ করা

১. সংজ্ঞা

ইহ্ইয়াউল মাওয়াত বলতে এমন পতিত জমি আবাদ করা বুঝায় যার কোনো মালিক নেই এবং যেখানে বাগ বাগিচা কিংবা বাড়িঘর কিংবা কারো আবাদী ফসল নেই।

২. রাষ্ট্র প্রধান ইচ্ছে করলে সরকারী জমি এমন লোকদের মধ্যে বন্দবস্ত (লীজ) দিতে পারেন যারা তা আবাদ করবে। যেন কোনো সরকারী জমি অযথা পরে না থাকে। এভাবে আবাদীর জন্য জমি প্রদানকে জায়গীর বলা হয়।

হযরত ওসমান (রা) পাঁচজন সাহাবাকে জায়গীর হিসেবে জমি প্রদান করেছিলেন। তারা হলেন–১. হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)। ২. হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাস (রা)। ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)। ৪. হযরত ওসামা ইবনু যায়িদ (রা) এবং ৫. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)। তাঁদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাস (রা) ও হযরত

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) স্ব স্ব জমি থেকে এক-তৃতীয়াংশ বর্গাচাষের জন্য দিয়েছিলেন।[৯৪]

হযরত ওসমান (রা)-এসব জমি প্রদানের সময় আবাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়কে বেধে দেননি। পক্ষান্তরে হযরত ওমর (রা) যেসব জমি বন্দবস্ত (লীজ) দিতেন তিনি তা সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য দিতেন। তারপর মেয়াদান্তে তাদের কাছ থেকে জমি ফেরত নিয়ে আবার অন্যদেরকে (লীজ) দিতেন। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আছে—হযরত ওসমান (রা) যাদেরকে সরকারী জমি লীজ দিতেন তাদেরকে কোনো সময়সীমা বেধে দিতেন না। কিন্তু হযরত ওমর (রা) যেসব সরকারী জমি লীজ দিতেন তা সর্বোচ্চ তিন বছরের শর্তে দিতেন।[৯৫] (তিন বছর পর জমি ফেরত গ্রহণ করতেন)।

রইলো ইমাম শাবী (রহ)-এর এ বক্তব্য যে, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে সরকারী জমি লীজ দেয়া হতো না। লীজ দেয়ার প্রথা চালু হয় হযরত ওসমান (রা)-এর সময় থেকে।[৯৫] আমাদের মতে এ বক্তব্য ঠিক নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) নিজ নিজ শাসনামলে পতিত জমি লীজ দিয়েছেন। আমরা ফিকহে আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইহ্‌তিকার (احتكار)—মজুদদারী

১. সংজ্ঞা

ইহ্‌তিকার বলতে বুঝায় স্বেচ্ছায় এমন কোনো জিনিসকে আটকে দেয়া, যা আটকে দেয়ার কারণে জনসাধারণ কষ্ট পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. ইহ্‌তিকারের বিধান

ইহ্‌তিকার হারাম। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ خَاطِئٌ

"যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির আশায় মজুদ করে রাখবে সে অপরাধী।"

তিনি আরো বলেছেন—

بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ اِنْ اَرْخَصَ اللّٰهُ الْاَسْعَارُ حَزِنَ وَاِنْ اَغْلَاهَا فَرِحَ ـ

মজুদদারী যারা করে তারা নিকৃষ্ট লোক। আল্লাহ যদি কোনো জিনিস সস্তা ও সহজলভ্য করে দেন তাহলে তাদের ভীষণ কষ্ট হয়। আর যদি আল্লাহ কোনো জিনিসকে দুর্লভ করে দেন তাহলে তাদের খুশীর অন্ত থাকে না।

এজন্য হযরত ওসমান (রা) মজুদদারকে প্রতিরোধ করতেন এবং সম্পদ মজুদ করার ব্যাপারে নিষেধ করতেন।[৯৭]

এ থেকে প্রমাণিত হয়—হযরত ওসমান (রা) হযরত ওমর (রা)-এর মতো খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য দ্রব্য মজুদের ব্যাপারে বিশেষ কোনো পার্থক্য মনে করতেন না। এজন্য তার পক্ষ থেকে

www.amarboi.org

সকল প্রকার জিনিসের মজুদ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ছিলো। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুজদদারী সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যেখানে সকল প্রকার জিনিস ষ্টক করার ব্যাপারে সাধারণভাবে নিষেধ করার হয়েছে। আবার সেখানে এমন কিছু হাদীস রয়েছে যা থেকে শুধু খাদ্য সামগ্রী ষ্টক করার ব্যাপারে নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। মূলত উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ অধিকাংশ ওলামার মতে এ ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশকে শর্তযুক্ত নির্দেশের মধ্যে শামিল করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং তা সাধারণ নির্দেশ হিসেবেই বলবত থাকবে।[৯৮]

ইহ্‌তিয়াত (احتياط)—সতর্কতা

কোনো মুসলমানের সামনে যদি জায়েয নাজায়েযের ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে—তিনি এমনভাবে কাজ করবেন যেন সেই কাজ বেশী সতর্কতামূলক হয়। বিশেষ করে যদি সেটি ইবাদাত ও লজ্জাস্থানের ব্যাপারে হয়। সাহাবাগণের কর্মপদ্ধতিও এরূপ ছিলো এবং হযরত ওসমান (রা) এরূপ আমলই করতেন। যেমন একবার হযরত দীনার আসলামী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—যদি কারো মালিকানায় এমন দুজন বাঁদী থাকে যারা পরস্পর দুধবোন। তাহলে তারা উভয়েই কি একই সাথে মনিবের জন্য হালাল হবে? হযরত ওসমান (রা) জবাব দিলেন—এক আয়াতের দৃষ্টিতে তো উভয়েই হালাল কিন্তু অন্য আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে দুজন একই সাথে হালাল নয়। তাই এ রকম দুবোনকে এক সাথে (মালিকানাধীনে) না রাখাই ভালো।[৯৯]

যে আয়াতের দ্বারা দুবোন হালাল হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - اِلاَّ عَلٰى اَزْوٰجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ .(المؤمنون : ٥-٦)

"তারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে স্ত্রী ও বাঁদী ছাড়া অন্য মহিলাদের থেকে বাঁচিয়ে রাখে।"
−(সূরা আল মুমিনূন ঃ ৫-৬)

হারাম হওয়ার ব্যাপারে যে আয়াতটি তা এরূপ—

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ .(النساء : ٢٣)

"তোমরা দুবোনকে একত্রে (বিয়ে করে) জমা করবে, তা হারাম করা হয়েছে।"
−(সূরা আন নিসা ঃ ২৩)

ইহ্‌তিলাম (احتلام)—স্বপ্নদোষ

১. সংজ্ঞা

ইহ্‌তিলাম অর্থ−স্বপ্নে যৌন সুখ অনুভূত হওয়া এবং সেই সাথে বীর্যপাত হওয়া।

২. ইহ্‌তিলামের প্রভাব ও পরিণতি

[২.১] ইহ্‌তিলাম বালেগ হওয়ার অন্যতম আলামত।−('বুলূগ' শিরোনাম দেখুন)

[২.২] ইহ্‌তিলামের দ্বারা গোসল ফরয হয়।−('গুসল' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

ইহ্‌দাদ (احداد)—শোকপালন

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'হিদাদ' শিরোনাম।

ইহ্‌সান (احصان)—বিবাহিত/সংরক্ষিত

ব্যভিচারের অপরাধে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করতে হলে তাকে অবশ্যই বিবাহিত হতে হবে।–('যিনা' শিরোনাম দেখুন)

ইহরাম (احرام)—হাজ্জের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরা

১. সংজ্ঞা

হাজ্জ এবং ওমরা করার নিয়তে নির্দিষ্ট পোশাক পরে তালবিয়া পাঠ করাকে ইহরাম বলে।

২. কোথা থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে

এ ব্যাপারে মৌলিক নির্দেশ তো এই যে, হাজ্জ ও ওমরাকারী সেই মীকাতসমূহ থেকে ইহরাম বাঁধবেন, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেসব জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা উত্তম। যদি কোনো ব্যক্তি মীকাতে পৌছার আগেই ইহরাম বেঁধে নেয় তাও জায়েয আছে। তবে তারা যেন নিজেদেরকে এমন কঠিন অবস্থায় ফেলে দেন যা আল্লাহ তাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। তাই হযরত ওসমান (রা) মীকাতে পৌছার আগে ইহরাম বাঁধাকে মাকরূহ (অপছন্দনীয় কাজ) মনে করতেন। একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে—যখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনু আমির খোরাসান বিজয় করলেন তখন বলতে লাগলেন—আমার এ বিজয় আল্লাহর সাহায্য ও অনুকম্পায় সম্ভব হয়েছে। কাজেই আমাদের আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। তাই আমি ওমরার জন্য এখান (খোরাসান) থেকে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হওয়াকে আমার ওপর বাধ্যতামূলক করে নিলাম। তিনি নিশাপুর থেকে ইহরাম বাঁধলেন এবং আহনাফ ইবনু কায়িসকে খোরাসানের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর বানিয়ে ওমরা করার জন্য রওয়ানা হলেন।

ওমরা শেষ করে তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাকে দেখেই বললেন—'নিশাপুর থেকে ইহরাম বেঁধেই তুমি ওমরাটাকে শেষ করে দিয়েছো।' একথা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের বছরের।[১০০]

৩. মুহরিম ব্যক্তি যেসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন

মুহরিম ব্যক্তি নিচের কাজগুলো থেকে বিরত থাকবেন।

[৩.১] সেলাই করা কাপড় ঃ মুহরিম ব্যক্তির পোশাক সেলাইবিহীন দু প্রস্থ কাপড়। একটি চাদর এবং অপরটি লুঙ্গি। তাকে মাথা ঢেকে রাখা থেকেও বিরত থাকতে হবে। অবশ্য মুখ ঢাকার জন্য কোনো ফিদ্‌ইয়া দিতে হবে না। হযরত ওসমান (রা) মুহরিম অবস্থায় সেই কাপড়ে মুখ ঢেকে নিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রবিয়া বর্ণনা করেছেন—আমি গরমের সময় একদিন হযরত ওসমান (রা)-কে আরজ নামক স্থানে ইহরাম বাধা অবস্থায় দেখেছি। তিনি লাল রঙের একটি কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢেকে রেখেছিলেন।[১০১]

অবশ্য মহিলাদের এটি জায়েয নেই যে, ইহরাম অবস্থায় তারা তাদের মুখ ঢেকে রাখবেন। যদি তাদের মুখ ঢাকার প্রয়োজন হয় তাহলে মাথা থেকে একটি কাপড় মুখের

www.amarboi.org

সামনে দিয়ে ঝুলিয়ে দেবেন (যেন সেই কাপড় মুখ স্পর্শ না করে)।[১০২] অবশ্য কোনো কাপড় দিয়ে মুখ না ঢেকে যদি মুখে সেই কাপড়ের ছায়া ফেলতে চান তাহলে জায়েয আছে।[১০৩]

[৩.২] সুগন্ধি ব্যবহার ঃ মুহরিমকে ইহ্‌রাম অবস্থায় সুগন্ধি পরিহার করতে হবে। ইহরাম বাঁধার পূর্বেও এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না যার প্রভাব ইহরাম বাঁধার পরও থেকে যায়। যারা ইহরাম বাঁধার নিয়ত করবেন, তাদের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা হযরত ওসমান (রা) মাকরূহ মনে করতেন।[১০৪]

এক ব্যক্তিকে তিনি ইহরাম বাধার সময় আতর লাগাতে দেখলেন। তাকে নির্দেশ দিলেন—'যাও মাটি দিয়ে ভালোভাবে মাথা ধুয়ে নাও।'

এখানে স্মতর্ব্য যে, ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে কিংবা মুহরিম অবস্থায় যে ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ তা কোনো ফুল বা গাছের শিকড় থেকে প্রস্তুতকৃত (আতর বা প্রসাধনী) কিন্তু যদি কোনো ফুল কিংবা চারা গাছের যেমন রায়হান, নার্গিস ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়া হয় তা জায়েয আছে। কোনো কিছুর ঘ্রাণ শুকলে সেজন্য ফিদইয়া দিতে হবে না।[১০৫]

[৩.৩] সুরমা ব্যবহার ঃ সুরমা ব্যবহার থেকেও মুহরিম ব্যক্তি বিরত থাকবেন। কারণ সুরমা ব্যবহার করাটা বিলাসিতা ও আরামের অন্তর্ভুক্ত, তবে চোখে ঔষধ ব্যবহার করলে সেজন্য ফিদইয়া দিতে হবে না। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—চোখে যন্ত্রণা হলে মুসাব্বরের প্রলেপ দেয়া যাবে।[১০৭]

[৩.৪] বিয়ে করা ঃ মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করতে পারবেন না এবং কাউকে বিয়ে দিতেও পারবেন না। এমনকি না নিজের বাগদান করবেন আর না কাউকে করাবেন। কারণ ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় সম্পর্ক আল্লাহর সাথে রাখতে হবে। পার্থিব কোনো কাজেই জড়ানো উচিত নয়। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—মুহরিম ব্যক্তি নিজে বিয়ে করতে পারবেন না। আর কাউকে বিয়ে দিতেও পারবেন না। এমনকি নিজের কিংবা কারো বাদগানও করতে পারবেন না।[১০৮]

[৩.৫] যৌন ক্রিয়াকর্ম ঃ মুহরিমকে যাবতীয় যৌন ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। সহ্‌বাস করা তো যাবেই না আনুষঙ্গিক কোনো কাজও করা যাবে না। যেমন—চুমো দেয়া, আবেগে জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি। যদি স্বামী স্ত্রী ইহ্‌রাম অবস্থায় সহ্‌বাস করেই ফেলেন তাহলে উভয়ের হাজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু হাজ্জের অবশিষ্ট আহকাম পালন করে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর সেই হাজ্জের কাযা আদায় করতে হবে। কাযা আদায়ের সময় যখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে সেই জাগয়ায় পৌছুবেন যেখানে আগের বছর সহবাস করেছিলেন, উভয়ে পৃথক হয়ে যাবেন এবং অবশিষ্ট আহকাম শেষ করে ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পৃথকভাবে থাকবেন।[১০৯]

[৩.৬] চুল-নখ কাটা ঃ আমরা যতদূর অনুসন্ধান করেছি সেখানে হযরত ওসমান (রা) থেকে এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা বা ভাষ্য পাইনি। অবশ্য এ ব্যাপারে আল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَلاَ تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ ج فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ج ـ(البقرة : ١٩٦)

www.amarboi.org

"কুরবানী জায়গা পর্যন্ত পৌছার পূর্বে তোমরা মাথা কামাবে না। তবে যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মাথায় কোনো সমস্যা থাকে যার কারণে মাথা কামিয়ে ফেলে, সে ফিদ্‌ইয়া হিসেবে রোযা রাখবে অথবা কুরবানী করবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬)

[৩.৭] **স্থলে শিকার করা ঃ** মুহরিম ব্যক্তি স্থলে বিচরণকারী কোনো পশু পাখী শিকার করতে পারবেন না। যদি করেন, তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে ফিদইয়া প্রদান করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط (المائدة : ٩٥)

"হে মুমিনগণ ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার করো না। যে ইচ্ছেকৃতভাবে তা হত্যা করবে তাকে বিনিময় দিতে হবে যা ঐ প্রাণীর সমমূল্যের। তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ দুজন লোক এ ব্যাপারে ফায়সালা দেবে। সেটি কুরবানী হিসেবে কাবায় পৌছাবে কিংবা দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে অথবা সমসংখ্যক রোযা রাখবে। যেন তার কৃতকর্মের স্বাদ সে আস্বাদন করতে পারে।"-(সূরা আল মায়িদা ঃ ৯৫)

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, হেরেম শরীফের মধ্যে শিকার করা শুধু মুহরিমের জন্য হারাম নয় বরং সকল মুসলমানের জন্যই তা হারাম। হযরত ওসমান (রা)-এর সিদ্ধান্ত ছিলো—যদি মুহরিম ব্যক্তি স্থলে বিচরণশীল কোনো প্রাণী শিকার করে, তার বিনিময়ে সম ওজনের গবাদি পশু তাকে দম দিতে হবে। দম না দিয়ে তার মূল্য ফিদইয়া হিসেবে আদায় করে দেবে তা জায়েয নয়।[১১০] উল্লেখিত আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। আমরা হযরত ওসমান (রা) থেকে এমন বর্ণনা পাইনি যেখানে তিনি কোনো পশু শিকারের বিনিময়ে এক বৎসর বয়সের ছাগলের চেয়ে কম বয়সী কোনো গবাদী পশু দম হিসেবে দেয়ার ফায়সালা দিয়েছেন। যেমন তিনি কাকলাস হত্যার জন্য এক বছর বয়সের ছাগল দম দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১১] বন মোরগ শিকারের প্রতিকার স্বরূপ তিনি মোটাতাজা উট দম দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১২] বটের পাখী শিকার করলে দম হিসেবে একটি ছাগল প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৩] আর কবুতর শিকার করলে তার বিনিময়ে দম হিসেবে একটি ছাগল যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৪] হযরত ওসমান (রা)-এর এ সংক্রান্ত ফায়সালার একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। সেই ঘটনার বর্ণনাকারী সালিহ ইবনু আল মাহদী। তিনি তাঁর পিতার রেফারেন্সে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা বলেছেন—একবার আমি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে ফরয হাজ্জ আদায় করেছি। যখন আমরা মক্কা শরীফে পৌছুলাম তখন তাঁর জন্য আমি একটি ঘরে চাদর বিছিয়ে দিলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। এমন সময় জানালায় একটি কবুতর এসে পা দিয়ে মাটি খুড়তে আরম্ভ করলো। হযরত ওসমান (রা)-এর কাপড়ে যেন মাটি না পড়ে সেজন্য আমি কবুতরটিকে উড়িয়ে দিলাম। সেটি উড়ে গিয়ে অন্য জানালায় বসলো। বসে আগের মতই মাটি খুড়তে শুরু করলো। তখন একটি সাপ এসে সেটিকে ছোবল মারলো, কবুতরটি মরে গেলো।

www.amarboi.org

যখন হযরত ওসমান (রা) ঘুম থেকে ওঠলেন তখন পুরো ঘটনা তাকে জানালাম। তিনি বললেন—ঐ কবুতরের বিনিময়ে তোমাকে একটি ছাগল দম দিতে হবে। আমি বললাম—আমি তো সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছিলাম যেন আপনার ঘুমে কোনো ব্যাঘাত না হয় সেজন্য। তিনি বললেন—তাহলে আমার পক্ষ থেকেও একটি ছাগল দম দিয়ে দেবে।[১১৫]

এমনকি ইহরাম অবস্থায় একটি টিড্ডি মারলেও হযরত ওসমান (রা) ফিদ্‌ইয়া প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেননি। সম্ভবত টিড্ডির ফিদইয়া এক মুঠো খাদ্যশস্য দান করা।

[৩.৮] শিকারের গোশত খাওয়া ঃ মুহরিম ব্যক্তি এমন প্রাণীর গোশত খাওয়া থেকেও বিরত থাকবেন, যে প্রাণী তিনি নিজে শিকার করেছেন কিংবা মুহরিম নয় এমন কেউ তার জন্য শিকার করে এনেছেন।[১১৬]

আবদুর রহমান ইবনু হাতিব বর্ণনা করেছেন—তিনি একবার হযরত ওসমান (রা)-এর কাফিলায় শরীক হয়ে তাঁর সাথে ওমরা করেছেন। যখন কাফিলা আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছুলো তখন তাঁর নিকট তিতির পাখীর গোশ্‌ত আনা হলো। তিনি কাফিলার সকলকে সেই গোশ্‌ত খেতে বললেন কিন্তু তিনি নিজে খেলেন না। আমর ইবনুল 'আস (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন—যে গোশ্‌ত খাওয়া আপনি নিজে পছন্দ করলেন না সেই গোশ্‌ত আমরা খাবো ? তিনি বললেন—এ ব্যাপারে আমার আচরণ কিছুটা ভিন্ন। কারণ এ পাখী আমার জন্য শিকার করা হয়েছে। অথবা তিনি বললেন—এটি আমার নাম নিয়ে শিকার করা হয়েছে।[১১৭]

আবদুল্লাহ ইবনু আমির (রা) হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে এ ধরনের আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—আমি গ্রীষ্মকালে আল-আরজ নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় হযরত ওসমান (রা)-কে দেখেছি। তিনি শুয়ে আছেন, একটি লাল কাপড় দিয়ে তার মুখমণ্ডল ঢাকা। অতপর তার সামনে শিকারের গোশ্‌ত আনা হলো। তিনি সাথীদেরকে তা খেতে নির্দেশ দিলেন। তারা বললেন—আপনি খাবেন না। তিনি জবাব দিলেন—আমার ব্যাপারটি আপনাদের চেয়ে ব্যতিক্রম। কারণ এ পশু আমার জন্যই শিকার করা হয়েছে।[১১৮]

এবার রইলো এ সম্পর্কিত আরো কিছু বর্ণনা যা ইমাম শাফিঈ (রহ) আল উম্ম এবং ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে—একবার ওসমান (রা) মুহরিম অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁর নিকট শিকার করে আনা তিতিরের গোশ্‌ত রাখা হলো। তিনি সেই গোশ্‌ত দিয়ে সারীদ (স্যুপ) তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। সারীদ তৈরী করে বড়ো একটি পেয়ালা ভরে তার নিকট আনা হলো। কাফিলার সবাই সেই সারীদ খেলেন। শুধু আলী (রা) তা খেলেন না। অথচ সবাই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন।

এ ঘটনার দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে—

এক. যিনি সেই পাখী শিকার করেছিলেন, হতে পারে তিনি শিকারের সময় ওসমান (রা)-এর কথা ভেবে শিকার করেননি। পরে হয়তো ভেবেছেন ওসমান (রা)-কে কিছু গোশ্‌ত হাদিয়া হিসেবে দেই।

www.amarboi.org

দুই. অথবা হতে পারে এ ঘটনা তিনি খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পূর্বের। তখন হয়তো তিনি মুহরিম অবস্থায় অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি মুহরিম নন তিনি শিকার করলে সেই গোশত খাওয়া জায়েয মনে করতেন। চাই তা মুহরিম ব্যক্তির জন্যই শিকার করুক কিংবা অন্য কারণে। পরবর্তীতে তিনি মত পাল্টে ফেলেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মুহরিম ব্যক্তিকে দেয়ার জন্য শিকার করলে সেই গোশ্‌ত খাওয়া মুহরিম ব্যক্তির জন্য জায়েয নেই। অবশ্য মুহরিম ব্যক্তিকে দেয়ার নিয়তে যদি শিকার না করে থাকে তাহলে সেই গোশ্‌ত মুহরিম ব্যক্তি খেলে কোনো দোষ নেই।

ইমাম ইবনু হাযম আল মুহাল্লীতে ইয়াসার ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন—সেখানে বলা হয়েছে—খিলাফতের প্রথম দু বছর হযরত ওসমান (রা) হাজ্জ কিংবা ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর রাস্তায় যেসব মনজিলে অবস্থান করতেন সেসব জায়গায় তাঁর জন্য বন্য প্রাণী শিকার করা হতো। তিনি সেগুলোর গোশ্‌ত খেতেন। পরে যুবাইর (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলাপ করেন এবং যে শিকার শুধু আমাদের জন্যই করা হয়, আমার বুঝে আসে না তা কিভাবে আমাদের জন্য জায়েয হতে পারে। আমরা যদি এটি পরিত্যাগ করতাম তাহলে কতইনা ভালো হতো ! তখন থেকে হযরত ওসমান (রা) মুহরিম অবস্থায় শিকারের গোশ্‌ত খাওয়া বর্জন করেন।[১১৯]

৪. ইহরাম খোলা

[৪.১] ওমরার জন্য ইহরাম বাধলে ওমরা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তা খোলা যায়। অর্থাৎ সাফা মারওয়া সাঈ করার পর ইহরাম মুক্ত হওয়া যায়।

–(বিস্তারিত 'ওমরা' শিরোনাম দেখুন)

আর হাজ্জের ইহরাম খোলা যায় ১০ই যিলহাজ্জ বড়ো শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের পর। কিন্তু মুহরিম ব্যক্তির জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী সম্ভোগ জায়েয নেই যতক্ষণ তিনি তাওয়াফে যিয়ারত না করবেন।

[৪.২] মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুর পরও তিনি মুহরিম থাকেন ঃ ইহরাম বাধা অবস্থায় যদি কেউ ইন্তিকাল করেন তাহলে তিনি মৃত্যুর পরও মুহরিম হিসেবেই থাকেন। এজন্য তাঁকে কাফন পরানোর সময় মাথা ঢাকা হয় না এবং কোনো সুগন্ধিও লাগানো হয় না। বরং ইহরামের চাদর দিয়েই তাকে কাফন দেয়া হয়।[১২০]

হযরত ওসমান (রা)-এর এক ছেলে মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাকে সুগন্ধি লাগানো হয়নি এবং তার মাথাও ঢেকে দেয়া হয়নি।[১২১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওয়ালীদ (রা) একবার হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে ওমরা করার জন্য রওয়ানা হলেন। পথে (আস সাকিয়া নামক স্থানে) তিনি মুহরিম অবস্থায় মারা গেলেন। হযরত ওসমান (রা) তাকে (ইহরামের কাপড়ে) কাফন পরালেন কিন্তু মাথা ঢাকলেন না এবং কোনো সুগন্ধিও লাগালেন না।[১২২]

হযরত ওসমান (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ের একটি ঘটনা থেকে দলিল গ্রহণ করেছিলেন। যা ইমাম বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন—এক ব্যক্তি নবী

www.amarboi.org

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হয়ে হাজ্জ আদায় করছিলেন। আরাফাতের ময়দানে হঠাৎ তিনি সওয়ারীর নিচে পড়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন—কুলপাতা দিয়ে পানি গরম করে সেই পানি দিয়ে তাকে গোসল দাও এবং ইহরামের কাপড় দিয়ে তাকে কাফন পরাও। তাকে কোনো সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢেকো না। কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পড়তে পড়তে ওঠবে।[১২৩]

www.amarboi.org

"ই" বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭৮।
২. মুসান্নাফ-ইবুন আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬০ ; ২য় খণ্ড, পৃ-১৫৫।
৩. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৩।
৪. সহীহ মুসলিম ; সুনানু আবী দাউদ ; নাসাঈ।
৫. সুনানু বাইহাকী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪২৯ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৮৩।
৬. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭২৪।
৭. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫২ ; তাফসীরে ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭০।
৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৩, মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৪০ ; আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৭১।
৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩১৬ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৯০ ; তাফসীরে ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭০ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৫৯ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫৬।
১০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২২৩।
১১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৩৪ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৬৫।
১২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২১৭।
১৩. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৮।
১৪. আল ই'তিবার, পৃ-১৮৪ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৫১২, ৫২৩।
১৫. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৯১ ; সুনানু তিরমিযি ; সুনান নাসাঈ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৫২১।
১৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩২ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫১ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৮৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১০৯।
১৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮৭, ২৫০ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৮৬ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৮২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১০৯।
১৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৫।
১৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৫।
২০. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৪৪৮।
২১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৫।
২২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২১৫।
২৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৫।
২৪. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ-৩৬২।
২৫. আল মাবসূত, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৯।
২৬. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৪৭ ; সিফাতুস সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ-৩০৩।
২৭. সিফাতুস সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ-৩০৩।
২৮. কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ-৭১।
২৯. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭৪৪।
৩০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৯।
৩১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৭১।
৩২. আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২১৩ ; সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১২৪।
৩৩. মুসান্নাফ-আবুদর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৩৪।
৩৪. সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২২।

www.amarboi.org

৩৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৯।

৩৬. সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪১।

৩৭. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৩০ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৭০ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৬ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩০০ ; সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৮৮।

৩৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩০০-৩০১।

৩৯. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩২৯।

৪০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৩।

৪১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৪০ ; সুনানু বাইহাকী ৭ম খণ্ড, পৃ-৪১৯ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২২৫, ২৬৯ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৭ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩০৭ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৬৫ ; কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-১৬৫০৫।

৪২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৬১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৭ ; সুনানু বাইহাকী ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৬২; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২১৮-২১৯, ২২১ ; কানযুল উম্মাল ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১০২ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৩০।

৪৩. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৭১ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২১৮ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৭।

৪৪. আল মুহাল্লী ১০ম খণ্ড, পৃ-২২৩ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৪।

৪৫. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৬৭, ৩৭৬।

৪৬. সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামি আত তিরমিযি ; সুনানু আবী দাউদ কিতাবুল ফারাইয অধ্যায়।

৪৭. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২১৯ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৯০ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৯৪; উমদাতুল কারী, ২৩শ খণ্ড, পৃ-২৬০।

৪৮. আর মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৯৯।

৪৯. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১৯।

৫০. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৬ ; ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৪৬ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৯০ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৯৯ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৪ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৭।

৫১. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), ইরছ শিরোনাম।

৫২. ফিকহে আবু বকর সিদ্দীক (রা) ইরছ শিরোনাম।

৫৩. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইরছ শিরোনাম।

৫৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৬৩ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৪৬ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৮৩।

৫৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৩ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৬৩ ; মুসান্নাফ-সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-২২ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৬৫ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২২৮ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২১৫।

৫৬. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১০-৫১১ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৬৭।

৫৭. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৮৬ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৬০।

৫৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৫২ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৬ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৬৮।

৫৯. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৮৯ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৬৯।

৬০. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৭৭ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৫ ; সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৬০ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৬ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৫ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৭৯ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২১১।

৬১. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৭ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৫৮ ; কানযুল উম্মাল, ১১শ খণ্ড, পৃ-২৪-২৬।

৬২. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), ইরছ শিরোনাম।

৬৩. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮০ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৫২ ; সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৪ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-১৩ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২২৮ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৬০ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮০।

৬৪. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮০।

www.amarboi.org

৬৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৫১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮১ ; সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪৭ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-২৫৬ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮১।
৬৬. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৬৭-৩৭৬।
৬৭. ওমদাতুল কারী, ২৩শ খণ্ড, পৃ-২৫৯।
৬৮. তাকমিলাতুল হাশিয়াহ আল ফাতারা, মুহাম্মদ মুস্তফা কাওরানী, শরহে সিরাজিয়্যাহ, পৃ-২৬৭ ; মিসরে মুদ্রিত।
৬৯. ফিকহে আবু বকর সিদ্দীক (রা), ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), এবং ফিকহে আলী ইবনু আবী তালিব (রা)-ইরছ শিরোনাম।
৭০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৯ ; সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯১।
৭১. ফাতওয়া-ই-হিন্দিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩৬৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৫৮ ; শরহে যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১১১।
৭২. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০২ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬৪৭।
৭৩. আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫০।
৭৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৭ ; ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), ইসতিবরা শিরোনাম।
৭৫. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৪৮।
৭৬. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৫৮।
৭৭. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৬১।
৭৮. আহকামুল কুরআন, আল জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৮১।
৭৯. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৬২ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৯।
৮০. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫১৫।
৮১. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫১৬।
৮২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-২২০ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫১৭ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৬৩।
৮৩. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৫৮।
৮৪. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, ভাগ, পৃ-১৪০।
৮৫. ফাতওয়া-ই-হিন্দিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩৬৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৫৮ ; শরহে যুরকানী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১১১।
৮৬. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৮ ; আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৯।
৮৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩০৮।
৮৮. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬ ; ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৭।
৮৯. আল মুহাল্লী. ৭ম খণ্ড, পৃ-১৩৭-১৪১ ; ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৭ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৭।
৯০. আবু দাউদ, কিতাবুত তাহারাত ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৭৭।
৯১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৬৭।
৯২. তাবাকাতে ইবনু সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৮।
৯৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৫৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৯ ; আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৩ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১০২ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯৪ ; ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৪।
৯৪. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫২৭ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৪৫ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-২৭৮।
৯৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৯।
৯৬. কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯১৫।
৯৭. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৬১৫।
৯৮. সুবুলুস সালাম, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩২।
৯৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১২ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৮৯ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৩৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৬৩ ; আল মুহাল্লী ৯ম খণ্ড, পৃ-৫২২ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৮৪।

www.amarboi.org

১০০. সুনানু বাইহাকী ৫ম খণ্ড, পৃ-৩১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬২ ; সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৫ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৫৫ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৬৫ ।

১০১. সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৪ ; কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; আল মাজমু, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৭০-৩৩৩ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫৪, ৩২৭; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৯১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৯ ।

১০২. আল মুহাল্লী ৭ম খণ্ড, পৃ-৯১ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩২৬ ।

১০৩. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩০৭ ; আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৬২ ।

১০৪. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৭৩ ।

১০৫. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৮৩ ।

১০৬. আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-২৮৪ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩১৬ ।

১০৭. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৬৬ ।

১০৮. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৬৮ ; আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-২৯০ ।

১০৯. আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৯৯ ।

১১০. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২২৪ ।

১১১. সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৮৫, মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৫৬ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫০৬ ; আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০৩ ।

১১২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮৪ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৪৫ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫০৯-৫১৭ ।

১১৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪১৮ ।

১১৪. আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-৪২২ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৪৫, ৫১৮ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪১৮ ।

১১৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৬ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫১৪, ৩৪৯; সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২০৫ ।

১১৬. আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩০ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩১২ ।

১১৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৩৩-৪৩৪ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৫০ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ।

১১৮. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ- ৩৫৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৯১ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩১২ ; আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩০ ।

১১৯. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৫৪ ।

১২০. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৩৭ ; আল মাজমু', ৫ম খণ্ড, পৃ-১৬৩ ।

১২১. সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭০ ।

১২২. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৫১ ।

১২৩. সহীহ্ আল বুখারী, সুনানু আবী দাউদ, জানাযা অধ্যায় ; সহীহ মুসলিম, জামি' আত তিরমিযি, হাজ্জ অধ্যায় ।

www.amarboi.org

ঈ

ঈদ (عيد)—

–ঈদের নামায।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–জুম'আ এবং ঈদ একই দিনে হওয়া।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–সাহাবা কিরাম একথার ওপর একমত হয়েছেন যে, জুম'আ কিংবা ঈদের দিন কোনো কাজ করা হারাম নয়।[১]

ঈমা (إيماء)—ইশারা করা

মহিলাদের বিশেষ পিরিয়ডে ইশারায় তিলাওয়াতের সিজদা করার নির্দেশ।

–('সুজূদ' শিরোনাম দেখুন)

ঈলা (إيلاء)—স্ত্রীর সাথে বিছানায় না যাওয়ার শপথ

১. সংজ্ঞা

স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন না করার ব্যাপারে স্বামীর শপথ করাকে ঈলা বলা হয়।

২. ঈলার প্রভাব ও পরিণতি

[২.১] কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যৌন মিলন না করার শপথ করেন, কিন্তু সেই সময় পূর্তির আগেই তার সাথে সহবাস করে ফেলেন, তাহলে ধরে নেয়া হবে তিনি তার শপথ ভঙ্গ করেছেন। এমতাবস্থায় তার শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি কেউ এরূপ শপথ করে একাধারে চার মাস পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন না করেন তাহলে এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী 'বাইন তালাক' হয়ে যাবে।[২]

কিন্তু ইমাম বাইহাকী এ রিওয়ায়েত বর্ণনার পর বলেন—এ বক্তব্যকে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। কারণ তাঁর যে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা এ বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ।[৩]

হযরত ওসমান (রা)-এর যে অভিমত বর্ণিত আছে, সেখানে বলা হয়েছে–ঈলা অবস্থায় চার মাস শেষ হয়ে গেলে বিচারক স্বামীর সামনে দুটো বিকল্প পেশ করবেন। স্বামী হয় স্ত্রীকে তালাক দেবেন, নয় তাকে ফিরিয়ে নেবেন। হযরত ওসমান (রা)-এর বক্তব্যের ভাষা হচ্ছে—'চার মাস শেষ হয়ে যাবার পর ঈলাকারী হয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে, না হয় তাকে তালাক দিয়ে দেবে।'[৪]

বস্তুত চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রীর তালাক সংঘটিত হবে তখন, যখন তাকে তালাক প্রদান করা হবে। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা)-এর অভিমতও হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমতের অনুরূপ।

www.amarboi.org

[২.২] ঈলার ইদ্দত ঃ ঈলার ইদ্দত ঐ রকমই হবে, যেরূপ একজন তালাক প্রাপ্তার ইদ্দত হয়ে থাকে। চার মাস অতিবাহিত হওয়ার কারণেই তালাক হোক কিংবা স্বামী তাকে তালাক দিক। সর্বাবস্থায় ইদ্দতের সময়সীমা এক ও অভিন্ন থাকবে।[৫]

www.amarboi.org

"ঈ" বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮১।

২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪৬ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৪৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৭৮ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪৫ ; তাফসীর-ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬৮ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩১৯।

৩. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৭৮।

৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৫৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৭৭ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪৬ ; কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯২৫, তাফসীর-ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১০২ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩১৮।

৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৫৪।

www.amarboi.org

উ

উখ্‌তু (اخت)—বোন

—মীরাছে বোনের অংশ।—('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

—দুবোনকে একই সাথে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।—('নিকাহ্‌' শিরোনাম দেখুন)

—পরস্পর দুধ বোন এমন দুজন বাঁদীর সাথে একই সময়ে মনিবের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা নিষেধ।—('তাসাররুফুন' শিরোনাম দেখুন)

উন্নাহ (عنة)—পুরুষত্বহীতা

১. সংজ্ঞা

স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে অসমর্থ পুরুষকে 'উন্নাহ' বলা হয়।

২. পুরুষত্বহীনতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ

পুরুষত্বহীন স্বামী যদি স্ত্রীর যৌন চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হন তাহলে স্ত্রী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মামলা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বি:রেক তার স্বামীকে চিকিৎসা করার জন্য এক বৎসরের অবকাশ দেবেন। চিকিৎসা করে এ সময়ের মধ্যে যদি তিনি সুস্থ হয়ে স্ত্রীর যৌন চাহিদা মেটাতে সমর্থ হন তাহলে স্ত্রী তারই থাকবেন। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আপনাআপনি খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি তিনি সক্ষম না হন তাহলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। তখন সেই স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিয়ের আগে ইদ্দত পালন করতে হবে।[১]

উম্মু ওয়ালাদ (ام ولد)—

এমন বাঁদীকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয় যার গর্ভে তার মনিবের সন্তান জন্ম নিয়েছে।

—(বিস্তারিত জানার জন্য 'রিককুন' শিরোনাম দেখুন)

উম্মুন (ام)—মা

—উত্তরাধিকারে মায়ের অংশ।—('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

—জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য মায়ের অনুমতি নেয়া।—('ইসতিযান' শিরোনাম দেখুন)

—সন্তানের দাসত্ব কিংবা স্বাধীনতা তার মায়ের অনুগামী।—('ইস্‌তিহ্‌কাক' শিরোনাম দেখুন)

—দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মা ও সন্তানকে পৃথক না করা।

—('রিককুন' শিরোনাম দেখুন)

উযবু (عضو)—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

শরীরের কোনো অঙ্গে অপরাধ সংঘটিত করা।—('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

উযুনুন (اذن)—কান

ওযুতে উভয় কানের ভেতর এবং বাইরে মাসেহ করা।—('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

'উ' বর্ণের তথ্য সূত্র

১. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৬৬৭।

www.amarboi.org

ওকুবাহ্ (عقوبة)—শাস্তি

১. সংজ্ঞা

ওকুবাহ্ বলতে এমন পার্থিব শাস্তিকে বুঝায় যা শরঈ কোনো বিধান লংঘনের কারণে দেয়া হয়।

২. ওকুবাহ্র শ্রেণী বিভাগ

ওকুবাহ্ কে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

[২.১] হুদূদ ('হাদ' শিরোনাম দেখুন)

[২.২] কিসাস ('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

[২.৩] দিয়াত ('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

[২.৪] কাফ্ফারা ('জিনাইয়া' ও 'কাফ্ফারা' শিরোনাম দেখুন)

[২.৫] মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া।–('ইরছ্' শিরোনাম দেখুন)

[২.৬] তাযীর ('তা'যীর' শিরোনাম দেখুন)

ওমরা (عمرة)—এক প্রকার হাজ্জ

১. ওমরার সময়

হাজ্জের মাস ছাড়া অন্য যে কোনো মাসে একজন মুসলমানের জন্য ওমরা করা জায়েয। আর যদি তিনি তামাত্তু কিংবা কিরান হাজ্জের নিয়ত করে রাখেন তাহলে হাজ্জের মাসেও ওমরা করতে পারবেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে—সারা বৎসর যেন বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফকারীদের দ্বারা আবাদ থাকে। ইবনু আওন বলেন—আমি কাসিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হযরত ওমর (রা) তো হাজ্জের মাসে ওমরা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বললেন—হযরত ওসমান (রা)ও হাজ্জের মাসে ওমরা করতে নিষেধ করেছেন।[১]

হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—তিনি রজব মাসে ওমরা করেছিলেন।[২]

২. ওমরার শরঈ মর্যাদা

ওমরা করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কেউ তামাত্তু বা কিরাণ হাজ্জ করেন তাহলে তার ওপর থেকে ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়। ওমরা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকল সাহাবা কিরাম একমত। শুধু আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) ছাড়া আর কেউ দ্বিমত করেননি। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) মনে করতেন ওমরা একটি নফল ইবাদাত।[৩]

৩. ওমরায় যেসব কাজ করতে হয়

যে ব্যক্তি ওমরা করার ইচ্ছে করবে তাকে হাজ্জের সময়ের মত মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়া শুরু করতে হবে। তারপর মক্কায় পৌছে সাতবার খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্বে সাতবার দৌড়াতে হবে যা সাঈ নামে পরিচিত। হাজ্জের সময় এ কাজগুলো যেভাবে করতে হয় ঠিক সেভাবে করতে হবে।

www.amarboi.org

আবদুর রহমান ইবনু আমর ইবনু সাহল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি একবার দেখেছিলাম, হযরত ওসমান (রা) ওমরা করার জন্য মক্কায় এসেছিলেন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি ওমরা শেষ করে আর সেখানে বিলম্ব করেননি।[৪]

তদ্রূপ ইমাম মালিক (রহ) তাঁর মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) যখন ওমরা শেষ করতেন তখন বেশীর ভাগ সময়ই তিনি সওয়ারী থেকে না নেমে ফিরে চলে যেতেন।[৫]

ওযর (عذر)–সংগত কারণ

ওযর বলতে এমন অবস্থা বা পরিস্থিতিকে বুঝায় যার কারণে কোনো শরঈ নির্দেশ পালন কিংবা কোনো নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিকর ও কষ্টসাধ্য হয়ে দেখা দেয়।–('যুরুরাতুন' শিরোনাম দেখুন)

ওযু (وضوء)–নির্দিষ্ট নিয়মে কতিপয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া

১. ওযুর পাত্র

যে পানি দিয়ে ওযু করা হয়, শর্ত হচ্ছে তা নিজে পবিত্র এবং অপরকে পবিত্র করার মান সম্পন্ন হতে হবে। অতপর তা তামা, কাঠ কিংবা চামড়া নির্মিত পাত্রে রাখলে কোনো দোষ নেই। হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—"আমি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা)-কে দেখেছি, এক ব্যক্তি লোটা থেকে পানি ঢালছে আর তিনি সেই পানি দিয়ে ওযু করছেন।"[৬] ইবনু আবী শাইবা তাঁর নিজস্ব সনদে হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) মাটির পাত্রে কিংবা পাথরের বাটিতে পানি নিয়ে ওযু করতেন।[৭]

২. কারো সাহায্য নিয়ে ওযু করা

কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেই ওযুর যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হযরত ওসমান (রা) পছন্দ করতেন।। যেন সবটুকু সওয়াব তিনি একাই পেয়ে যান। ইবনু আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) রাতে ওঠে নিজেই ওযু করতেন। জিজ্ঞেস করা হলো—(পানি এনে রাখতে) খাদেমকে বলেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন—"নিজের ওযু নিজেই করবো, এটিই আমার পছন্দ।"[৮]

৩. ওযুর কার্যাবলী

[৩.১] ওযুর বর্ণনা ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর গোলাম হামরান তাঁর ওযুর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—তিনি একপাত্র পানি চাইলেন। পানি আনা হলে তিনি দু হাতের পাঞ্জা ভালোভাবে ধুয়ে নিলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত দিয়ে পানি ওঠিয়ে তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। অতপর তিনবার ডান হাত এবং তিনবার বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। পাত্রে হাত ডুবিয়ে ভিজিয়ে নিলেন তারপর সেই ভিজে হাত দিয়ে মাথা ও কান মাসেহ করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে—তারপর দু পা গোড়ালির গিট পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে ওযু শেষ করলেন। পরে বললেন—'ওযু সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবেই ওযু করতে দেখেছি।[৯]

www.amarboi.org

[৩.২] **দাঁড়ি খিলাল করা ঃ** যখন ওযুকারী মুখমণ্ডল ধুবেন তখন আঙ্গুল দিয়ে দাঁড়িও খিলাল করবেন, যদি থাকে। বর্ণনাকারী আবু ওয়াইল বলেন—আমি ওসমান (রা)-কে ওযু করতে দেখেছি। তিনি তিনবার তাঁর দাঁড়ি খিলাল করেছেন।[১০]

[৩.৩] **একবার মাথা মাসেহ করা ঃ** হযরত ওসমান (রা)-এর ওযু সংক্রান্ত যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখানে দেখা যায় তিনি একবার মাত্র মাথা মাসেহ করেছেন।[১১] এবং মাথার এক অংশের অর্থাৎ সামনের অংশের মাসেহ করাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।[১২]

[৩.৪] **কান মাসেহ করা ঃ** হযরত ওসমান (রা)-এর ওযু সম্পর্কে ওপরে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখানে আরো দেখা গেছে—তিনি মাথা মাসেহ করে সেই ভেজা হাত দিয়েই কান মাসেহ করেছেন নতুন করে পানি ব্যবহারের প্রয়োজন মনে করেননি।[১৩] কেননা তিনি কানকে মাথার অংশ মনে করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন—"সবারই জেনে রাখা উচিত, উভয় কান-ই মাথার অংশ।"[১৪]

তিনি কানের ভেতর এবং বাইরে উভয় দিকেই মাসেহ করতেন। যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেভাবে আবদুর রাজ্জাক তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।[১৫]

[৩.৫] **তারতীব (ধারাবাহিকা) রক্ষা করা ঃ** ইমাম নববী আল মাজমু গ্রন্থে লিখেছেন—হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন তারতীব অনুযায়ী ওযু করা ওয়াজিব।[১৬]

৪. ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ ঃ

[৪.১] পেশাব এবং পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বেরুলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সকল সাহাবা কিরাম একমত। পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা কিছুই বের হোক, চাই তা পেশাব, পায়খানই হোক কিংবা বীর্য বা স্রাব। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—'মযী বেরুলে অবশ্যই ওযু করতে হবে।'[১৭]

[৪.২] **ঘুমের ঝোঁকে যে ব্যক্তি কোনো অবলম্বন ছাড়া ঢলে পড়ে ঃ** যে ব্যক্তি ঘুমের কারণে স্থির থাকতে পারে না, তার অবস্থা শুয়ে ঘুমানো ব্যক্তির মত। যিনি শুয়ে ঘুমিয়ে যান তৎক্ষণাৎ তার ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বলা যায়—যে ব্যক্তি বসে বসে ঘুমায় অর্থাৎ তন্দ্রা যায় তার ওযু নষ্ট হয় না।

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ ঘুমিয়ে যেতেন কিন্তু ওযু করতেন না। ঘুমিয়ে যাওয়ার অর্থ তাঁরা নামাযের প্রতীক্ষা করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। সুনানু আবী দাউদে বর্ণিত হয়েছে—সাহাবাগণ ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে করতে এমনভাবে তাঁরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, তাদের মাথা একবার ওপরে ওঠতো আবার ঝুঁকে পড়তো। ঐ অবস্থায়ই তারা নামায পড়ে নিতেন, ওযু করতেন না।[১৮]–(আরো দেখুন–'গাসলুন' শিরোনাম)

[৪.৩] **স্ত্রী সহবাসে যদি বীর্য স্খলিত না হয় ঃ** হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন—স্ত্রী সহবাসে যদি বীর্য স্খলিত না হয় তাহলে গোসল ফরয হয় না, শুধু ওযু ফরয হয়।* হযরত

* 'গোসল' শিরোনামে হযরত ওসমান (রা)-এর বিপরীত মতও আলোচনা করা হয়েছে।–(অনুবাদক)

www.amarboi.org

ওসমান (রা) সম্পর্কে এক বর্ণনায় আছে—একবার যায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী (রহ) ওসমান (রা)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন কিন্তু বীর্যপাত হলো না। তিনি বললেন—সে ওযু করবে, যেভাবে নামাযের জন্য ওযু করা হয় এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে।[১৯]

[৪.৪] **জানাযা বহনের পর ওযু ঃ** হযরত ওসমান (রা) জানাযা বহনের পর ওযু করা মুস্তাহাব মনে করতেন।–('মাওত' শিরোনাম দেখুন)

[৪.৫] **আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর ওযু ঃ** হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন, আগুনে পাকানো গোশ্‌ত খাওয়ার পর ওযু করার প্রয়োজন নেই। এমনকি তিনি নিজেও ওযু করতেন না।[২০] একবার তিনি রুটি ও ভুনা গোশ্‌ত খেলেন। তারপর কুলি করে হাত ধুলেন। অতপর উভয় হাত মুখমণ্ডলে মুছে নিলেন এবং নামায পড়লেন কিন্তু ওযু করলেন না।[২১]

[৪.৬] যাকে আল্লাহ এমন অসুখ দেন যাতে ওযু নষ্টের কারণ অব্যাহতভাবে ঘটতে থাকে। যেমন—অবিরত পেশাব ঝরা। এমতাবস্থায় তিনি প্রতি ওয়াক্তে নতুন করে ওযু করে নামায পড়বেন। তখন নামাযের মধ্যে পেশাব ঝরলেও তার ওযু নষ্ট হবে না। হযরত ওসমান (রা)-ও পেশাব ঝরা অসুখে পড়েছিলেন। তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নতুন করে ওযু করে নিতেন।[২২]

৫. ওযুর সময় কথাবার্তা বলা

হযরত ওসমান (রা)-এর মতে ওযু এক ধরনের ইবাদাত। তাই ওযুর সময় কথাবার্তা বলা তিনি মাকরূহ মনে করতেন। এমনকি তা সালামের জবাব-ই হোক না কেন। এজন্য ওযু করার সময় কেউ তাঁকে সালাম দিলে তিনি ওযু শেষ করে তারপর সালামের জবাব দিতেন। তিনি বলতেন–আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।[২৩]

৬. ওযুর পর শরীর থেকে পানি ঝেরে ফেলা

ওযুর পর শরীরে লেগে থাকা পানি ঝেরে ফেলা কিংবা মুছে ফেলা অথবা শুকানো ওযুকারীর জন্য জায়েয।[২৪]–('তানশীফ' শিরোনাম দেখুন)

ওয়াক্‌ফ (وقف)—

১. সংজ্ঞা

বস্তুর মূল স্বত্ব ঠিক রেখে তা থেকে প্রাপ্ত লাভ বা উপকার ব্যয় করতে থাকাকে ওয়াক্‌ফ বলে।

২. ওয়াকফের শরঈ ভিত্তি

ওয়াক্‌ফ শরীআহ্‌ সম্মত। হযরত ওসমান (রা) রাওমা নামক কূপ কিনে মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। যেন চাহিদা অনুযায়ী যে কেউ তা থেকে কোনো বিনিময় ছাড়াই পানি সংগ্রহ করতে পারেন। এ কূপটি প্রথমে এক ইহুদীর মলিকানায় ছিলো। সে কূপের পানি বিক্রি করতো। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُوْمَةَ يُوْسِعُ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَهُ الْجَنَّةُ ـ

www.amarboi.org

"যে ব্যক্তি রাওমা কূপটি কিনে মুসলমানকে পানির সুবিধা করে দেবে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।"

একথা শুনে হযরত ওসমান (রা) সেই ইহুদীর কাছ থেকে কূপের অর্ধেক মালিকানা খরিদ করে নিলেন এবং ইহুদীকে মূল্য বাবদ ১২ হাজার দিরহাম পরিশোধ করলেন। তারপর তাকে প্রস্তাব দিলেন—একদিন তুমি কূপ ব্যবহার করবে এবং একদিন আমি। অথবা কূপ থেকে তুমি এক বালতি পানি তুলবে আর আমিও এক বালতি পানি তুলবো। সে প্রথম প্রস্তাব মেনে নিলো। দেখা গেলো যেদিন ওসমান (রা)-এর কূপ ব্যবহারের পালা আসতো সেদিন সবাই দু' দিনের পানি সংগ্রহ করে রাখতেন। কাজেই ইহুদীর ব্যবহারের দিন সেই পানি কেনার জন্য কেউ যেত না। তখন সে রেগে গিয়ে হযরত ওসমান (রা)-কে বললো—তুমি আমার কূপের ব্যবসাটাকে বরবাদ করে দিলে। এখন তুমি অবশিষ্ট মালিকানা ক্রয় করে আমাকে রক্ষা করো। তখন তিনি ৮ হাজার দিরহাম দিয়ে বাকী মালিকানা খরিদ করে নিলেন। অতপর পুরো কূপ মুসলমানের (ব্যবহারের) জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন।[২৫]

–তিনি তার কন্যাদের জন্য নিজের বাড়ীও ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[২৬]

ওয়াক্‌যাহ (وكزة)–ঘুষি মারা

ঘুষি মারার কারণে দেয় জরিমানা।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

ওয়াকালাহ্ (وكالة)–অভিভাবকত্ব/প্রতিনিধিত্ব

১. সংজ্ঞা

যেসব কাজে দায়িত্ব অর্পণ করা যায় তার জন্য এমন কাউকে প্রতিনিধি বানিয়ে দেয়ার নাম ওয়াকালাহ্ বা ওয়াকালাত যার তৎপরতা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয।

২. যেসব কাজে প্রতিনিধিত্ব (ওয়াকালাত) জায়েয

[২.১] যাবতীয় হক্‌কুল ইবাদে ওয়াকালাত (প্রতিনিধিত্ব) বৈধ। যেমন বিয়ে (নিকাহ্ দেখুন), কিসাস, মোকদ্দমা ইত্যাদি। হযরত আলী (রা) আবদুল্লাহ ইবনু জাফরকে এক ফৌজদারী মামলায় হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে ওকীল নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন—"ঝগড়া এবং মোকদ্দমায় সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়, শয়তানও এ সময় উপস্থিত হয়ে যায়, এজন্য আমি সেখানে যাওয়াটা পছন্দ করি না।"[২৭]

[২.২] এমন হকুকুল্লাহর (আল্লাহর হক সংক্রান্ত ইবাদাত) মধ্যেও ওয়াকালাহ জায়েয, যে বিষয়ে কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করা সম্ভব হয়। যেমন—হদূদের শাস্তি প্রয়োগ ('হাদ' এবং 'আশরাবাহ' দেখুন), যাকাত আদায়, হাজ্জ প্রভৃতি।

[২.৩] কিন্তু এমন হকুকুল্লাহর মধ্যে ওয়াকালাহ জায়েয নেই, যেখানে প্রতিনিধির মাধ্যমে সেই ইবাদাত করানো সম্ভব নয়। এগুলো সাধারণত দৈহিক ইবাদাত হয়ে থাকে। যেমন–নামায, রোযা।

ওয়াজহুন (وجه)–মুখমণ্ডল

–মুহরিমের (ইহরাম অবস্থায়) মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা।–('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

–মুহরিম (ইহরাম বেধেছেন এমন) মহিলাদের মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।–(বিস্তারিত দেখুন, 'ইহরাম' শিরোনাম)

–ওযুর সময় মুখমণ্ডল ধোয়া।–('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

ওয়াত্‌উন (وطء)–সহবাস করা

১. সহবাসের প্রকার

সহবাস তিন প্রকার ঃ-

[১.১] বৈধ সহবাস–যেমন বিয়ে করে সহবাস ('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন) অথবা বাঁদীর সাথে সহবাস।–('তাসরীয়ুন' শিরোনাম দেখুন)

[১.২] মৌলিক দিক থেকে সহবাস বৈধ কিন্তু শরঈ কোনো বাধা থাকার কারণে হারাম হয়ে যাওয়া। যেমন হায়িয (মাসিক) এবং নিফাস (প্রসবান্তে স্রাব)-এর সময় স্ত্রী সহবাস (হায়িয শিরোনাম দেখুন) অথবা হাজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছে এমন স্ত্রীর সাথে সহবাস।
–('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

[১.৩] অবৈধ সহবাস–এমন মহিলার সাথে সহবাস করা যার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বৈধতার কোনো কারণ উপস্থিত নেই।–('যিনা' শিরোনাম দেখুন)। অদ্রূপ মলদ্বার দিয়ে যৌন সঙ্গম করা।–('লিওয়াতাত' শিরোনাম দেখুন)

২. সহবাসের প্রভাব ও পরিণতি ঃ-

সহবাসের প্রভাব ও পরিণতি নিম্নরূপ ঃ

[২.১] বৈধ সহবাসে সওয়াব এবং শরী'আহ যেসব সহবাসকে নিষিদ্ধ করেছে এবং তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত সেসব সহবাসে গুনাহ্ হয়।

[২.২] বিয়ের ভিত্তিতে সহবাস হলে স্ত্রীর মোহর ও ভরণ পোষণ স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

[২.৩] সহবাসের কারণে শারীরিক ইবাদাত অর্থাৎ রোযা এবং হাজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়া। একথার ওপর সকলেই একমত।

[২.৪] শরী'আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সহবাস এবং তার কারণে পার্থিব শাস্তি ভোগ করা।
–('যিনা' এবং 'লিওয়াতাত' শিরোনাম দেখুন)

[২.৫] গোসল ওয়াজিব হওয়া।–('গুসলুন' এবং 'ওযু' শিরোনাম দেখুন)

[২.৬] হুরমতে মুসাহহারাত (বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম) প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

৩. যে কথার প্রেক্ষিতে সহবাসের অধিকার নষ্ট হয়ে যায়

যেসব কারণে স্ত্রী কিংবা বাঁদীর সাথে সহবাসের অধিকার নষ্ট হয়ে যায় এবং সহবাসের পূর্বের অবস্থা বলবত থাকে না, তা নিম্নরূপ—

[৩.১] তালাকে বাইন, যা মুগাল্লাযা নয়—এ ধরনের মহিলার সাথে সহবাস করার অধিকার আবার তখনই সৃষ্টি হবে যখন পুনরায় তাকে নতুন করে মোহর নির্ধারণ করে বিয়ে করা হবে।

www.amarboi.org

আর যদি তালাকে মুগাল্লাযা হয় তাহলে মহিলা ইদ্দতের পর অন্যত্র বিয়ে করবে অতপর সেই ব্যক্তি যদি আবার তাকে তালাক দেয় তবে ইদ্দত অন্তে পূর্ব স্বামী পুনরায় বিয়ে করলে তার সাথে সহবাসের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।-(আরো জানার জন্য দেখুন-'তালাক' শিরোনাম)

[৩.২] পুরো বাঁদী কিংবা তার কোনো অংশ যদি অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়।-('তাসরিয়ুন' শিরোনাম দেখুন)

[৩.৩] যিহারের কারণে স্ত্রীর সাথে ততক্ষণ সহবাস করা হারাম যতক্ষণ যিহারের কাফ্‌ফারা আদায় করা না হবে।-('যিহার' শিরোনাম দেখুন)

৪. সহবাস না করার শপথ

-বিস্তারিত জানার জন্য 'ঈলা' শিরোনাম দেখুন।

-সহবাসের সময় আযল করা।-('আযল' শিরোনাম দেখুন)

ওয়ালা (ولاء)-বন্ধুত্ব

১. সংজ্ঞা

ওয়ালা এমন এক সম্পর্কের নাম যা কাউকে দাসত্ব মুক্ত করার কারণে কিংবা বন্ধুত্ব চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে।-('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

২. দাসত্ব মোচনের কারণে অর্জিত ওয়ালা

[২.১] দাসত্ব মোচনকারী ব্যক্তি সেই দাসের ওয়ালা হয়ে যান। যিনি মুক্ত করলেন তিনি পুরুষ হোন কিংবা মহিলা তাতে কিছু যায় আসে না। আর দাসত্ব মোচন যেভাবেই হোক মুকাতাব হিসেবে কিংবা উম্মু ওয়ালাদ হিসেবে অথবা অন্য কোনোভাবে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) এ আইন প্রণয়ন করে রেখেছিলেন যে, উম্মু ওয়ালাদের মৃত্যুর পর মনিব তার ওয়ালা হবেন।[২৮]

[২.২] **ওয়ালার অধিকার টেনে নেয়া ঃ** যখন কোনো গোলাম কোনো বাঁদীকে বিয়ে করে আর বাঁদী মুক্ত হয়ে যায় এবং তার গর্ভে দাসের সন্তান থাকে তাহলে সেই বাঁদীর ওয়ালা হবেন তিনি, যিনি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। আর যিনি মায়ের ওয়ালা হবেন সন্তানের ওয়ালাও তিনিই হবেন। কারণ তাঁর অনুগ্রহের কারণেই সন্তান স্বাধীনতা পেয়েছে। এখন যদি কেউ ঐ গোলাম (সন্তানের পিতা)-কে মুক্ত করে দেন তাহলে মুক্তকারী তার ওয়ালা হবেন। সেই সাথে তার স্ত্রী ও সন্তানের ওয়ালাও তিনিই হবেন। আগে যিনি বাঁদী স্ত্রীকে মুক্ত করে ওয়ালা হয়েছিলেন তার সেই অধিকার হস্তান্তর হয়ে যাবে। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—সন্তানের ওয়ালা তিনিই হবেন যিনি তার পিতার দাসত্ব মোচন করেছেন।[২৯] হযরত যুবাইর (রা) ইবনুল আওয়াম খায়বার গিয়েছিলেন। সেখানে কতিপয় যুবকের বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখে তিনি অভিভূত হয়ে যান। তাদের সম্পর্কে জানতে চাইলে বলা হলো—এসব যুবক রাফি (রা) ইবনু খাদীজের গোলাম। যুবাইর (রা) জানতে চাইলেন কোথেকে এসেছে ? বলা হলো—রাফি (রা)-এর বাঁদীকে বেদুঈনদের এক দাসের সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এরা তারই গর্ভজাত। তখন যুবাইর (রা) যুবকদের পিতাকে ৫০ দিরহামে কিনে মুক্ত করে দিলেন এবং যুবকদেরকে রাফি (রা)-এর মালিকানা থেকে নিজের মালিকানায় নিয়ে নিলেন। তারপর

www.amarboi.org

মদীনায় ফিরে এসে রাফি (রা)-কে জানিয়ে দিলেন। আর বললেন—এ ব্যাপারে যদি তুমি আমার সাথে ঝগড়া করতে চাও, তাহলে ফায়সালার জন্য আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে এসো। রাফি (রা) ওসমান (রা)-এর নিকট এসে সবকিছু খুলে বললেন। যুবাইর (রা)-এর কথাগুলোও তিনি বললেন। সব শুনে ওসমান (রা) ফায়সালা দিলেন—যুবাইর ঠিকই বলেছেন। এসব যুবক তার মালিকানায় চলে গেছে।[৩০]

যদি মুক্তি পাওয়ার আগে সন্তান হয়ে থাকে তাহলে এ সন্তান মায়ের যে মনিব তার মালিকানাভুক্ত হবে এবং তিনি ওয়ালা হিসেবেও গণ্য হবেন। পিতা মুক্ত হওয়ার পর সেই ওয়ালাকে নিজের মনিবের দিকে প্রত্যাবর্তন করাতে পারবে না। আলা ইবনু আবদুর রহমান তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন—আমার মা হারকাহ্ গোত্রের আযাদকৃত বাঁদী ছিলেন আর আমার পিতা মালিক ইবনু আওস এর মুকাতাব দাস দিলেন। আমার পিতা চুক্তিকৃত টাকা পরিশোধ করে দিলেন। তখন হারকাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি ওসমান (রা)-এর কাছে এসে আমার (জন্য) ভাতা দাবী করলেন। সেখানে মালিক ইবনু আওস (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন—এতো আমার আযাদ করা। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেলো। হযরত ওসমান (রা) এ মামলার রায় হারকাহ্ গোত্রের লোকটির পক্ষে দিলেন।[৩১]

[২.৩] ওয়ালা হস্তান্তর

[ক] হিবার মাধ্যমে ওয়ালা হস্তান্তর ঃ হযরত ওসমান (রা) ফায়সালা দিয়েছিলেন —হিবার মাধ্যমে ওয়ালা হস্তান্তর হয়ে যায়। আবু বকর ইবনু হাযম বর্ণনা করেছেন—মাহারিব গোত্রের এক মহিলা তার আযাদকৃত দাসের ওয়ালা তার মেয়েকে হিবা করে দিয়েছিলেন। সেই দাস তার ওয়ালা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করে আবদুর রহমান ইবনু আমর ইবনু হাযমকে ওয়ালা মেনে নেয়। ইত্যবসরে মহিলা ইন্তিকাল করেন। এ বিবাদ শেষ পর্যন্ত হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট পৌছে। তিনি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য তলব করেন। সেই দাস সাক্ষ্য উপস্থিত করলো। তখন তিনি বললেন—'যাও; যার সাথে খুশী ওয়ালা সম্পর্ক স্থাপন করোগে।[৩২]

এ বর্ণনার ব্যাখ্যা হচ্ছে—মহিলা তার গোলামের ওয়ালা কন্যাকে হিবা করেছিলেন কিন্তু সেই গোলামের পিতার ওয়ালা সেই কন্যার বলে প্রমাণিত হয়নি। এজন্য ওয়ালা পিতার দিকে ফিরে এসেছে এবং সে এ ওয়ালা আবদুর রহমান ইবনু আমর ইবনু হাযমকে হিবা করে দিয়েছে।—(আল্লাহই ভালো জানেন)

[খ] ওয়ালা নিকটতম আত্মীয়ের জন্য ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যেভাবে ওয়ারিশদের মধ্যে হস্তান্তর হয়ে যায়, ওয়ালাও তেমনিভাবে হস্তান্তর হয়। নিকটতম আসাবা দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করে। যদি কেউ দুছেলে এবং আযাদকৃত এক গোলাম রেখে মারা যায়। পরে এক ছেলেও মারা যায়, তার এক ছেলে রেখে। অতপর যে গোলামকে মুক্ত করা হয়েছিলো সেও মারা যায়। তাহলে মৃত গোলামের ওয়ালা হবেন, যিনি তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন তার ছেলে। নাতি কিছুই পাবে না। কারণ নিকটাত্মীয়ের দিক থেকে ছেলে নাতির চেয়ে নিকটতর। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—'যে সবচেয়ে কাছের আত্মীয় ওয়ালা তার।'[৩৩] যদি ঐ ভদ্রলোকের দুছেলেই আযাদকৃত গোলামের পূর্বে মারা যেত এবং একজনের এক ছেলে আর অন্যজনের ন' ছেলেও থাকতো তাহলে দু ভাইয়ের সব ছেলেরাই ওয়ালার ব্যাপারে সমান অংশীদার হতো।[৩৪] আস ইবনু হিশাম তিন ছেলে রেখে ইন্তিকাল করলেন। দু

www.amarboi.org

ছেলে সহোদর এবং একজন বৈমাত্রেয়। সেই দুই ভাইয়ের একজন অনেক ক্রীতদাস ও মালামাল রেখে মারা যায়। তখন এক দুধ ভাই তার সম্পদ ও ওয়ালার উত্তরাধিকারী হয়। পরে সেও এক ছেলে এবং এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা যায়। ছেলে দাবী করলো—আমার পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং ওয়ালা সবকিছুর মালিক আমি। বৈমাত্রেয় ভাই বললো—তা হতে পারে না। তুমি ওয়ারিস হিসেবে সম্পত্তি নিতে চাও নাও কিন্তু দাসের ওয়ালা আমার। ভেবে দেখ আজ যদি আমার আপন ভাই মারা যেত তাহলে আমি কি তার সম্পদে অংশ পেতাম না? উভয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকটই মামলা দায়ের করলেন। তিনি ওয়ালার ব্যাপারে ভাইয়ের পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন।[৩৫]

৩. বন্ধুত্ব চুক্তির ভিত্তিতে ওয়ালা

পেছনের প্যারায় আমরা হিবার মাধ্যমে ওয়ালা হস্তান্তরের আলোচনা করেছি। সেখানে হযরত ওসমান (রা)-এর এ বক্তব্য এসেছে—'যাও যার সাথে খুশী ওয়ালা সম্পর্ক (বন্ধুত্ব) স্থাপন করোগে।'[৩৬] এ থেকে বুঝা যায় তিনি বন্ধুত্ব চুক্তির ভিত্তিতে ওয়ালা নির্ধারণের পক্ষে ছিলেন। বন্ধুত্ব চুক্তির সময় এভাবে বলা হয়-'তুমি আমার বন্ধু আমি মরে গেলে আমার সমস্ত সম্পদের অধিকারী হবে তুমি। আর যদি আমার কোনো জেল জরিমানা হয়ে যায় তাহলে তুমি যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নেবে।'

ওয়ালাদ (ولد)—সন্তান

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং সর্বদা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা সন্তানের জন্য ফরয। হযরত ওসমান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বলে দিন কার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে? তিনি বললেন—তোমার পিতামাতার সাথে। সে উত্তর দিলো—আমার মা বাবা তো জীবিত নেই।' তিনি বললেন—তাহলে তোমার সন্তানের সাথে।[৩৭]

- –সন্তানের গোলামী কিংবা স্বাধীনতা নির্ভর করে তার মায়ের গোলামী কিংবা স্বাধীনতার ওপর।–('রিককুন' শিরোনাম দেখুন)
- –দানের সময় সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা।–('হিবা' শিরোনাম দেখুন)
- –পিতা থেকে সন্তানের বংশ পরিচয় প্রমাণিত হয়।–('নসব' শিরোনাম দেখুন)
- –জিহাদে যাওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুমতি নেয়া অবশ্য কর্তব্য।
–('ইসতিয়ান' শিরোনাম দেখুন)
- –পিতা কর্তৃক সন্তানকে কিছু দান করা।–('হিবা' শিরোনাম দেখুন)
- –সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার দান গ্রহণ।–('হিবা' শিরোনাম দেখুন)
- –পুত্রবধূ শ্বশুরের জন্য হারাম হওয়া প্রসঙ্গে।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)
- –পিতা কর্তৃক তার সন্তানের ফিদইয়া আদায় করা। যদি তাদের মা প্রতারণা করে বলে যে সে মুক্ত, অথচ সে বাঁদী।–('ইসতিহকাক' শিরোনাম দেখুন)
- –পিতার পক্ষ থেকে ঐ সন্তানের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা, যার ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার।–('যাকাতুল ফিতর' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

–বেচা কেনার সময় পিতামাতা থেকে সন্তানকে পৃথক না করা।
–('রিককুন' শিরোনাম দেখুন)

–সন্তানের সরকারী ভাতা।–('আতা' শিরোনাম দেখুন)

ওয়ালী (ولى)–অভিভাবক/ওলী

কন্যার বিয়েতে অভিভাবকের ভূমিকা।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

ওয়ালীমাহ্ (وليمة)–বিবাহ ভোজ

রোযাদার ব্যক্তির ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ প্রসঙ্গে।–(দেখুন 'দাওয়াত' শিরোনাম)

ওশর[১] (عشر)–

১. সংজ্ঞা

ওশর বলতে এখানে এক ধরনের ট্যাক্স (Tax)-কে বুঝানো হয়েছে যা কোনো অমুসলিম ব্যবসায়ী ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে প্রবেশ করলে তার কাছ থেকে আদায় করা হয়।

২. হযরত ওমর (রা) প্রথম এ ট্যাক্সের প্রচলন করেন। হযরত ওসমান (রা)-ও অমুসলিম ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এ ট্যাক্স (ওশর) আদায় করেছেন।

ওয়াসিয়্যাত (وصية)–ওসিয়ত

১. সংজ্ঞা

কোনোরূপ বিনিময় গ্রহণ না করে কাউকে কিছুর মালিক ঘোষণা করা, যা ঘোষণাকারীর মৃত্যুর পর কার্যকরী হয়, তাকে ওসিয়ত বলে।

২. আল ওয়াসী–('ওয়াসী' শিরোনাম দেখুন)

৩. হযরত ওসমান (রা)-এর ওসিয়ত

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইবনু কাসীর বলেছেন—হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর তাঁর সিন্দুক খোলা হলো। সেখানে একটি কাগজ পাওয়া গেলো। তাতে লিখা ছিলো—

"এটি ওসমানের ওসিয়ত নামা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

ওসমান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ কিয়ামতের

১. ওশর (عشر)–একবচন, বহুবচনে ওশূর (عشور)–অর্থ মুসলিম ব্যবসায়ী থেকে ধার্যকৃত কর (Tax)। ইসলামী আইন বিশারদগণ (ফকীহগণ) ওশর বলতে যা বুঝিয়ে থাকেন তা থেকে এটি স্বতন্ত্র। ফকীহগণ ওশর বলতে যা বুঝিয়ে থাকেন তা হচ্ছে–কৃষি জমিতে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত স্বরূপ বাইতুলমালে প্রদান করা। অবশ্য সেই ওশর (عشر)-এর বহুবচন আশার (اعشار)।–অনুবাদক।

www.amarboi.org

দিন সকলকে একত্রিত করবেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ কখনো তার ওয়াদা খেলাফ করেন না। এ বিশ্বাসের ওপরই ওসমান বেঁচে আছে এবং এ বিশ্বাস নিয়েই সে দুনিয়া ছেড়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আর এ বিশ্বাসের ওপরই তাকে কিয়ামতের দিন ওঠানো হবে।"[৩৮]

ওয়াসী (وصي)—ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি

১. সংজ্ঞা

ঐ ব্যক্তিকে ওয়াসী বলা হয়ে থাকে যাকে কারো পক্ষ থেকে সংরক্ষণ কিংবা খরচের জন্য নিয়োগ করা হয়।

২. অপরিচিত ব্যক্তিকে ওয়াসী নিযুক্ত করা

মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনের মধ্য থেকে তার সন্তান ও সম্পদ হিফাযতের জন্য ওয়াসী নিয়োগ করা জায়েয। অপরিচিত কাউকে ওয়াসী নিযুক্ত করাও বৈধ। হযরত যুবাইর (রা)-কে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবী ওয়াসী নিযুক্ত করেছিলেন। তারা হলেন—হযরত ওসমান (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), হযরত মিকদার ইবনুল আসওয়াদ (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা), হযরত মুতী' ইবনুল আসওয়াদ (রা) এবং অন্য একজন সাহাবী।[৩৯]

৩. ওয়াসী কর্তৃক মৃত ব্যক্তির দেয়া ঋণ উসূল করা

ওয়াসীর দায়িত্ব হচ্ছে—মৃত ব্যক্তির দেয়া ঋণ ঋণগ্রহীতার কাছে চাবেন এবং তা উসুল করে আয়ত্বে নেবেন তারপর অধিকারীদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেবেন। হযরত যুবাইর (রা) হযরত ইবনু মাসউদ (রা)-এর ওয়াসী ছিলেন। তিনি হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন, ইবনু মাসউদ (রা)-এর ভাতা আমাকে প্রদান করুন, কারণ তাঁর পরিবারের সদস্যগণ বাইতুলমাল থেকে পাওয়ার অধিক হকদার। তখন হযরত ওসমান (রা) তাকে পনেরো হাজার দিরহাম দিয়ে দিলেন।[৪০]

www.amarboi.org

'ও' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৬৫।
২. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৬৮।
৩. আল মুহাল্লী–৭ম খণ্ড, পৃ–৪২ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ–২২৫।
৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৭৪।
৫. মুয়াত্তা–ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ–৩৪৭।
৬. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪৭০ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–৭।
৭. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১০।
৮. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–৩১।
৯. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ; সুনানু আবী দাউদ ; সুনানু নাসাঈ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ–৪০ ; তাফসীর ইবনু কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ–২৪ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ–২০, ৪০ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪৩৭ ; শরহে মা'আনিল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ–২১।
১০. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–৪ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ–৪১; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪৩৭ ; আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ–৩৪।
১১. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪৩৭।
১২. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ–১২৫।
১৩. ঐ
১৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–৩-৪।
১৫. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ–৪৮২।
১৬. আল মাজমূ', ১ম খণ্ড, পৃ–৪৮২।
১৭. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৫ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ–১৫৮।
১৮. সহীহ্ মুসলিম ; জামি আত তিরমিযি ; সুনানু আবী দাউদ।
১৯. সহীহ আল বুখারী ; সহীহ মুসলিম ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–১৫ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ–৫২।
২০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ–১৬৬ ; মারিফাতুল সুনান ওয়াল আসার–ইমাম বাইহাকী, ১ম খণ্ড, পৃ–৩৯৬ ; আল ই'তিবার ফিন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, পৃ–৪৯ ; আল মাজমূ', ২য় খণ্ড, পৃ–৬১ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ–১৯১।
২১. আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ–২২ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–৮।
২২. তাবাকাতে ইবনু সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ–৫৮।
২৩. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ–৪৯।
২৪. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ–২৫ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ–১৪২ ; আল মাজমূ', ১ম খণ্ড, পৃ–৪৯৮ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড পৃ–৪৭০।
২৫. আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ–৭৯ ; ৫ম খণ্ড, পৃ–৫৪৫, ৫৫০ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ–১৬১।
২৬. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ–১৮০ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ–৬৩৪।
২৭. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ–৮২।
২৮. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৩৫৭।
২৯. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ–১৮৮ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৩৫৯।
৩০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪১ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৩৬০ ; আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ–৭৮২ ; সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩০৬-৩০৭ ; কানযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৩৫ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ–১৮৮।
৩১. সুনানু দারিমী, ২য় খণ্ড, পৃ–৪০১।

www.amarboi.org

৩২. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ–১৯০।
৩৩. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩০৩ ; কানযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৩৫।
৩৪. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৩৭৬-৩৭৭।
৩৫. আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ–৭৮৪ ; সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩০৩।
৩৬. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ–১৯০।
৩৭. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৫৮৪।
৩৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ–১৮৪।
৩৯. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–১৪৪।
৪০. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ–২৬০ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ–৩০০।

www.amarboi.org

ক্ব

ক্বাওয়াদ (قود)—প্রতিশোধ গ্রহণ/কিসাস

কিসাসকেই কাওয়াদ বলা হয়।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

ক্বাত্ল (قتل)—হত্যা/মৃত্যুদণ্ড

রূহ বের করে দেয়াকে কতল বলে।
–হত্যাকারীর তাওবা।–('তাওবা' শিরেনাম দ্রষ্টব্য)
–মুরতাদকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া।–('রিদ্দাহ' শিরোনাম দেখুন)
–বিবাহিত ব্যভিচারীকে শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া।–('যিনা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)
–কাউকে তাযীরের মাধ্যমে হত্যা করা।–('তা'যীর' শিরোনাম দেখুন)
–কিসাসের বিনিময়ে হত্যা।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)
–হত্যা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)
–হত্যার শপথ এবং তার শাস্তি।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)
–আক্রমণকারী কোনো ব্যক্তি বা পশুকে হত্যা করা।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)
–বন্দীকে হত্যা।–('আসরুন' শিরোনাম দেখুন)
–লিওয়াতাতকারী (সমকামী)-কে হত্যা।–('লিওয়াতাত' শিরোনাম দেখুন)

কাফন (كفن)— যে পোশাকে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয়

মৃতকে দাফন কাফন করা।–('মাওত' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

কাফ্ফারাহ্ (كفارة)—কাফ্ফারা

১. সংজ্ঞা

গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর তা দূর করার জন্য একজন মুসলমানের সেই পদক্ষেপকে কাফফারা বলে, যা শরীআহ নির্দেশ করেছে।

২. যে সমস্ত গুনাহর কারণে কাফ্ফারা অপরিহার্য হয় সেগুলো নিম্নরূপ। যখন কোনো মুসলমান নিম্নোক্ত অপরাধসমূহের কোনো একটিতে জড়িয়ে যাবে তখন তার ওপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

[২.১] ভুলক্রমে হত্যা ঃ ভুলক্রমে হত্যার কাফ্ফারা একজন দাস মুক্ত করা। সক্ষম না হলে একাধারে দু মাস রোযা রাখা। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসায় এ সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'জিনাইয়া' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

[২.২] শপথ ভঙ্গ করা ঃ শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা হচ্ছে একজন গোলাম আযাদ করা কিংবা দশজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা পোশাক প্রদান করা। তা সম্ভব না হলে তিন দিন রোযা রাখা।–('ইয়ামীন' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

[২.৩] এমন মানত যা পুরা করা সামর্থের বাইরে ঃ পুরা করা সামর্থের বাইরে এমন মানত কিংবা গুনাহর কাজের জন্য মানত করলে, তার কাফ্‌ফারা প্রকারান্তরে শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারার মতই। এ সম্পর্কে আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর (পৃথক) কোনো বক্তব্য পাইনি।

[২.৪] জিহার ঃ জিহারের কাফ্‌ফারা হচ্ছে একটি গোলাম আযাদ করা। অপারগতায় একাধারে দু মাস রোযা রাখা। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে ৬০জন দরিদ্রকে খাওয়ানো। সূরা আল মুজাদালায় এর কাফ্‌ফারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।–('জিহার' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

[২.৫] হাজ্জের মধ্যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গেলে ঃ এর কাফ্‌ফারা সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন–'ইহরাম' শিরোনাম।

[২.৬] বিনা ওযরে রমযানে রোযা না রাখার কাফ্‌ফারা সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর (পৃথক) কোনো বক্তব্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

কাফায়াত (كفاءة)–সমতা

বিয়েতে বর কনের সমতা।–('নিকাহ' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

কাফির (كافر)–অমুসলিম

বিস্তারিত জানার জন্য 'কুফর' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

ক্বাবযুন (قبض)–হস্তগত হওয়া

–বস্তু হস্তগত হওয়ার পূর্বেই তা বিক্রি করে দেয়া।–('বায়' শিরোনাম দেখুন)

–দান সাদকা এবং নেকী ও ইহ্‌সানের জন্য কাউকে কিছু দিতে চাইলে সেই জিনিস নিজের মুঠোয় থাকতে হবে।–('হিবা' সাদকাহ এবং 'তাবাররু' শিরোনাম দেখুন)

কাবরুন (قبر)–কবর

১. সংজ্ঞা

লাশ দাফন করার জায়গাকে কবর বলে।

২. কবরকে মাটি সমতল করে দেয়া

কবরের সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে তা মাটি সমতল করে দিতে হবে। হযরত ওসমান (রা)-ও এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। তবে মাটির লেবেল থেকে সামান্য উঁচু রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। একদিন হযরত ওসমান (রা) সাথীদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে উম্মে আমর বিনতু ওসমান (রা)-এর কবর দেখতে পেলেন। তিনি সেই কবরকে মাটি সমান করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[১]

৩. কবর যিয়ারত

হযরত ওসমান (রা) পুরুষদেরকে কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ সেখানে শিক্ষাগ্রহণ করার মত অনেক কিছুই আছে। তিনি নিজেও যখন কোনো কবরের নিকট

www.amarboi.org

দাঁড়াতেন চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। তাকে বলা হলো—জান্নাত জাহান্নামের কথা শোনে তো আপনি কাঁদেন না, কবর দেখলেই আপনি কাঁদেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি—'কবর আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি।' যে সহীহ্ সালামতে এ ঘাঁটি পার হয়ে যাবে অন্যান্য ঘাঁটিগুলো পার হওয়া তার জন্য আরো সহজ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ প্রথম ঘাঁটিতেই আটকে যায় তাহলে পরবর্তী ঘাঁটিগুলো তার জন্য আরো কঠিন হয়ে যাবে।'[২]

৪. কবরের দিকে মুখ করে নামায

ইবনু হাযম (রহ) বলেছেন—'কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া জায়েয নয়'—এ মাসয়ালার ব্যাপারে কোনো সাহাবী দ্বিমত করেননি।[৩] ইবনু হাযমের বক্তব্য 'জায়েয নয়' বলতে মাকরূহ বুঝানো হয়েছে।

কা'বা (كعبة)—বাইতুল্লাহ

–নামাযে কিবলামুখী হওয়া নামাযের অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্কে সকলেই একমত।

–হাজ্জে কা'বা বা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা।–('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

–ওমরার সময় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা।–('ওমরা' শিরোনাম দেখুন)

–বাইতুল্লাহর ঐ রুকন যা সম্মান প্রদর্শন করা হয়।–('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

–কাবা শরীফে গিলাফ লাগানো শরীআহ্ সম্মত কাজ। হযরত ওসমান (রা) কাতান এবং ইয়েমেনী চাদর দিয়ে গিলাফ তৈরী করে কা'বা শরীফে লাগিয়ে ছিলেন।[৪]

–কাউকে কা'বা শরীফের কাছে নিয়ে শপথ করানো। যেন শপথ কঠিন হয়।
–('কাযা' এবং 'রিযা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

ক্বায্‌ফ (قذف)—অপবাদ দেয়া/গালি দেয়া

১. সংজ্ঞা

প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়াকে কায্‌ফ বলা হয়।

২. কাযফের ভাষা

[২.১] কাউকে বলা—'তুমি ব্যভিচারী' কিংবা বলা হলো—'ঐ হারামজাদা' অথবা বলা হলো—'তোর বাপের নাম নেই' (অর্থাৎ 'তোর মায়ের ব্যভিচারের ফসল তুই' একথাটিই যেন পরোক্ষভাবে বলা হলো।) এ বাক্যগুলো 'কায্‌ফ' হিসেবে গণ্য হবে। যা থেকে বক্তা একটি বিশেষ অর্থ বুঝাতে চায় এবং শ্রোতা তা বুঝতে পারে কিন্তু বক্তা তাৎপর্য স্পষ্ট করে কথাগুলো বলে না। (একে ইসলামী আইনের পরিভাষায় তারীয বলে।–অনুবাদক।) তারীযের মাধ্যমে যিনার অপবাদ আরোপ করলে হযরত ওসমান (রা) 'কায্‌ফ-এর শাস্তি (হাদ) প্রদান করতেন। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বললো—হে অপবিত্র বস্তুর স্বাদ গ্রহণকারীর ছেলে! একথা বলে সে তার মায়ের চরিত্র হননের চেষ্টা করছিলো। অন্য ব্যক্তি তখন হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে গিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো। শুনানি চলাকালে বিবাদী বললো—আমি সেইকথা দিয়ে এরূপ বুঝাতে চাইনি। তবু হযরত ওসমান (রা) তার বিরুদ্ধে কাযফের শাস্তির রায় ঘোষণা করলেন। তার পরবর্তী ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেন না।[৫]

www.amarboi.org

[২.২] যিনার সাক্ষ্যে যদি সাক্ষীর সংখ্যা চারজন পুরা না হয় তাহলে সেই সাক্ষীদেরকে কাযিব (অপবাদ রটনাকারী) সাব্যস্ত করা হবে। হযরত মুগীরা ইবনু শোবা (রা)-এর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হলো। চারজন সাক্ষ্য ঠিক হলো। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর আদালতে গিয়ে যিয়াদ ইবনু উবাইয়াহ সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত ওমর (রা) অবশিষ্ট তিনজনকে কাযফের অপরাধে চাবুক মারলেন। কারণ সাক্ষ্যের জন্য পূর্ণ নিসাব (অর্থাৎ চারজনের সাক্ষ্য) ছিলো না। সাহাবা কিরামের সামনেই এ মামলার রায় দেয়া হয়েছিলো কিন্তু কেউ এর বিরোধিতা করেননি অর্থাৎ সকলেই এ রায়কে মেনে নিয়েছিলেন।[৬]

[২.৩] ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তির জন্য কাযফের হাদ (শাস্তি) জারী করা যাবে না। এজন্য ব্যঙ্গ কবিতা আবৃত্তিকারীকে 'তা'যীর এর শাস্তি প্রদান করতে হবে।-('হিজা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

৩. কাযিফ (অপবাদ আরোপকারী)

অপবাদ আরোপকারীকে কাযফের শাস্তি প্রদানের জন্য শর্ত হচ্ছে—মাকযূফকে (যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে তাকে) মুহসিন (محصن)—হতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ

"আর যারা মুহসিনাত মহিলার ওপর অপবাদ দেবে।"-(সূরা আন নূর ঃ ৪)

এ আয়াতে ইহসান (احصان)—শব্দ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যিনি বালেগ, বুদ্ধিমান, মুক্ত-স্বাধীন, মুসলমান এবং ব্যভিচার থেকে পবিত্র। এ বাধ্যবাধকতার কোনো ব্যতিক্রম নেই। শুধু একটি অবস্থা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে অমুসলিম মায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে ব্যভিচারী মহিলার সন্তান বলে তাহলে সেই ব্যক্তিকে মুসলমানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কারণে কাযফের শাস্তি প্রদান করতে হবে। আবদুর রাজ্জাক তার নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন—যদি কেউ কারো মাকে ব্যভিচারী বলতো হযরত আবু বকর (রা) এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ কাযফের হাদ স্বরূপ তাকে চাবুক মারতেন। চাই তার মা ইহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান। এ শাস্তি দেয়া হতো মুসলিমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কারণে।[৭]

৪. কায্‌ফের শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরে কাযফের শাস্তি সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥(النور : ٤)

"যারা সতী মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে ৮০ ঘা বেত লাগিয়ে দাও। আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। এরা ফাসিক।"-(সূরা আন নূর ঃ ৪)

যাবতীয় হাদ গোলামের বেলায় অর্ধেক প্রয়োগ করা হয় (হাদ শিরোনাম দ্রষ্টব্য)। তাই গোলামকে কাযফের অপরাধে ৪০ ঘা বেতের বেশী মারা যাবে না। হযরত ওসমান (রা) ঐসব গোলামকে ৪০ ঘা চাবুক মেরেছেন যারা স্বাধীন সতী মহিলার ওপর যিনার অপবাদ দিয়েছিলো।[৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রবিয়াহ বলেছেন—আবু বকর সিদ্দীক (রা), ওমর

www.amarboi.org

ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং ওসমান ইবনু আফফান (রা) কাযফের শাস্তি স্বরূপ গোলামকে ৪০ ঘা চাবুক লাগতেন। পরে আমি লোকদেরকে তা বাড়াতে দেখেছি।[৯] আমার (গ্রন্থকার) মতে হযরত ওমর (রহ) ইবনু আবদুল আযীয মুয়াত্তার বর্ণনা অনুযায়ী গোলামকে কাযফের শাস্তি স্বরূপ ৮০ ঘা বেত লাগাতেন।

খুলাফা-ই-রাশিদীন দাস-দাসীকে ৪০টি এবং স্বাধীন লোকদেরকে ৮০টি করে চাবুক লাগাতেন। তাঁরা সূরা আন নিসার নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে এরূপ করতেন। ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط

"যদি কোনো বাঁদী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে স্বাধীন মহিলা সেজন্য যে শাস্তি প্রাপ্য তার অর্ধেক শাস্তি তাকে প্রদান করতে হবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

সম্ভবত ওমর ইবনু আবদুল আযীয কাযফের শাস্তি (হাদ) স্বরূপ গোলামকে চল্লিশটি চাবুক মেরেছেন এবং অন্য কোনো কারণে তাযীর হিসেবে আরো ৪০ ঘা মেরেছেন। যিনি দেখেছেন তিনি মনে করেছেন কাযফের হাদ হিসেবেই ৮০ ঘা মেরেছেন। (প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন)।

কাযা (قضاء)–বিচার ফায়সালা করা

১. সংজ্ঞা

মোকদ্দমার ফায়সালা করাকে কাযা বলা হয়।

২. মোকদ্দমার স্থান

মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা বিচারকের কর্তব্য যেখানে দুটো বিষয় প্রাধান্য পায়।

[২.১] সেই স্থান বা বিচারালয় শহরের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে। যেন লোকজন সহজেই সেখানে পৌঁছুতে পারে।

[২.২] সেই জায়গার পরিবেশ এমন জাঁকজমক হওয়া উচিত, যেন সেখানে প্রবেশ করে কারো মিথ্যে বলার সাহস-ই না হয়।

এ দুটো শর্ত সাধারণত শহরের মসজিদে পাওয়া যায়। যেখানে শহরের সাধারণ লোকজনও যাতায়াত করে। আর আল্লাহর ঘর হওয়ার কারণে মানুষ সেখানে ভীতু-সন্ত্রস্ত থাকে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) মসজিদে বসেই মামলা মোকদ্দমার শুনানি গ্রহণ করতেন এবং তার রায় দিতেন।[১০]

৩. বিচার কাজে পরামর্শ গ্রহণ

বিচারকের উচিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি জুরি (Jury) বোর্ড গঠন করা। যারা মোকদ্দমার জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ে বিচারককে সঠিক পরামর্শ প্রদান করবেন। এ ব্যাপারটিকে হযরত ওসমান (রা) অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। ইমাম বাইহাকী সুনানু বাইহাকীতে বর্ণনা করেছেন—যখন হযরত ওসমান (রা) আদালতে তাঁর আসন গ্রহণ করতেন এবং বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ উপস্থিত হতো, তখন এক পক্ষকে পাঠাতেন হযরত আলী (রা)-কে ডেকে আনার

www.amarboi.org

জন্য। আর অপর পক্ষকে পাঠাতেন, তালহা (রা), জুবাইর (রা) সহ বিশিষ্ট সাহাবাদেরকে আদালতে নিয়ে আসার জন্য। যখন সবাই চলে আসতেন তখন মামলার শুনানি গ্রহণ শুরু করতেন। শুনানি শেষ হওয়ার পর তিনি তাদের দিকে ফিরে রায় চাইতেন। যদি তাদের রায় হযরত ওসমান (রা)-এর রায় এর অনুকূলে হতো তাহলে তিনি সাথে সাথে রায় ঘোষণা করে দিতেন।

যদি জুরি বোর্ডের পরামর্শের সাথে তিনি একমত হতে না পারতেন তাহলে তিনি ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। তার রায় যদি উভয় পক্ষ (বাদী-বিবাদী) মেনে নিয়ে চলে যেতেন তখন তিনি নিশ্চিত হতেন।[১১]

৪. ঐসব প্রমাণাদি যার ওপর ভিত্তি করে একজন বিচারক স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেন, তা নিম্নরূপ-

[৪.১] **স্বীকারোক্তি ঃ** যার ওপর হক সে যদি নিজেই তা স্বীকার করে তাহলে বিচারক তার ভিত্তিতেই রায় দিতে পারেন। আর যদি সেই হকের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হয়, যেমন—হাদ্, তাহলে বিচারকের দায়িত্ব, যে স্বীকারোক্তিমূলক জনাববন্দী দেবে, তাকে তা প্রত্যাহার করার জন্য ইঙ্গিত দেয়া। যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।-('হাদ' শিরোনাম দেখুন)

[৪.২] **সাক্ষ্য ঃ** এ সম্পর্কে বিস্তারিত জনার জন্য 'শাহাদাত' শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

[৪.৩] **সাক্ষ্য এবং বাদীর শপথ ঃ** সুনানু বাইহাকীতে আছে—হযরত ওসমান (রা) একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বাদী থেকে শপথ নিয়েও মামলার রায় দিতেন।[১২]

আবদুল্লাহ ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-কে একজনের সাক্ষ্য এবং বাদীর শপথের ওপর ভিত্তি করে মামলার রায় দিতে দেখেছি।[১৩]

আল্লাহর হকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাদীকে সাক্ষ্য মানা হতো। এজন্য হযরত ওসমান (রা) সেই মহিলা থেকে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে (যারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী ছিলো) দুধ পান করিয়েছে বলে দাবী করেছিলো। সাঈদ ইবনু মানসুর তার সুনানে বর্ণনা করেছেন—ঐ মহিলা শপথ করে বলেছিলো—আমি একজন পুরুষ এবং তার স্ত্রীকে দুধ পান করিয়েছি। একথা শোনে হযরত ওসমান (রা) বললেন—কা'বা ঘরের সামনে গিয়ে শপথ করো। যখন তাকে এ ব্যাপারে চাপ দেয়া হলো তখন সে সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত রইলো।[১৪]

শপথ

ক. বিচারক তখনই শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন যখন বাদী তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থিত করতে ব্যর্থ হবেন।

খ. বিচারক যদি প্রয়োজন অনুভব করেন তাহলে হলফ নেয়ার সময় কাঠিন্য করতে পারেন। যেমন করাতে চেয়েছিলেন একজন পুরুষ ও মহিলাকে দুধ পান করানোর দাবীকারী সেই মহিলাকে শক্ত শপথ করাতে চেয়েছিলেন যে, সে কা'বা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে। অবশ্য বিচারক প্রয়োজন মনে না করলে এরূপ নাও করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) থেকে শুধু আল্লাহর

www.amarboi.org

নামে শপথ নিয়েছিলেন। শপথে কাঠিন্য আরোপ করেননি।[১৫] এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে।

গ. বিচারক এমন বাক্যের মাধ্যমে শপথ নেবেন, যা দাবীকৃত বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য থাকে। যদি দাবী বিক্রীত কোনো জিনিসের দোষ সংক্রান্ত হয় তাহলে বাদীকে এ মর্মে বিচারক শপথ করাবেন যে—আল্লাহর কসম ! কেনার সময় এর ত্রুটি সম্পর্কে আমার জানা ছিলো না। মুসান্নাফ—আবদুর রাজ্জাকে আছে–হযরত ওসমান (রা) যখন কারো থেকে এ ব্যাপারে শপথ নিতেন তখন জানা শব্দটি অবশ্যই শপথের অন্তর্ভুক্ত করতেন।[১৬]

অর্থাৎ তিনি যখন বিক্রীত পণ্যের ত্রুটি সম্পর্কে শপথ নিতেন তখন জানা ছিলো না শব্দ দুটো অবশ্যই সেই শপথের অন্তর্ভুক্ত করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে তার এক গোলাম বিক্রি করেন। বিক্রির সময় বলে দেন গোলামের কোনো দোষ-ত্রুটি নেই। কিন্তু ক্রেতা গোলামের মধ্যে কিছু ত্রুটি পেয়ে সোজা ওসমান (রা)-এর আদালতে মামলা ঠুকে দেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-কে (আদালতে উপস্থিত হওয়ার পর) বলেন—তুমি আল্লাহর কসম করে বলো, আমি যখন গোলাম বিক্রি করি তখন তার কোনো অসুখ সম্পর্কে আমার জানা ছিলো না, ইবনু ওমর (রা) শপথ করতে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত ওসমান (রা) তাকে গোলাম ফেরত নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

[৪.৪] শপথ থেকে বিরত থাকা ঃ যদি বিবাদীকে শপথ করানো বাধ্যতামূলক হয়ে যায় কিন্তু সে শপথ করতে রাজী না হয় তাহলে বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিয়ে দেবেন। সেজন্য বাদীকে শপথ করানো যাবে না। ওপরে বর্ণিত ঘটনার আমরা দেখেছি আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) শপথ করা থেকে বিরত থাকায় হযরত ওসমান (রা) তার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন কিন্তু সে জন্য বাদীকে শপথ করাননি।–(আরো জানতে হলে দেখুন 'বায়' শিরোনাম)

শপথ করতে অস্বীকার করার দুটো কারণ হতে পারে। এক শপথের কারণে কোনো মুসিবতে পড়ার ভয়। দুই. ঘটনা অসত্য হওয়ার কারণে শপথ করতে অস্বীকার করা। এজন্য বিচারক প্রকাশ্য দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করবেন। হযরত ওসমান (রা) ও হযরত মিকদাদ (রা) (বানী আল আসওয়াদ গোত্র)-এর ঋণ সংক্রান্ত একটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। তাঁরা উভয়েই হযরত ওমর (রা)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করলেন। হযরত ওমর (রা) মিকদাদ (রা)-কে শপথ করতে বললেন, তিনি শপথ করতে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত ওমর (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে শপথ করতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, মিকদাদ আপনার সাথে ইনসাফ করেছেন। হযরত ওসমান (রা)-ও শপথ থেকে বাঁচার জন্য শপথ করতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন—আমার ভয় হয়, তাকদীরে লেখা কোনো মুসিবতে পড়ে যাবো আর লোকেরা বলবে শপথ করার কারণে মুসিবতে পড়েছে।[১৮]

[৪.৫] শক্তিশালী উপকরণ বা আলামত ঃ মদ পান প্রমাণের জন্য শক্তিশালী আলামত হচ্ছে—অপরাধীর মদ বমি করা। সে জন্য হযরত ওসমান (রা) মদ বমি করার কারণে হাদ জারীর নির্দেশ দিয়েছিলেন।–('আশরাবহ,' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

কিন্তু অপরাধের আলামত পাওয়া গেল, তবে অপরাধীকে অপরাধ সংঘটিত করতে দেখা যায়নি এমতাবস্থায় এ আলামত শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ এখানে এ সন্দেহ থেকে যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এরূপ করতে পারে। হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে একদল লোক সম্পর্কে তাকে বলা হলো তারা অমুক নোংরা কাজে লিপ্ত রয়েছে। গিয়ে নিজে দেখে আসুন। হযরত ওসমান (রা) সেখানে গেলেন কিন্তু অপরাধীদের পেলেন না। শুকরিয়া আদায় করলেন এবং একটি গোলাম আযাদ করে দিলেন।[১৯]

৫. অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার বিপক্ষে রায় দেয়া

যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির না হয়ে গা ঢাকা দেয় কিংবা পালিয়ে অন্য দেশে চলে যায়, যেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় প্রয়োজন অথবা নিখোঁজ হয়ে যায় জীবিত না মৃত তা নিশ্চিত করে বলা না যায়। অপরদিকে বাদী পক্ষ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুত উপস্থিত করে নিজের দাবীর পক্ষে সত্যতা প্রমাণ করে ফেলে। তাহলে বিবাদীর অনুপস্থিতিতে তার বিপক্ষে রায় দেয়া বিচারকের জন্য জায়েয এবং সেই রায় তিনি কার্যকরও করতে পারেন।[২০] যেন মানুষের অধিকার নষ্ট না হয়।

৬. বিচারক নিয়োগ

বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্র প্রধান বা খলীফার। ইবনু হিব্বান তারীখুল কাযা নামক গ্রন্থে লিখেছেন—তিনি জানতে পারেননি, হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনায় কোনো বিচারক নিয়োগ করেছিলেন কিনা।[২১] মদীনা শরীফের যাবতীয় মোকদ্দমার ফায়সালা তিনি নিজেই করতেন। অবশ্য অন্যান্য প্রদেশের জন্য তিনি বিচারক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)-কেও বিচারক পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।[২২]

কারয (قرض)—ঋণ/কর্জ দেয়া

১. সংজ্ঞা

কাউকে নগদ টাকা কিংবা এমন বস্তু প্রদান করা, যার সদৃশ বস্তু হয়, যেন ভবিষ্যতে সে তাকে অনুরূপ জিনিসই ফেরত দিতে পারে, একে কারয বলে।

২. কারয এর জন্য লিখিত স্বীকারোক্তি

যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে কোনো জিনিস কিংবা নগদ টাকা অথবা ঐ জাতীয় কোনো কিছু কারয দেবেন, তখন স্বীকারোক্তি লিখিত করে নেয়া তার জন্য মুস্তাহাব। যেন এর মাধ্যমে তার হক নষ্ট না হয়ে বরং সংরক্ষিত হওয়ার গ্যারান্টি অর্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কোনো ঝগড়া যেন মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠতে পারে, তার শেকড় কেটে দেয়া। এ কর্মপদ্ধতি মূলত সূরা আল বাকারার ২৮২নং আয়াতে আল্লাহর নির্দেশেরই বাস্তবায়ন মাত্র।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ط ـ(البقرة : ٢٨٢)

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা পরস্পর ধারে লেনদেন করবে তখন তা লিখে রাখবে।"
—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২)

www.amarboi.org

৩. কার্‌য আদায়

[৩.১] যদি কোনো ব্যক্তি কার্‌য গ্রহণ করলো, কারয গ্রহণের সময় অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত না করে তাহলে কার্‌য পরিশোধের সময় ভালো জিনিস কিংবা অতিরিক্ত প্রদান করা উত্তম।[২৩] কিন্তু কার্‌য নেয়ার সময় যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্তারোপ করা হয় তাহলে তা সুদ বলে গণ্য হবে।–('রিবা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

[৩.২] যখন কোনো ব্যক্তি কাউকে কার্‌য দেয় এবং পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে দেয়, ঋণ গ্রহণকারীর জন্য সেই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগে কার্‌য পরিশোধ করা জায়েয আছে। হযরত ওসমান (রা) এক মামলায় রায় দিয়েছিলেন—যদি কোনো মুকাতাব দাস নির্ধারিত টাকা সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগেই পরিশোধ করে দেয়, তা জায়েয আছে। এক মুকাতাবের মনিব নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে টাকা নিতে অস্বীকার করেন। হযরত ওসমান (রা) সেই টাকা বাইতুল মালে জমা করে রাখলেন এবং মুকাতাবকে দাসত্বমুক্ত ঘোষণা করলেন। তারপর মনিবকে নির্দেশ দিলেন—বাইতুল মাল থেকে চুক্তিকৃত টাকা কিস্তি করে তুলে নেয়ার জন্য।
–('রিককুন' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

[৩.৩] কার্‌য দাতার কার্‌য আদায়ের ব্যাপারে কার্‌য গ্রহণকারীর সাথে কোমল আচরণ করা উচিত। কঠোর আচরণ করা উচিত নয়। তিরস্কার ও গালি গালাজ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। কারয গ্রহণকারীর উচিত, যখন সে তা পরিশোধ করবে তখন উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করবে। অপারগতায় ভদ্রভাবে এবং মিষ্টি ভাষায় ওজর সম্পর্কে কারযদাতাকে অবহিত করবে। হযরত ওসমান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন —'আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে জিনিসপত্র কেনার সময়, বেচার সময়, হক আদায় করার সময় এবং অধিকার বুঝে নেয়ার সময় কোমল আচরণ করে।[২৪]

[৩.৪] যদি কার্‌য গ্রহণকারী নিঃস্ব বা দেওলিয়া হয়ে যায়, কার্‌য পরিশোধ করার মত কোনো অবস্থা না থাকে।–(বিস্তারিত দেখুন 'ফাল্‌স' শিরোনাম)

[৩.৫] যদি কার্‌য গ্রহীতা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, কার্‌য দাতা কার্‌য গ্রহীতা মারা গেছে বলে দাবী করে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে পাওনা আদায় করতে চায়। তার এ দাবীর পক্ষে (তাকে আদালতে) প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে। অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া তার দাবী (আদালতে) গ্রহণযোগ্য হবে না। ইবনু হাযাম বলেছেন—হযরত ওসমান (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি কর্‌য গ্রহীতা মারা গেছে এবং তার কাছে আমার পাওনা আছে। কার্‌যদাতার এ ধরনের দাবীর পক্ষে প্রমাণ তলব করেছিলেন।[২৫]

[৩.৬] কারযের যিম্মাদারী অন্য কারো ওপর অর্পণ করা।–(বিস্তারিত 'হাওয়ালাহ' শিরোনাম দেখুন)

৪. কার্‌যের যাকাত

যখন জমাকৃত সম্পদের বছর পূর্তি হয় এবং সম্পদের মালিকের জিম্মায় কার্‌য থাকে তখন সেই সম্পদ থেকে ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত প্রদান করবেন। আবার যদি কোনো সচ্ছল ব্যক্তিকে কার্‌য প্রদান করা হয় এবং এ বিশ্বাস থাকে যে, চাহিবা মাত্র সে

www.amarboi.org

কার্‌য পরিশোধ করে দেবে এমতাবস্থায় কার্‌য প্রদানকারী যে পরিমাণ কার্‌য দিয়েছেন তা নিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে সেগুলোর যাকাত প্রদান করবেন।–(বিস্তারিত দেখুন 'যাকাত' শিরোনাম)

ক্বারাবাহ্ (قرابة)–আত্মীয়তা

–আত্মীয়তার কারণে একে অপরের ওয়ারিস হওয়া।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

–নির্দিষ্ট কতিপয় আত্মীয়ের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–গানিমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় স্বজনের অংশসমূহ।–('গানিমাত' শিরোনাম দেখুন)

ক্বারিনাহ্ (قرينة)–অনুসঙ্গ

'ক্বারিনাহ' ঐ অবস্থাকে বলা হয় যা কোনো বিশেষ কথার সাথে সম্পৃক্ততা প্রকাশ করে কিন্তু তা পরোক্ষভাবে।

–অনুষঙ্গের ভিত্তিতে মোকদ্দমার ফায়সালা করা।–('আশরাবাহ' এবং 'হাদ' শিরোনাম দেখুন)

কালবুন (كلب)–কুকুর

কুকুর দু ধরনের হয়ে থাকে ঃ

এক. এমন কুকুর যা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তা দিয়ে ফায়দা ওঠানো হয়। যেমন—শিকারী কুকুর কিংবা পাহারাদার কুকুর। এ ধরনের কুকুর মুসলমানদের এমন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত যা ধরা বা ক্ষতি করা হারাম। এ ধরনের কুকুর পালা জায়েয। যদি কেউ সেটির ক্ষতি করে সেজন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ওকবা ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত—হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তি একটি শিকারী কুকুর মেরে ফেলে। কুকুরটি ছিলো বিরল প্রজাতির। তার মূল্য ধরা হয়েছিলো আটশ' দিরহাম। হযরত ওসমান (রা) কুকুরের হত্যাকারীকে সেই অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৬] অন্য এক মামলার রায়ে তিনি কুকুর হত্যার অপরাধে হত্যাকারীকে ২০টি উট জরিমানা করেছিলেন।[২৭]

দুই. উপরোক্ত কুকুর ছাড়া অন্য কোনো ধরনের কুকুর পালা জায়েয নেই। আর যদি কেউ এ ধরনের কুকুর মেরে ফেলে সেজন্য তাকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি হযরত ওসমান (রা)-কে খুতবা দিতে দেখেছি। তিনি খুতবায় কুকুর নিধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৮]

কালাম (كلام)–কথাবার্তা

'তাকাল্লুম' শিরোনাম দ্রষ্টব্য

কাসবুন (كسب)–উপার্জন

১. সংজ্ঞা

কোনো না কোনোভাবে সম্পদ অর্জন করাকে কাসবুন বলে।

www.amarboi.org

২. উপার্জনের পদ্ধতি

সম্পদ উপার্জনের দুটো পদ্ধতি আছে। একটি বৈধ, আরেকটি অবৈধ।

[২.১] **বৈধ পদ্ধতি ঃ** বৈধ অর্থাৎ শরী'আহ্ সম্মত পদ্ধতি বলতে এমন সকল পদ্ধতিকে বুঝায় যে সম্পর্কে শরঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। যেমন—ব্যবসা, ইজারা ইত্যাদি। এ পদ্ধতিও আবার দু প্রকার। এক প্রকার যা গ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য মুবাহ্। আরেক প্রকার যার মাধ্যমে জীবন ধারণ করা একজন মুসলমানের জন্য জরুরী। যখন বাঁচার জন্য তার সামনে বিকল্প পথ বর্তমান থাকে এবং যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের প্রয়োজন তাকে ঐ পথে চলতে বাধ্য না করে। তখন জীবন ধারণের জন্য উপার্জনের যে কোনো একটি পথ একজন মুসলমানের জন্য বেছে নেয়া মুস্তাহাব। আর অবশিষ্ট পদ্ধতিগুলো তার জন্য মুবাহ্ হয়ে যায়।

এমন অনেক পেশা আছে যা অবলম্বন না করা একজন মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব। কারণ তার মধ্যে কোনো না কোনোভাবে হারামের মিশ্রণের সম্ভাবনা আছে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকার স্পৃহাও তার মধ্যে কম। যেমন শিঙ্গা লাগানো, হাম্মাম বা গণসৌচাগারের ব্যবসা ইত্যাদি। শিঙ্গা লাগিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত চুষে বের করা হয়, রক্ত হারাম ও অপবিত্র। চুষে বের করার সময় তা পেটের ভেতরও চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এ পেশা অপবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট। তদ্রূপ হাম্মামখানায় লোকদেরকে গোসল করানোর সময় তাদের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। এরূপ আরো অনেক পেশা আছে, যা একজন মুসলমানের মর্যাদার পরিপন্থী। তাই এসব পেশা থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। হযরত ওসমান (রা)-এর এক আত্মীয় একবার তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি তার পেশা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আত্মীয় জানালেন–তিনি হাম্মাম (গোসলখানা) খানা পরিচালনা করেন এবং শিঙ্গা লাগিয়ে থাকেন। একথা শুনে হযরত ওসমান (রা) বললেন—'তোমার উপার্জন বড়ো খারাপ।' অথবা বললেন—'বড়ো নিকৃষ্ট।'[২৯]

[২.২] **অবৈধ বা শরীআহ্ সম্মত নয় এমন পদ্ধতি ঃ** এর মানে উপার্জনের সেইসব পদ্ধতি যা আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন, যেমন–সূদ ('রিবা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য) মজুদদারী ('ইহ্তিকার' শিরোনাম দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি।

আনুগত্য এবং নেক কাজের বিনিময়ে উপার্জন জায়েয। হযরত ওসমান (রা) মুয়ায্যিনকে (আযান দেয়ার জন্য) পারিশ্রমিক দিতেন।–('আযান' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

৩. অক্ষম ব্যক্তিকে উপার্জনের জন্য বাধ্য করা

হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—যে ব্যক্তি উপার্জনে অক্ষম তাকে উপার্জনের জন্য বাধ্য করা জায়েয নয়। যেমন—কাজে পারদর্শী নয় এমন বাঁদী অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু কিংবা এ ধরনের লোক। তাদেরকে উপার্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করলে অনেক সময় তারা হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—যে বাঁদী কাজের অযোগ্য বা যে কাজে অপটু তাকে উপার্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করো না। তাকে চাপ প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, সে তার লজ্জাস্থানকে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। শিশুকে উপার্জনের জন্য চাপ দিয়ো না, যখন সে কিছুই করতে পারবে না তখন হয়তো চুরি করতে বাধ্য হবে। তোমরা

www.amarboi.org

লোকদেরকে মাফ করে দাও, আল্লাহও তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন। তোমরা জীবিকার জন্য ঐ পথকে বেছে নাও যা তোমাদের পছন্দনীয় এবং বৈধ।[৩০]

ক্বাসামাহ্ (قسامة)—হত্যার দায় এড়ানোর শপথ

কোনো মহল্লায় বা কোনো গোত্রের আবাস এলাকায় লাশ পাওয়া গেলে এবং নিহত ব্যক্তির সাথে তাদের পূর্ব শত্রুতা থাকলে এবং তার হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে না পারলে এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ এটিকে হত্যাকাণ্ড বলে দাবী করলে আর ঐ মহল্লাবাসী হত্যার কথা অস্বীকার করলে এবং তাদের বিপক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকলে তাদের এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শপথ নেয়াকে 'ক্বাসামাহ্' বলে।

মুহাম্মদ ইবনু শিহাব যুহুরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমাকে সুলাইমান ইবনু হিশাম এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন, যাকে এক গোত্রের নিকট মৃত পাওয়া গিয়েছে। সেখানকার অধিবাসীদের বক্তব্য হচ্ছে—এ ব্যক্তি রাতের বেলা এখানে চুরি করতে এসেছিলো। কিন্তু নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ বলছেন, তাকে ডেকে এনে হত্যা করা হয়েছে। যুহুরী বলেন—আমি সুলাইমানকে লিখে পাঠালাম, নিহত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন এ মর্মে শপথ করবেন যে, 'যারা বলছে সে রাতের বেলা চুরি করতে এসেছিলো তারা মিথ্যেবাদী বরং তারা তাকে ডেকে এনে হত্যা করেছে।' যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ এ ধরনের শপথ করেন তাহলে কিসাস নেয়ার অধিকার তারা পাবেন। আর যদি শপথ করতে তারা অস্বীকার করেন তাহলে অপর পক্ষের পঞ্চাশজন থেকে শপথ নেয়া হবে। তারা পশথ করে বলবেন—নিহত ব্যক্তি এখানে চুরি করতে এসেছিলো। শপথের পর তারা দিয়াত প্রদান করবেন। যুহুরী আরো বলেন—হযরত ওসমান (রা), ইবনু বাকিরা তাগাল্লুবীর হত্যা কাণ্ডে এ ধরনের রায় দিয়েছিলেন। যখন সেই গোত্র শপথ করতে অস্বীকার করলো তখন তাদের ওপর দিয়াতের জরিমানা চাপিয়ে দিলেন।[৩১]–(আরো দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

কিতাবিউন, কিতাবী (كتابى)—আহলে কিতাব

১. সংজ্ঞা

কিতাবী তাদেরকে বলা হয় যারা এমন দীনের অনুসারী যার ভিত্তি কোনো না কোনো আসমানী কিতাবের উপর। ইহুদী, খৃষ্টান এবং তাদের বিভিন্ন ফির্কাসমূহকে আহলে কিতাব (বা কিতাবী) বলা হয়।

২. আহলে কিতাব সম্পর্কিত বিধান

[২.১] আহলে কিতাবদের যবেহ করা (হালাল) প্রাণী খাওয়া হালাল। এ সম্পর্কে সকল ইমাম একমত। কারণ–সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ـ(ال عمران : ٩٣)

"যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পাকানো খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৩)

[২.২] আহলে কিতাব মহিলাদেরকে বিয়ে করা জায়েয ঃ হযরত ওসমান (রা) নিজেই আহলে কিতাব এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তার নাম ছিলো নায়িলা বিনতু ফুরাফ্‌সা।

তিনি ছিলেন বানু কাল্‌ব গোত্রের খৃষ্টান মহিলা। অবশ্য পরে তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৩২] তাঁর গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো, নাম মারইয়াম।[৩৩]

আহলে কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট হযরত ওসমান (রা)-এর ঘটনা আমরা যতটুকু পেয়েছি বর্ণনা করলাম। অবশ্য 'কুফর' শিরোনামে আরো কিছু মাসয়ালা আলোচনা করা হয়েছে যা আহলে কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট।

কিয়াম (قيام)—দাঁড়ানো

—নামাযে কিয়াম করা।—('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

—দাঁড়িয়ে খুতবা (বক্তৃতা) দেয়া।—('খুতবা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

ক্বিরান (قران)—একই ইহরামে হাজ্জ ও ওমরা পালন করা

একবার ইহরাম বেঁধে হাজ্জ ও ওমরা এক সাথে পালন করাকে ক্বিরান বলে।

—(বিস্তারিত জানার জন্য 'হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

ক্বিরায (قراض)—অন্যের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করা

বিস্তারিত জানার জন্য 'শিরকাহ' শিরোনাম দেখুন।

ক্বিসাস (قصاص)—প্রতিশোধ

অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে সমতা বিধানকে কিসাস বলা হয়। অপরাধী যেভাবে অপরাধ সংঘটিত করবে, তাকে শাস্তিও ঠিক সেভাবেই দিতে হবে।

—ক্বিসাস কখন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।—('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

—সমকালিন শাসক বা বিচারক অপরাধী থেকে ক্বিসাস গ্রহণ করবেন।

—('ইমরাত' শিরোনাম দেখুন)

কুনূত (قنوت)—দু'আ কুনূত পড়া

—ফযর নামাযে কুনূত পড়া।—('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

—বিত্‌র নামাযে কুনূত পড়া।—('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

কুফ্‌র (كفر)—

১. সংজ্ঞা

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীনের (বা জীবন ব্যবস্থার) অনুসরণকে কুফ্‌র বলে।

২. কুফরীর বিধান

—ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করে কুফরীর দিকে চলে যাওয়া এবং তার ফলাফল।—('রিদ্দাহ' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

www.amarboi.org

–মুসলিম ও কাফির (অমুসলিম) একে অপরের ওয়ারিশ হতে পারে না।
–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

–অমুসলিম (কাফির) কোনো মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারে না।
–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–কোনো কাফির (অমুসলিম) মহিলাকেও কোনো মুসলিম বিয়ে করতে পারে না, অবশ্য আহলে কিতাব হলে ভিন্ন কথা।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–আহলে কিতাব ছাড়া কোনো কাফিরের (অমুসলিম) এর যবাহকৃত প্রাণী খাওয়া হারাম।–('কিতাবিউন' শিরোনাম দেখুন)

–কাফিরের (অমুসলিমের) উপর (কোনো) মুসলমানের বাড়াবাড়ি।
–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

–কাফির (অমুসলিম) এর দিয়াত।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

–যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কাফির মায়ের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেবে তার শাস্তি।–('কাযফ' শিরোনাম দেখুন)

–অমুসলিমের শব যাত্রায় মুসলমানদের অংশগ্রহণ।–('মাউত' শিরোনাম দেখুন)

–কোনো অমুসলিম মুসলমানদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাকে গনিমাত থেকে কিছু দেয়া।–('গানিমাত' শিরোনাম দেখুন)

–অমুসলিমের অনুকরণ অনুসরণ করা নিষেধ।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।–('শাহাদাত' শিরোনাম দেখুন)

কুবলাহ্ (قبلة)–চুমো

রোযাদার ব্যক্তির চুমো খাওয়ার বিধান।–('সিয়াম' শিরোনাম দেখুন)

কুরআন (قران)–

১. কুরআন সংকলন ও প্রকাশনা

ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি শামবাসীকে ইরাকীদের সাথে মিলে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের জন্য জিহাদে পাঠাচ্ছিলেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্নভাবে কুরআন তিলাওয়াত হুযাইফা (রা)-কে ভীষণ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো। তাই তিনি হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন—'ইহুদী খৃষ্টানদের মত কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে মুসলমানগণ মতবিরোধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন।' একথা শুনে তিনি হাফসা (রা)-কে সংবাদ পাঠালেন—'কুরআনের লিখিত যা আছে সবগুলো পৃষ্ঠা আপনি মেহেরবানী করে পাঠিয়ে দেবেন। সবগুলো পৃষ্ঠা একত্র করে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করার পর আপনাকে সেগুলো ফেরত পাঠিয়ে দেবো। তখন হাফসা (রা) সবগুলো পৃষ্ঠা ওসমান (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা), সাঈদ ইবনুল আস (রা) এবং আবদুর রহমান (রা) ইবনুল হারিস ইবনু হিশামকে নির্দেশ

www.amarboi.org

দিলেন, পৃথক পৃথক অংশগুলোকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য। কুরাইশ তিন মহোদয়কে তিনি আরো বলে দিলেন—যায়িদ ইবনু সাবিত ও তোমাদের মধ্যে কোনো শব্দ নিয়ে মতবিরোধ হলে তা কুরাইশী ভাষায় লিখবে। কারণ কুরআন মজীদ কুরাইশী (আরবী) ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। সেভাবেই তারা কাজ শেষ করলেন। যখন পুরো কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে লিখা শেষ হলো তখন হাফসা (রা)-এর পৃষ্ঠাগুলো তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তারপর অনেকগুলো কপি করিয়ে একটি করে কপি প্রত্যেক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেন —'এ কপিটি ছাড়া আর যেখানে যত কপি বা পৃষ্ঠা আছে সবগুলো একত্র করে জ্বালিয়ে দেবে।'[৩৪]

সুয়ূতী বলেছেন—হযরত ওসমান (রা) সাতটি কপি করিয়েছিলেন এবং মক্কা আল মুয়ায্‌যমা, শাম, ইয়ামেন, বাহরাইন, বসরা এবং কুফায় তার একটি করে কপি পাঠিয়েছিলেন। আর একটি কপি রেখে দিয়েছিলেন রাজধানী শহর মদীনার জন্য। যাতে জনসাধারণ সেই কপি থেকে সংকলন ও মুখস্থ করতে পারে এবং মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।[৩৫]

২. কুরআন শরীফের কপি ক্রয় বিক্রয়।–('বায়' শিরোনাম দেখুন)

৩. আল কুরআনে সিজদার জায়গাসমূহ।–('সুজূদ' শিরোনাম দেখুন)

–বক্তৃতায় (খুতবায়) সিজদার আয়াত তিলাওয়াত।–('খুতবাহ' শিরোনাম দেখুন)

৪. তিলাওয়াতের সিজদা।–('সুজূদ' শিরোনম দেখুন)

৫. খতমে কুরআনের ওসিলায় দু'আ চাওয়া।

কুরআন মজীদ খতম করার পর দু'আ করা মুস্তাহাব। হযরত ওসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের শেষ সূরা অর্থাৎ সূরা আন নাস তিলাওয়াত করতেন তখন দু'আ করতেন।[৩৬]

৬. নামাযে কুরআন তিলাওয়াত।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–এক রাতে পুরো কুরআন খতম করা।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

কুরু' (قرء)—ঋতু অবস্থা/পবিত্রাবস্থা

–হযরত ওসমান (রা) কুরু' শব্দের অর্থ করেছেন, ঋতুস্রাব বা হায়িয।[৩৭]

–('ইদ্দত' শিরোনাম দেখুন)

–তালাকপ্রাপ্তা মহিলার যদি মাসিক হয় এবং তিনি গর্ভবতী না হন তাহলে তার ইদ্দতের হিসেব করতে হবে হায়িয বা ঋতুস্রাব দিয়ে।–('ইদ্দত' শিরোনাম দেখুন)

–যখন কোনো মহিলার সাথে বিছানায় যাবার অধিকার এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের কাছে হস্তান্তর হয়ে যায় অথবা কোনো উম্মু ওয়ালাদের (উম্মু ওয়ালাদ শিরোনাম দেখুন) মনিব মারা যায় কিংবা ব্যভিচারী মহিলা তাওবা করে কিংবা শত্রু পক্ষের মহিলা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয় অথবা অমুসলিম কোনো মহিলা মুসলমান হয়ে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসেন, তাদের প্রত্যেককেই কুরু বা হায়িযের হিসেবে জরায়ু পবিত্র (ইসতিব্‌রা) করতে হবে। অবশ্য যদি তাদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী না হন।(গর্ভবতী হলে প্রসব করা মাত্রই তার জরায়ু পবিত্র হয়ে যাবে।–অনুবাদক)।–(আরো দেখুন 'ইসতিবরা' শিরোনাম)

www.amarboi.org

কুসূফ (كسوف)—সূর্যগ্রহণ

সংজ্ঞা

সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়াকে কুসূফ বলে।

সালাতুল কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের নামায সম্পর্কে দেখুন 'সালাত' শিরোনাম।

কুহ্‌ল (كحل)—সুরমা/কাজল

বিস্তারিত জানার জন্য 'ইকতিহাল' এবং 'ইহ্‌রাম' শিরোনাম দেখুন।

www.amarboi.org

"ক" বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫০৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫১ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৮৩৫।
২. সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৬।
৩. আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩১।
৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৯।
৫. মুসান্নাফ-ইবুন আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৭ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২২২।
৬. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৭ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৬২ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩৫।
৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৩৫।
৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৩৭ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১০৭ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬২।
৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৫। আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৮২৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫১; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১৮।
১০. আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৫।
১১. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১১২ ; আদাবুল কাযী-খাসসাফ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫৫ ; আখবারুল কাযা-ইবনু হাইয়্যান, ১ম খণ্ড, পৃ-১১০।
১২. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৭৩ ; আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৫১।
১৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮২৫।
১৪. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর ৩য় খণ্ড, প্রথম ভাগ, পৃ-২৪০।
১৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৮৫।
১৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৭০।
১৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৯ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ-২৬৬ ; সুনানু বাইহাকী ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৭৩।
১৮. সুনানু বাইহাকী ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৭ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬৮০, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৩৩।
১৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২২৮।
২০. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৬৯।
২১. আখবারুল কাযা-ইবনু হাইয়্যান, ১ম খণ্ড, পৃ-১১০।
২২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৩।
২৩. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭৮।
২৪. সুনানু নাসাঈ, কিতাবুল বুয়ূ'।
২৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৯।
২৬. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৫২৪।
২৭. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭।
২৮. সুনানু বাইহাকী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-০৭ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০০ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০১।
২৯. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮।
৩০. আল মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৮০ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-২৬ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৯৭।
৩১. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৬৬।
৩২. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৭২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৫।

www.amarboi.org

৩৩. সাফওয়াতুস সাফওয়া, ১ম খণ্ড, পৃ-২৯৫।

৩৪. সহীহ্ আল বুখারী, ফাযাইলুল কুরআন অধ্যায় ; জামি' আত তিরমিযি, তাফসীর অধ্যায় ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৮৫ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫৯।

৩৫. ইত্‌কান-সুয়ূতী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬০।

৩৬. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭১।

৩৭. তাফসীর ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭০ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫২।

www.amarboi.org

খ

খাইলুন (خيل)–ঘোড়া

–ঘোড়ার যাকাত।–('যাকাত' শিরোনাম দেখুন)

–গানিমাতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য বেশী অংশ প্রদান।–('গানিমাত' শিরোনাম দেখুন)

খাতাম (خاتم)–আংটি

খাতাম বলতে এমন আংটিকে বুঝানো হয় যা সাজসজ্জা কিংবা সীলমোহর হিসেবে আঙ্গুলে ব্যবহার করা হয়।–('তাখাত্তুম' শিরোনাম দেখুন)

খামর (خمر)–মাদক দ্রব্য

নেশা হয় এমন যাবতীয় বস্তুই খামর বা মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত।

–(বিস্তারিত জানার জন্য 'আশরাবাহ' শিরোনাম দেখুন)

খায্‌য (خز)–রেশম/রেশমী সুতো

–খায্‌য এমন কাপড়কে বলা হয়, যার টানা এবং পড়েন রেশমী সূতো দিয়ে তৈরী।

–হযরত ওসমান (রা) রেশমী সূতোর তৈরী কাপড় পরার ব্যাপারে দোষের কিছু মনে করতেন না। তিনি নিজেও রেশমী সূতোর তৈরী কাপড় পরতেন।[১]

খিত্‌বাহ্‌ (خطبة)–বিয়ের প্রস্তাব দেয়া

–ইহরাম অবস্থায় কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।–('ইহরাম' ও নিকাহ শিরোনাম দেখুন)

–ইদ্দত পালনরত অবস্থায় কোনো মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে না। অবশ্য ইশারা ইঙ্গিতে বলা যেতে পারে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ج

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ (البقرة : ٢٣٤)

"তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে যদি স্ত্রী জীবিত থাকে সে চার মাস দশদিন (দ্বিতীয় বিয়ে থেকে) নিজেকে বিরত রাখবে। ইদ্দত পুরো হয়ে যাওয়ার পর সে যা ভালো মনে করে করবে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৪)

www.amarboi.org

খিযাব (خضاب)–মেহেদী/হেয়ার ডাই

–খিযাব বলতে আমরা এখানে চুলে বা হাতে মেহেদী লাগানোকে বুঝিয়েছি।

–হযরত ওসমান (রা) চুলে মেহেদী লাগাতেন। সালত (রহ) বর্ণনা করেছেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-কে কালো রঙের একটি চাদর পরে খুতবা দিতে দেখেছি, যা বাতাসে উড়ছিলো, তখন তার চুলে মেহেদী লাগানো ছিলো।[২]

খিয়ার (خيار)–অবকাশ

১. খিয়ারুল মাজলিস

[১.১] **সংজ্ঞা ঃ** দ্বিপক্ষীয় কোনো চুক্তি সম্পাদনের পর ঐ মজলিস বা চুক্তি সম্পাদন স্থল ত্যাগ করার পূর্বে কোনো এক পক্ষ কিংবা উভয় পক্ষ চাইলে সেই চুক্তি প্রত্যাহার করতে পারেন, এ অধিকারকে খিয়ারুল মাজলিস বলা হয়।

[১.২] খিয়ারুল মাজলিসের এ অধিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মজলিস ত্যাগের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। যদি এ অধিকার প্রয়োগের আগে কোনো এক পক্ষ ওঠে চলে যায় তাহলে তার এ অধিকার বিলোপ হয়ে যায়। সালিম ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা বলেছেন—আমি আমার দাদী উম্মুল কুরার কিছু জমি হযরত ওসমান (রা)-এর খায়বারের কিছু জমির বিনিময়ে তার নিকট বিক্রি করলাম (অর্থাৎ 'ইওয়াজ বদল' করলাম)। চুক্তি চূড়ান্ত হলো। তিনি চুক্তি প্রত্যাহার করতে পারেন এই ভয়ে আমি দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করে বাড়িতে চলে এলাম। কারণ—সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে ক্রেতা যতক্ষণ সেই মজলিসে উপস্থিত থাকবেন যে মজলিসে বসে ক্রয় বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন হয়েছে, অন্য পক্ষ থেকে পৃথক না হবেন ততক্ষণ সেই চুক্তি প্রত্যাহার করার অধিকার তার থাকবে।[৩]

[১.৩] **এ সুযোগ কে পাবেন ঃ** [ক] ওপরে বলা হয়েছে চুক্তি সম্পাদনের স্থান ত্যাগ করার আগে উভয় পক্ষেরই চুক্তি প্রত্যাহার করার অধিকার আছে। আর এ অধিকার উভয় পক্ষেরই সমান।

[খ] যদি দু পক্ষের কোনো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে চুক্তি প্রত্যাহার করার নিজের অধিকারটুকু সোপর্দ করে দেন, তাহলে এ অধিকার সেই পক্ষ লাভ করবে। যেমন স্বামী তার স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করলেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে স্বামী থেকে তালাক নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে পারেন কিংবা স্ত্রী হিসেবও বহাল থাকতে পারেন। স্ত্রীর তালাক লাভের এ অধিকার সেই মজলিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যেমন, হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা) বলেছেন —যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মাজলিসে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং স্ত্রী সেই ক্ষমতা প্রয়োগের পূর্বেই যদি উভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান তাহলে তালাক প্রদানের ক্ষমতা পুনরায় স্বামীর অধিকারে চলে আসবে।[৪]

২. খিয়ারুল আয়িব

[২.১] **সংজ্ঞা ঃ** ক্রেতা পণ্যে কোনো ত্রুটি পেলে সেই পণ্য বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারেন। ফেরত দেয়ার এ অধিকারকেই খিয়ারুল আয়িব বলা হয়।

www.amarboi.org

[২.২] এমন ক্রটি যার কারণে বিক্রীত মাল ফেরত দেয়া যায় ঃ যেসব কারণে বিক্রীত মাল ফেরত দেয়া যায় তার একটি হচ্ছে বিক্রীত পণ্যে কোনো ক্রটি থাকা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—বিক্রীত পণ্য থেকে উপকৃত হওয়ার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি হওয়া। যেমন এক বাঁদী বেচাকেনা চূড়ান্ত হওয়ার পর জানা গেলো তার স্বামী আছে, এখন ক্রেতার এ অধিকার রয়েছে, তিনি চাইলে ঐ বাঁদীকে ফেরত দিতে পারেন। কারণ সেই বাঁদী বিবাহিত হওয়ায় তিনি তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না। এটি এমন এক ক্রটি যা ক্রীত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার পথে অন্তরায়। এজন্য হযরত ওসমান (রা) এমন বাঁদী সম্পর্কে (যাকে বিবাহিত হওয়ার পরও বিক্রি করা হয়েছিলো) ফায়সালা দিয়েছিলেন—এ দোষের কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারেন।[৫]

[২.৩] বিক্রেতা তার পণ্যের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে দায় দায়িত্ব না নেয়ার শর্তারোপ করলে ঃ পণ্য কেনার সময় বিক্রেতা পণ্যের দোষ-ক্রটির ব্যাপারে দায়িত্ব না নেয়ার শর্তারোপ করলেন, পরে দেখা গেলো পণ্যটি ক্রটিমুক্ত নয়। এমতাবস্থায় বিক্রেতার শর্তারোপের কারণে ক্রেতার খিয়ারুল আয়িব এর অধিকার রহিত হয়ে যায় না।–(বিস্তারিত জানতে হলে 'বায়' শিরোনাম দেখুন)

[২.৪] যেসব কারণে খিয়ারুল আয়িব এর অধিকার রহিত হয়ে যায় ঃ ক্রয়কৃত পণ্যে দোষ পাওয়ার পর যদি ক্রেতা তা ব্যবহার করে তাহলে সেই পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকার আর তার থাকে না। ক্রেতা দোষ পাওয়ার পর যদি সেই পণ্য ব্যবহার করেন, তাহলে ধরে নেয়া হবে, তিনি সেই পণ্যের ক্রটিকে মেনে নিয়েছেন।

তদ্রূপ যদি ক্রীত বস্তুর বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তন করা হয় তাহলে সেই পণ্যে ক্রটি থাকার পরও তা ফেরত দেয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়। কিন্তু ব্যবহারের কারণে যদি বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তন না হয় তবে ক্রটির অজুহাতে তা (পুরোপুরি) ফেরত গ্রহণযোগ্য হবে না। এমতাবস্থায় প্রদত্ত মূল্য থেকে সেই পরিমাণ টাকা কম নিতে হবে, ব্যবহারের ফলে সেই পণ্যের মূল্য যতটুকু কমে গেছে।–(আরো দেখুন 'বায়' শিরোনাম)

৩. খিয়ারুর রুইয়াহ্

খিয়ারুর রুইয়াহ্ অর্থ পণ্য দেখার পর ক্রয় বিক্রয় ঠিক রাখা কিংবা বাতিল করার ইখতিয়ার।

এ সম্পর্কে হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে কেউ কোনো জিনিস না দেখে ক্রয় করলে, তা বহাল রাখা কিংবা বাতিল করার অধিকার তার থাকে এই কারণে হযরত ওসমান (রা) কুফায় পাওয়া জমির পরিবর্তে তালহা (রা)-এর কাছ থেকে মদীনায় এক খণ্ড জমি কিনেন।* হযরত ওসমান (রা)-কে বলা হলো আপনিতো ঝামেলায় জড়ালেন। তিনি জবাব দিলেন—সে জন্য কোনো চিন্তা নেই। আমি তো আর জমি দেখে কিনিনি, না হয় ক্রয় বিক্রয় বাতিল করে দেবো। সে অধিকার আমার আছে। যখন একথা তালহা (রা)-কে বলা হলো, তিনি বললেন, বিক্রি বলবত রাখা না রাখা তো আমার অধিকার। কারণ আমি না দেখে তা কিনেছি। এভাবে উভয়ে মনে করতে লাগলেন, বেচাকিনি বলবত রাখা না রাখা তার দায়িত্ব। পরিশেষে হযরত যুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা)-কে উভয়েই বিচারক মানলেন। তিনি

* জমি দিয়ে জমি কেনার যে কথা বলা হয়েছে তা আমাদের দেশে, 'ইওয়াজ বদল' নামে পরিচিত।–অনুবাদক।

www.amarboi.org

হযরত ওসমান (রা)-এর বিপক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন—আপনাকে ক্রয় বিক্রয় ঠিক রাখতে হবে। তবে ক্রয় বিক্রয় ঠিক রাখা না রাখার দায়িত্ব তালহার ইখতিয়ারে। কেননা তিনি সেই জায়গা না দেখে খরিদ করেছেন।[৬]

৪. খিয়ারুল মাফকূদ

যদি মাফকূদুল খবর বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রী স্বামী ফিরে আসার আগে অন্যত্র বিয়ে বসেন এবং নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ফিরে এসে দেখতে পান যে, তার স্ত্রী অন্যের ঘরণী। এমতাবস্থায় তার অধিকার রয়েছে—তিনি ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন কিংবা স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নিয়ে যে মোহরানা তাকে দিয়েছিলেন তাও ফিরিয়ে নিতে পারেন।-(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'মাফকূদ' শিরোনাম)

৫. খিয়ারুল মারআহ্

খিয়ারুল মারআহ্ বলতে বুঝায় স্বামী স্ত্রীকে একথা বলা যে, তোমার সম্পর্কে তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারো। এ অধিকার তোমাকে দেয়া হলো। তাহলে বিয়ে বলবত রাখা না রাখার ক্ষমতা স্ত্রীর ইখতিয়ারে চলে যায়।-(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'তালাক' শিরোনাম)

খিলওয়াত (خلوة)—একান্ত নিরিবিলি

১. সংজ্ঞা

খিলওয়াত বলতে আমরা বুঝাতে চাই একজন পুরুষ ও একজন মহিলার এমন স্থানে একত্রিত হওয়া যেখানে অন্য কোনো লোকের দেখার সম্ভাবনা নেই।

২. খিলওয়াতের কারণে সংঘটিত ঘটনার প্রভাব ও পরিণতি

যদি কোনো ব্যক্তি এমন মহিলার সাথে নির্জন বাস (খিলওয়াত) করেন যার সাথে তার আকদ হয়েছে, তারপর তাকে তালাক দেন, তাহলে পুরো মোহর প্রদান করতে হবে। যিরারা ইবনু আওফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—খুলাফা-ই-রাশিদীনের কর্মপদ্ধতি ছিলো, যখন তাদের সামনে এ ধরনের মোকদ্দমা পেশ করা হতো, স্বামী স্ত্রী নির্জন ঘরে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং পর্দাও ফেলে দিয়েছেন (তারপর তালাক সংঘটিত হয়েছে) এমতাবস্থায় তারা পুরো মোহর পরিশোধ করার নির্দেশ দিতেন।[৭] এবং স্ত্রীকে তালাক প্রাপ্তা মহিলার মত পূর্ণ ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দিতেন।[৮]

এ সম্পর্কিত হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মূলনীতিটি প্রকাশ পায় তা হচ্ছে—তালাকপ্রাপ্তা যদি পূর্ণ মোহর প্রাপ্য হয় তাহলে তাকে ইদ্দতও পুরা পালন করতে হবে।

খিলাফাত (خلافت)—প্রতিনিধিত্ব/নেতৃত্ব

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইমারাত' শিরোনাম।

খুতবা (خطبة)—বক্তৃতা

১. সংজ্ঞা

খুতবা অর্থ কোনো সমাবেশে সাজিয়ে গুছিয়ে কিছু কথা বলা।

www.amarboi.org

২. খুতবার জায়গাসমূহ

–যেসব জায়গায় খুতবা দেয়া প্রয়োজন জুম'আর নামায তার অন্যতম। জুম'আর খুতবা নামাযের পূর্বে দেয়া হয়।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–ঈদের খুতবা নামাযের পরে দেয়া হয়।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–তেমনিভাবে ইস্তিস্কার নামাযের সময়ও খুতবা দেয়া হয়, তবে তা নামাযের পরে দিতে হয়।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–তদ্রূপ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান যখন রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি খুত্বা দিয়ে থাকেন।–('ইমরাত' শিরোনাম দেখুন)

–এছাড়া বিয়ের সময়ও খুতবা দেয়া হয়।

৩. খুতবা দেয়ার সময় কিসের ওপর দাঁড়াতে হবে

যদি খতীব মসজিদের মধ্যে খুতবা দেন তাহলে, তিনি মিম্বারের ওপর দাঁড়াবেন। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-ও এরূপ করতেন।

হযরত আবু বকর (রা) যখন খুতবা দিতেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন তার চেয়ে এক ধাপ নিচে দাঁড়াতেন। যখন হযরত ওমর (রা) খলীফা হলেন তখন আবু বকর (রা) যেখানে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন তার চেয়ে আরো এক ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন কিন্তু যখন হযরত ওসমান (রা) খলীফা হলেন তখন বললেন—যে রেওয়াজ শুরু হয়েছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সিড়ির ধাপ তো অনেক লম্বা হয়ে যাবে। একথা বলে তিনি সেখানে দাঁড়িয়েই খুতবা দিলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিতেন।[৯]

অবশ্য মসজিদের বাইরে কোথাও খুতবা দিতে হলে এমন উঁচু জায়গায় দাঁড়ানো উচিত যেন সকলে তাকে দেখতে পান এবং তার কথা বুঝতে পারেন। যেমন ঈদের নামাযের সময় যা সাধারণত খোলা মাঠে আদায় করা হয়। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফা-ই-রাশিদীনের সকলেই [হযরত ওসমান (রা)-ও তার মধ্যে শামিল] তাদের বাহনের ওপর (বসে) খুতবা দিতেন।[১০]

৪. খুতবা দাঁড়িয়ে দেয়া উচিত

সহীহ্ মাসয়ালা হচ্ছে—ইমাম দাঁড়িয়ে খুতবা দেবেন। যদি বাহনের ওপর থেকে খুতবা দেয়া হয়, দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়েছেন বলেই তা গণ্য হবে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) সবসময় দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো তখন তিনি প্রথম খুতবা দাঁড়িয়ে দিতেন তারপর বসে যেতেন আবার দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা দিতেন। পরবর্তীতে যখন মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ানের সময় এলো তখন তিনি প্রথম খুতবা বসে দিতেন এবং দ্বিতীয় খুতবা দাঁড়িয়ে দিতেন।[১১]

www.amarboi.org

৫. শ্রোতাদের সালাম দেয়া

খতীব (বক্তা) যখন মিম্বারের ওপর বসবেন, প্রথমে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আসসালামু আলাইকুম বলবেন। হযরত ওসমান (রা)-এর অভ্যাস ছিলো যখন তিনি খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বারের ওপর বসতেন তখন সর্বপ্রথম শ্রোতাদেরকে সালাম দিতেন।[১২]

৬. খতীব মিম্বারের ওপর বসার পর কথাবার্তা বলা

[৬.১] **খতীবের কথাবার্তা বলা ঃ** খতীব খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বারের ওপর ওঠার পরও লোকদের সাথে কথাবার্তা বলা জায়েয। হযরত ওসমান (রা) সাধারণত এরূপ করতেন। মূসা (রা) ইবনু তালহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-কে মিম্বারের ওপর বসে লোকদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে এবং জিনিস পত্রের দরদাম সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে দেখেছি। ঐ অবস্থায় মুয়ায্‌যিন আযান দিতে থাকতেন।[১৩]

তাবাকাতে ইবনু সা'দে মূসা (রা) ইবনু তালহার এ রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—আমি দেখলাম হযরত ওসমান (রা) জুম'আর দিন কমলা রঙের দুটো চাদর পরে নামাযের জন্য বেরুলেন। তারপর সোজা গিয়ে মিম্বারের ওপর বসলেন এবং লোকদের ভালোমন্দ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। তিনি জিনিস পত্রের দরদাম সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। অবশ্য তখন মুয়ায্‌যিন আযান দিচ্ছিলেন। যখন মুয়ায্‌যিনের আযান শেষ হলো তখন তিনি তাঁর বাঁকা লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে লাগলেন। প্রথম খুতবা দেয়া শেষ হলে, বসে আবার তিনি আগের মত লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করলেন। তারপর দ্বিতীয় খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় খুতবা শেষ করে মিম্বার থেকে নামলেন। তখন মুয়ায্‌যিন নামাযের ইকামাত বলা শুরু করে দিলেন।[১৪]

[৬.২] **শ্রোতাদের কথাবার্তা বলা ঃ** শ্রোতাদের কর্তব্য হচ্ছে—তারা চুপ থাকবেন এবং মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনবেন, খতীবের কথা শুনা যাক বা না যাক। খুতবার সময় কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা কিংবা কারো সাথে কথাবার্তা বলা জায়েয নেই। অবশ্য যদি খতীবের সাথে কোনো কথা বলতে চান, তা বলতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) যখন খুতবা দিতেন তখন কদাচিৎ এমন হতো যে, তিনি একথা বলতেন না, লোক সকল ! মনযোগ দিয়ে শুনুন এবং চুপ থাকুন। কারণ খুতবার সময় যে ব্যক্তি চুপ থাকবেন তিনি খুতবার আওয়াজ শুনতে না পেলেও যিনি খুতবার আওয়াজ শুনতে পান তার সমান সওয়াব পাবেন।[১৫] যদি খুতবার আওয়াজ শুনতে না পান তাহলে ঐ সময় তিনি তাসবীহ্ তাহ্‌লীল কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন।[১৬]

৭. খুতবার সময় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করা

যদি খতীব মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে কোনো সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাহলে সাথে সাথে মিম্বার থেকে নেমে সিজদা করে নেবেন। তারপর মিম্বারে ওঠে অবশিষ্ট খুতবা শেষ করবেন। সেজন্য হযরত ওসমান (রা) এরূপ করতেন। তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে সূরা সা'দ পড়েছেন এবং মিম্বার থেকে নেমে সিজদা করেছেন।[১৭] অবশ্য তিনি যদি খুতবার মধ্যে বিরতি দিয়ে সিজদা না করেন, তাও জায়েয আছে। অনেক সময় হযরত ওসমান (রা) খুতবার সময় তিলাওয়াতের সিজদা করতেন না।[১৮] এ ব্যাপারে আমার (লেখকের) বক্তব্য হচ্ছে—হযরত ওসমান (রা) খুতবার মধ্যে সম্ভবত এমন আয়াত তিলাওয়াত

www.amarboi.org

করেছেন, যে আয়াত তিলাওয়াতে সিজদার জন্য অতবেশী গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

খুলা' (خلع)—স্ত্রী কর্তৃক তালাক নেয়া

১. সংজ্ঞা

স্ত্রী কিছু সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেয়াকে খুলা' বলা হয়।

২. খুলা'র শরঈ ও আইনগত ভিত্তি

খুলা' বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি খোদ্ কুরআন থেকেই প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে–

اَلطَّلاَقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَن يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَا اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٢٩)

"স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সময় তোমাদের জন্য জায়েয নেই, যাকিছু তোমরা তাদেরকে দিয়েছো, তা থেকে কিছু ফেরত নেবে। অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্কের যদি চরম অবনতি ঘটে এবং ভয় হয়, হয়তো আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা লংঘন হয়ে যাবে তখন স্ত্রী স্বামীকে কিছু দিয়ে তার বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করতে পারেন। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমা। বাড়াবাড়ি করো না। যে আল্লাহ প্রদত্ত সীমালংঘন করবে সেই জালিম।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

সহীহ আল বুখারী এবং সুনানু নাসাঈতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে—সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শাম্মাসের স্ত্রী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আমি সাবিতের দীন ও চরিত্র সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে চাই না কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তার কারণে পুনরায় বিপথগামী হই তা আমি পছন্দ করি না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন—সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছে তা কি ফেরত দেবে? তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিত ইবনু কায়িসকে ডেকে বলে দিলেন—তুমি তোমার দেয়া বাগান ফেরত নাও এবং তাকে তালাক দিয়ে দাও।[১৯] এ মাসয়ালার ব্যাপারে চারজন খলীফা-ই একমত। এ সম্পর্কে তাদের কারো দ্বিমত ছিলো না। এ মাসয়ালাটি ইজমায়ে উম্মত বলে গণ্য হয়েছে।[২০]

৩. খুলা' কার্যকরী করার জন্য আদালত পর্যন্ত যাওয়া জরুরী নয়

খুলা সম্পর্কে আমাদের সামনে যেসব দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে খুলা' সংক্রান্ত যেসব মামলা আদালতে এসেছিলো তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একমত হয়ে যদি নিজেরাই খুলা' করে নেন, নিতে পারেন। এজন্য আদালত পর্যন্ত যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[২১]

www.amarboi.org

সুনানু বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে—হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে এক মহিলা আদালতে না গিয়ে স্বামীকে রাজী করিয়েই খুলা' করে নেন। শোনে হযরত ওসমান (রা) তাদের এ কাজকে বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২২] মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে রবিয়া বিনতু মুআওবিয থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—আমি আমার স্বামী থেকে খুলা' গ্রহণ করেছিলাম। পরে আমি লজ্জিত হয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে ঘটনা জানালাম। তিনি খুলা' অনুমোদন করলেন।[২৩]

৪. খুলা'র মর্যাদা (তালাক না বিবাহ বিচ্ছেদ ?)

খুলা'র আইনগত মর্যাদা কী, তালাক না বিবাহ বিচ্ছেদ ? এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর যেসব মতামত পাওয়া যায় তা পরস্পর বিরোধী। এক বর্ণনায় বলা হয়েছে—খুলা'র (আইনগত) মর্যাদা তালাক নয়, বিবাহ বিচ্ছেদ।[২৪] কারণ কোনো মহিলা স্বামী থেকে খুলা' করলে তা তালাক হিসেবে গণ্য হয় না। কেননা আল্লাহ কুরআনুল কারীমে এজন্য 'তালাক' পরিভাষাটি ব্যবহার না করে 'ইফতিদা' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এটি ইবনু আব্বাস (রা)-এরও অভিমত। ইমামদের মধ্যে তাউস (রহ), ইকরামা (রা), আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ), ইসহাক ইবনু রাহবিয়াহ (রহ), আবু সাওর (রহ) এবং দাউদ জাহেরী (রহ) প্রমুখ ইমামগণও এ বিষয়ে একমত। ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর একটি অভিমতও এর অনুকূলে পাওয়া যায়।

অন্য বর্ণনা মতে হযরত ওসমান (রা) খুলা'কে তালাক মনে করতেন।[২৫] কারণ যদি কোনো ব্যক্তি খুলা'র সাথে সাথে তালাকের সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেন তাহলে যে ক'টি তালাকের উল্লেখ করবেন ঠিক সেই ক'টি তালাকই সংঘটিত হবে। যদি নির্দিষ্ট না করেন তাহলে শুধু এক তালাক কার্যকরী হবে। বর্ণিত আছে—এমন একজন মহিলা হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে মামলা ঠুকে দিলেন, যার স্বামী তাকে মেরেছিলেন। তিনি আরজিতে বললেন—যদি স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেন, তাহলে যে মোহরানা তাকে দেয়া হয়েছে তা তিনি ফেরত দেবেন। হযরত ওসমান (রা) তার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন। স্বামী উপস্থিত হলে মামলার বিবরণ তার কাছে তুলে ধরলেন এবং স্ত্রীর অভিমত জানালেন। স্বামী রাজী হয়ে গেলেন। তখন হযরত ওসমান (রা) ঐ মহিলাকে বললেন—তুমি এখন যেতে পারো। এ খুলা' কার্যকরী করার মাধ্যমে এক তালাক কার্যকরী হলো।[২৩]

এরূপ আরেক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে—উম্মে বকর আসলামিয়াহ আবদুল্লাহ ইবনু উসাইদ-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বামী থেকে খুলা' করেছিলেন। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। স্বামী হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের অভিপ্রায় জানালেন। তিনি বললেন—তোমরা যদি তালাকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে না থাকো তাহলে মাত্র এক তালাক সংঘটিত হয়েছে। তখন তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন।[২৭]

'তিনি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলেন।' বর্ণনাকারীর একথা দ্বারা মনে করা যাবে না যে, খুলা'র মাধ্যমে এক তালাক রিজঈ সংঘটিত হয়। আসলে খুলা'র মাধ্যমে এক তালাক বাইন কার্যকরী হয়। যেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনুতপ্ত হয়েছেন এবং আবার দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চেয়েছেন। তাই শুধু পুনরায় বিয়ে করে নিয়েছেন।

www.amarboi.org

৫. খুলার বিনিময়ে দেয় মাল-সম্পদ

স্বামী-স্ত্রী যে কোনো সম্পদের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে খুলা' কার্যকরী করতে পারেন। পরিমাণে তা কম হোক কিংবা বেশী। এখানে কথা হচ্ছে তা মোহরের সমপরিমাণ হবে যা স্বামী তাকে দিয়েছিলেন, নাকি বেশী হলেও চলবে। যেমন আমরা দেখতে পাই, রবিয়া বিনতু মুয়াওবিয তাঁর সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে খুলা' করেছিলেন। তো হযরত ওসমান (রা) তা অনুমোদন করেছেন। মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে—রবিয়া বিনতু মুয়াওবিয ইবনু আফরাহ্ বর্ণনা করেন—আমার স্বামী এমন এক প্রকৃতির ছিলেন, তিনি বাড়িতে থাকলেও খুব কম ব্যয় করতেন, যা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ হতো না, আবার যখন বাড়িতে না থাকতেন তখনও প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মত সম্পদ রেখে যেতেন না। আমার ভুল হলো আমি একদিন বলেই ফেললাম, আমার সবকিছু দিয়ে হলেও আমি তোমার থেকে খুলা' চাচ্ছি। তিনি বললেন—ঠিক আছে, আমি মনজুর করলাম। আমি বললাম—তাহলে আমাদের মাঝে এটিই কার্যকর হলো। অতপর আমার চাচা মুয়ায (রা) ইবনু আফরাহ্ হযরত ওসমান (রা)-কে ঘটনা জানালেন। তিনি খুলা' অনুমোদন করলেন এবং আমার স্বামীকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আমার চুরি-ফিতা থেকে শুরু করে সবকিছুই গ্রহণ করেন।[২৮]

৬. খুলা' গ্রহণকারী মহিলার ইদ্দত

হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—দুটো কারণে ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য (ওয়াজিব)। এক. এর মাধ্যমে জরায়ু গর্ভ মুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হওয়া। দুই. দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ বেদনার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু খুলা' গ্রহণের ফলে স্ত্রী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ব্যাথা ভারাক্রান্ত হন না। তাই ইদ্দত হিসেবে এতটুকু সময় অতিবাহিত করাই যথেষ্ট যেন নিশ্চিত হওয়া যায় জরায়ু গর্ভমুক্ত কিনা। আর এজন্য একটি মাসিক অতিবাহিত করাই যথেষ্ট। এর বেশী নয়। এই ছিলো হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত। এর আগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাবিত ইবনু কায়িসের ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শাম্মাস তার স্ত্রী জামিলা বিনতু আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে পিটিয়ে একটি হাত ভেঙ্গে দেন। তার ভাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে নালিশ করেন। তিনি সাবিত ইবনু কায়িসকে ডেকে পাঠান এবং (তিনি এলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে) বলেন—তোমার স্ত্রী তোমার দেয়া মোহর তোমাকে ফিরিয়ে দেবে তুমি তাকে পৃথক করে দাও। তিনি নতশীরে তাঁর এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলা' গ্রহণকারী সেই মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন সে এক হায়িয ইদ্দত পালন করবে এবং তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক।[২৯]

এ ফায়সালার ওপর ভিত্তি করেই হযরত ওসমান (রা) রাবিয়া বিনতু মুআওবিযকে যার আলোচনা ওপরে করা হয়েছে এক হায়িয ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এটিও অনুমোদন করেছিলেন যে তিনি তার পরিজনের কাছে চলে যাবেন। সাধারণভাবে ইদ্দত পালনকারী মহিলাদের মত স্বামীর বাড়িতেই থাকতে হবে এটি আবশ্যক মনে করেননি। তখন রাবিয়ার চাচা হযরত ওসমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন সে কি তার পরিবারের কাছে চলে

www.amarboi.org

যেতে পারবে ? তিনি বললেন—হাঁ পারবে। তার ইদ্দত এক হায়িয। এর মধ্যে সে অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না। এরূপ করার কারণ তার গর্ভে সন্তান আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।[৩০]

খুসূমাহ্ (خصومة)—মোকদ্দমা/আদালতে অভিযোগ

মামলায় উকিল নিয়োগ করা।–(দেখুন–'ওয়াকালাহ' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'খ' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. কিতাবুল আছার-আবু ইউসুফ, হাদীস নং ২০২২।
২. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৯২।
৩. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৫০।
৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৯ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫২৫ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৭।
৫. সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩২৩।
৬. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৮০ ; আল মাজমু', ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩০।
৭. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৮৩।
৮. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৫০।
৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৮।
১০. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৮৭।
১১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৮৭, ১৮৯ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৮।
১২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮।
১৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২১৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭২ ; ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৯ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১৬।
১৪. তাবাকাত-ইবনু সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৯।
১৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯ ; ৩য় খণ্ড, পৃ-২১২ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৯ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২০।
১৬. কাশফুল গুম্মাহ ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৯।
১৭. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬।
১৮. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১০।
১৯. সহীহ আল বুখারী, সুনানু নাসাঈ, কিতাবুত তালাক, বাবুল খুলা'।
২০. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৫২।
২১. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৫২ ; বাদায়ি' আস সানায়ি', ২য় খণ্ড, পৃ-১৪৫।
২২. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩১৬।
২৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২৯৫।
২৪. তাফসীর ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৫।
২৫. বাদায়ি 'আস সানায়ি', ২য় খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ-২৮২।
২৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৮২।
২৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৮৩ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪৪ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৩৮ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৯৫ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ-৩৪০।
২৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫০৪ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮২ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৪০; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৫২।
২৯. সুনানু নাসাঈ, কিতাবুত তালাক।
৩০. সুনানু বাইহাকী ৭ম খণ্ড, পৃ-৪১৫ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮২ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫০৬ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৩৭ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৪৯ ; তাফসীর ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭৬।

www.amarboi.org

গা

গানিমাত (غنيمت)—যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ

১. সংজ্ঞা

গানিমাত বলতে ঐ সম্পদকে বুঝায় যা মুসলমানগণ যুদ্ধরত কাফিরদের থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে।

২. গানিমাতের সম্পদ থেকে কাউকে পুরস্কৃত করা

গানিমাতের মাল বন্টনের আগে যুদ্ধে বীরত প্রদর্শন কিংবা বিশেষ কোনো ভূমিকার জন্য কাউকে পুরস্কৃত করতে চাইলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের জন্য তা জায়েয আছে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবী আস সারহ ব্যাপারে বলেছিলেন, যদি সে আফ্রিকা আক্রমণ করে এবং তা বিজয় করতে পারে তাহলে তাকে গানিমাতের মালের খুমুসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে। যখন আল্লাহ তাকে দিয়ে আফ্রিকা বিজয় করালেন তখন তিনি গানিমাতের মাল থেকে খুমুসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ রেখে অবশিষ্ট চার ভাগ হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যেন তিনি অবশিষ্ট চার ভাগ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারেন।[১]

এ ঘটনা থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর মতে গানিমাতের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) থেকে সর্বোচ্চ এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা জায়েয। অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ যারা হকদার তাদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে তাদের অংশের ব্যতিক্রম করা জায়েয নেই।—(আল্লাহই ভালো জানেন)।

৩. গানিমাতের মাল বন্টন

গানিমাতের মাল বন্টনের পূর্বে তা পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক ভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমার জন্য পৃথক করে রাখা হয়। যাতে সেই মাল তার বিশেষ অধিকারীদের জন্য খরচ করা যায়। অবশিষ্ট চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সেইসব সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়।

[৩.১] এক-পঞ্চমাংশ ব্যয়ের খাত ঃ যখন খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের কাছে পৌছে যাবে, তা থেকে রাষ্ট্রপতি কিছু অংশ এমন লোকদেরকে হাদীয়া বা পুরস্কার স্বরূপ দিতে পারেন যাদেরকে দেয়া তিনি প্রয়োজন মনে করবেন। যেমন—হযরত ওসমান (রা) আবদুল্লাহ ইবনু সাদকে খুমুস থেকেই পাঁচ ভাগের এক ভাগ পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন।

পুরস্কার হিসেবে প্রদানের পর খুমূসের যে মাল অবশিষ্ট থাকতো হযরত ওসমান (রা) তা আবার তিনভাগে ভাগ করে নিতেন। এক ভাগ ইয়াতীম, এক ভাগ মিসকীন ও এক ভাগ মুসাফিরের জন্য।[২]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা খুমূসের ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতে বিধান দিয়েছেন—

www.amarboi.org

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا-(الانفال : ٤١)

"জেনে রেখো, গানিমাত হিসেবে যেসব সম্পদ তোমরা লাভ করবে, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য।"

–(সূরা আল আনফাল ঃ ৪১)

–নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতে উল্লেখিত খাতসমূহের মধ্যেই খুমূসের সম্পদ বণ্টন করতেন। যেমন এক অংশ তিনি নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতেন। তারপর যা বেঁচে যেত ফকীর মিসকীনকে দিয়ে দিতেন।

–আত্মীয় স্বজনের অংশ তিনি বানী হাশিম ও বানী আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। অবশ্য তিনি বানী আবদে শাম্‌স ও বানী নাওফেলকে কিছুই দিতেন না।

হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের খাত বিলোপ করে দেন। তাঁর মতে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দান করতেন। তার ইন্তিকালের কারণে তাঁর পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেছে। সেজন্য তাদের এ খাতও মুলতবী হয়ে গেছে। রইলো ফকীর মিসকীনদের খাত, তারা অন্যান্য গরীব মুসলমানের মত বাইতুলমাল থেকে ভাতা পাবেন। তিনি খুমূসকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ ইয়াতীমদের জন্য, এক ভাগ ফকীর মিসকীনদের জন্য এবং আরেক ভাগ মুসাফিরের জন্য। হযরত ওমর (রা)-এর সময়ও এভাবেই খুমূস বণ্টন করা হতো। পরবর্তীতে যখন হযরত ওসমান (রা) খলীফা হন তখন তিনিও পূর্ববর্তী মহান দুই খলীফার রীতিই বহাল রাখেন।[৩]

কিন্তু আবু ওবাইদ (রহ) কিতাবুল আমওয়ালে এবং ইমাম আহমদ (রহ) তার মুসনাদে যুবাইর ইবনু মুতয়িম থেকে বর্ণনা করেছেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুমুস থেকে বানী হাশিম ও বানী মুত্তালিবকে দিতেন কিন্তু বানী আবদে শামস ও বানী নাওফেলকে কিছুই দিতেন না। যখন আবু বকর (রা) খলীফা হলেন তখন সবগুলো খাত ঠিক রাখলেন। শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় স্বজনের অংশটি পুরোপুরি রাখলেন না।[৪] তার বেশীর ভাগ অংশ অন্যান্য প্রাপকদের মধ্যে খরচ করে ফেলতেন। তার মধ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহয় অংশগ্রহণের জন্য যাদের বাহন থাকতো না তাদের বাহন সংগ্রহ করে দিতেন। কারণ তখন ঈমানদারদের বড়ো সংকট ছিলো যানবাহনের। তারপর হযরত ওমর (রা) ও হযরত ওসমান (রা)-এর সময় এলো। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলো। সেই সাথে বাইতুলমালে সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পেলো। তখন সাধারণ মুসলমানকে দানের ব্যাপারেও কোনোরূপ কার্পণ্য করা হতো না। প্রত্যেকের ভাতা ও অনুদান বাড়িয়ে দেয়া হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় স্বজনরাও আগের চেয়ে অনেক বেশী পেতে লাগলেন। তারা খুমূস থেকে যা পেতেন তার চেয়ে বেশী দিতে লাগলেন। যার কারণে অনেকের ধারণা হতো পুনরায় হয়তো তাদেরকে খুমূস থেকে প্রদান বহাল করা হয়েছে। অথচ তা ঠিক ছিলো না। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন)

www.amarboi.org

[৩.২] গানিমাতের মালের অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের বণ্টন ঃ [ক] পুরস্কার প্রদান এবং এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশের যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো। সেই অংশ সকলেই পেতেন। চাই তিনি যুদ্ধের প্রথম থেকে অংশগ্রহণ করুন কিংবা যুদ্ধের মাঝে এসে শরীক হোন কিংবা রিজার্ভ ফোর্স হিসেবেই নিয়োজিত থাকুন। এজন্য আর্মেনিয়া বিজয়ের সময় হযরত ওসমান (রা) সেইসব রিজার্ভ ফোর্সকেও অংশ দিয়েছিলেন, যারা যুদ্ধের শেষ দিকে গিয়ে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এমন প্রত্যেককেই গানিমাতের মালের অংশ দেয়া হবে।[৫] তদ্রূপ তাঁরাও অংশ পেতেন, যাদেরকে আমীরুল মুমিনীন কিংবা সেনাপতি যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত রাখতেন। যেমন–হযরত ওসমান (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (গানিমাতের মাল থেকে তাঁকে দিয়েছিলেন। কারণ) তাঁর স্ত্রী (যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা) অসুস্থ হওয়ায় তাকে দেখা শুনার দায়িত্বে নিয়োজিত করে গিয়েছিলেন।[৬]

[খ] কিন্তু যদি এমন কেউ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন যিনি যুদ্ধে অংশ নেয়ার উপযোগী নন যেমন কোনো অমুসলিম কিংবা কোনো মহিলা, তারা গানিমাতের মাল থেকে অংশ পাবেন না। তবে তাদেরকে উপহার স্বরূপ কিছু দেয়া যেতে পারে। এক যুদ্ধে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর সাথে কতিপয় ইহুদী অংশগ্রহণ করে। তিনি তাদেরকে গানিমাতের মাল থেকে (মনোতুষ্টির জন্য) কিছু উপহার প্রদান করেছিলেন। আমাদের জানা মতে সাহাবা কিরামের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।[৭]

[গ) জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মত তাদের (জিহাদে ব্যবহৃত) ঘোড়ার জন্যও অংশ নির্দিষ্ট করা যাবে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের জন্য এটি জায়েয আছে। ঘোড়ার অংশ নির্দিষ্ট করার সময় ঘোড়ার বিভিন্ন প্রজাতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে অংশ কমবেশী করা (এটিও জায়েয)। যেমন–হযরত ওমর (রা) আরবীয় ঘোড়া এবং শংকর জাতের ঘোড়ার জন্য পৃথক পৃথক অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। আরবীয় বংশোদ্ভূত ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং শংকর জাতের ঘোড়ার জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। আমরা ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাবে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমাদের জানা মতে কোনো সাহাবাই হযরত ওমরের (রা) এ সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি।[৮]

গিনা (غناء)–গান, সংগীত

১. সংজ্ঞা

(ছন্দবদ্ধ) কথাকে সুর দিয়ে বলার নাম গান।

২. গানের বৈধ অবৈধতা

যদি গানের সাথে হারাম কোনো জিনিসের মিশ্রণ না ঘটে তাহলে তা শোনা জায়েয।[৯] আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—মুহাজির সাহাবাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যার কাছ থেকে আমি সুর দিয়ে আবৃত্তি শুনিনি।[১০]

গিয়াব (غياب)–অনুপস্থিতি

১. অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে (আদালতের) রায়

www.amarboi.org

এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা হচ্ছে—তিনি আদালতে অনুপস্থিত থাকলে এবং তার বিপক্ষে মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে রায় দেয়া বৈধ মনে করতেন।[১১]–(আরো দেখুন 'কাযা' শিরোনাম)

২. স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ

স্বামী যদি দীর্ঘ সময় নিরুদ্দেশ থাকেন, কোনো খোঁজ খবর না পাওয়া যায়, এমনকি তিনি জীবিত না মৃত এটিও জানা না যায় তাহলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে মামলা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আদালত একটি সময় নির্ধারণ করবেন। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর করে দেবেন। তখন স্ত্রী ইদ্দত পালনের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবেন। এটি তার জন্য জায়েয (বৈধ) হবে। অন্যত্র বিয়ে করার পর যদি আগের স্বামী ফিরে আসেন তাহলে তাকে দুটোর যে কোনো একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হবে। হয় তিনি স্ত্রীকে ফেরত নেবেন, না হয় তিনি স্ত্রীকে মোহরানা বাবদ যাকিছু দিয়েছিলেন তা ফেরত নেবেন।–(আরো জানতে হলে দেখুন 'মাফকূদ' শিরোনাম)।

৩. অনুপস্থিত মালের ক্রয় বিক্রয়

বিস্তারিত জানার জন্য–'বায়' শিরোনাম দেখুন।

গুসল (غسل)–গোসল

১. যেসব কারণে গোসল অপরিহার্য হয়ে যায়

নিম্নোক্ত কারণে গোসল অপরিহার্য হয়ে যায় এ ব্যাপারে সকল উম্মত ঐকমত্য।

[১.১] হায়িয ও নিফাস শেষ হওয়ার পর।

[১.২] যৌন উত্তেজনায় বীর্য নির্গত হলে ঃ যৌন উত্তেজনায় বীর্য নির্গত হলে গোসল করা ফরয। চাই সে বীর্য জাগ্রত অবস্থায় নির্গত হোক কিংবা ঘুমের ঘোরে। অথবা যৌন মিলনের কারণে হোক কিংবা যৌন মিলন ছাড়া অন্য কোনোভাবে। যেমন কেউ ঘুম থেকে ওঠে বুঝতে পারলো ঘুমের মধ্যে তার বীর্যপাত হয়েছে। স্বপ্নের কথা মনে পড়ুক বা না পড়ুক এমতাবস্থায় তার ওপর গোসল ফরয হয়ে যায়।[১২]

যদি বীর্য এমন কাপড়ে দেখা যায় যা পরে আছে কিংবা যে কাপড়ের ওপর শুয়েছিলো অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাপড়ের সাথে যদি তার কাপড়েও বীর্য দেখা যায়, এসব অবস্থায় তার ওপর গোসল অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ ইবাদাতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করাই হচ্ছে ঈমানের দাবী।[১৩]

[১.৩] লিঙ্গ যোনিপথে প্রবেশ করালে ঃ এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা) থেকে বিপরীতধর্মী দুটো অভিমত পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় আছে, লিঙ্গ যোনিতে প্রবেশ করালেই গোসল ফরয হয়ে যায়।[১৪] তিনি বলেছেন—'যখন পুরুষের লজ্জাস্থান মহিলার লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করে তখন উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়ে যায়।'[১৫]

মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবায় বর্ণিত হয়েছে—মুহাজির সাহাবাগণ অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) প্রমুখ সাহাবাগণ

www.amarboi.org

একথার ওপর একমত ছিলেন যে, যতটুকু কাজের জন্য রজম কিংবা বেত্রাঘাত ওয়াজিব হয়ে যায় ততটুকু কাজের প্রেক্ষিতে গোসলও ফরয হয়ে যায়।[১৬]

অর্থাৎ লিঙ্গ যোনীতে প্রবেশ করালেই যেমন হাদ (শাস্তি) অপরিহার্য হয়ে যায় তেমনিভাবে গোসলও ফরয হয়ে যায়।

অন্য বর্ণনায় আছে—হযরত ওসমান (রা)-এর মতে লিঙ্গ যোনিতে প্রবেশ করালেই গোসল ফরয হয় না, যতক্ষণ বীর্য নির্গত না হয়।[১৭] যেমন একবার যায়িদ ইবনু খালিদ জুহানী হযরত ওসমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন—যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো কিন্তু বীর্য নির্গত হলো না, তাহলে নির্দেশ কী? হযরত ওসমান (রা) বললেন—এমন হলে সে ওযু করে নেবে যেভাবে নামাযের জন্য ওযু করা হয়। সেই সাথে লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে। তিনি আরো বললেন—একথা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।[১৮]

[১.৪] জুম'আর দিন গোসল : হযরত ওসমান (রা) জুম'আর দিন গোসল করাকে অপরিহার্য (ফরয বা ওয়াজিব) মনে করতেন না। তাই তিনি জুম'আর দিন গোসল না করা জায়েয মনে করতেন। আবু হুরাইরা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে—একবার হযরত ওমর (রা) জুম'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন, হযরত ওসমান (রা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। হযরত ওমর (রা) তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—জুম'আর নামাযে আসার সময় কখন? হযরত ওসমান (রা) উত্তর দিলেন—আজ আমি এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, নামাযের আগে বাড়িতেও যেতে পারিনি। আযান শুনে ওযু ছাড়া আর কিছুই করিনি। তিনি বললেন—আপনি শুধু ওযু করেছেন? অথচ আপনি জানেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর দিন গোসলের জন্য বলতেন।[১৯]

হযরত ওসমান (রা) যখন জানতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর দিন গোসল করতে বলতেন। তখন তিনি গোসল না করে শুধু ওযু করে মসজিদে যাওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা দ্বারা গোসল করা অপরিহার্য (ওয়াজিব) মনে করতেন না।

[১.৫] শরীর ঠাণ্ডা কিংবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের জন্য গোসল : এ ধরনের গোসলের জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। যেমন হযরত ওসমান (রা) প্রতিদিন একবার করে গোসল করতেন।[২০]

[১.৬] মৃতকে গোসল দেয়া : মৃতকে গোসল দেয়া জীবিত মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। এ সম্পর্কে গোটা উম্মত ঐকমত্য। তবে শহীদদেরকে গোসল দিতে হবে না।

–('মাওত' শিরোনাম দেখুন)

২. গোসলের বিবরণ

গোসলের সময় শরীরের বাইরের দিকের সমস্ত জায়গায় পানি পৌঁছে দিতে হবে। জানা যায় হযরত ওসমান (রা) মুখের ভেতরের অংশও শরীরের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন, সেজন্য তা ধোয়া জরুরী মনে করতেন। তিনি যখনই জানাবাতের (অপবিত্রতার) গোসল করতেন তখনই তিনবার করে মুখের ভেতর পানি প্রবেশ করিয়ে আঙ্গুল দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে কুলি

www.amarboi.org

করতেন।[২১] হতে পারে তিনি শুধু পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এরূপ করেছেন। যখন তিনি গোসল শেষ করতেন তখন সেখান থেকে যেখানে গোসলের পানি জমে থাকতো, একটু দূরে গিয়ে পা ধুয়ে নিতেন। তেমনিভাবে পায়ে কোনো অপবিত্র জিনিস লেগে গেলেও তিনি পা ধুয়ে ফেলতেন। হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে এক বর্ণনায় এসেছে—তিনি গোসল করার পর গোসলের জায়গা থেকে একটু দূরে গিয়ে পায়ের পাতা দুটো ধুয়ে নিতেন।[২২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে—তিনি গোসলের পর অন্য জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেন তারপর পা ধুতেন।[২৩]

www.amarboi.org

'গ' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১২৫।

২. বাদায়ি 'আস সানায়ি' ফী তারতীবুশ শরায়ি', ৭ম খণ্ড, পৃ-১২৫।

৩. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), গানিমাত, শিরোনাম।

৪. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৩৩১ ; মুসনাদ-ইমাম আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৮১ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩২৮ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪০৭ ; সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল ইমারাহ্; সুনানু নাসাঈ, কিতাবুল ফাই।

৫. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪১৯।

৬. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪২১ ; সীরাত ইবনু হিশাম, বদর যুদ্ধ অধ্যায়।

৭. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩৪।

৮. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), গানিমাত শিরোনাম।

৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৬।

১০. বিস্তারিত দেখুন ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), গিনা শিরোনাম।

১১. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৬৯।

১২. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-২০২।

১৩. আল মুগনী ১ম খণ্ড, পৃ-২০৩।

১৪. আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪।

১৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪৫ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-৭১ ; সুনানু বাইহাকী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪১৭।

১৬. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪।

১৭. আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪ ; ৩য় খণ্ড, পৃ-১৯৮ ; আল মাজমু', ২য় খণ্ড, পৃ-১৪৫ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৫২।

১৮. সহীহ আল বুখারী, ওযু অধ্যায় ; সহীহ মুসলিম, হায়িয অধ্যায় ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫ ; সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৪।

১৯. সহীহ আল বুখারী, জুম'আ অধ্যায় ; সহীহ মুসলিম, জুম'আ অধ্যায় ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-১০১ ; সুনানু আবী দাউদ, তাহারাত অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪০ ; জামি আত তিরমিযি, সালাত অধ্যায় ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮৯ ; ৩য় খণ্ড, পৃ-২২২ ; আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ-৯ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৫।

২০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩১।

২১. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১।

২২. ঐ, পৃ-১২।

২৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-২৬২।

www.amarboi.org

জ

জাদ্দাতুন (جدة)—দাদী

মীরাসে দাদীর অংশ।—(বিস্তারিত জানার জন্য 'ইরছ' শিরোনাম দেখুন)।

জাদ্দুন (جد)—দাদা

মীরাসে দাদার অংশ।—(বিস্তারিত জানার জন্য 'ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

জানাবাত (جنابة)—অপবিত্র অবস্থা/অপবিত্রতা

১. যেসব কারণে জানাবাতের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা নিম্নরূপ—

—হায়িয (বিস্তারিত জানার জন্য 'হায়িয' শিরোনাম দেখুন)

—নিফাস (বিস্তারিত দেখুন, 'নিফাস' শিরোনাম)

—যৌন উত্তেজনায় বীর্যপাত হলে। চাই তা যোনি পথে ঢুকানোর ফলে হোক কিংবা মলদ্বারে। অথবা না ঢুকিয়ে অন্য কোনোভাবে। বিশেষ অঙ্গের মাথা প্রবেশ করানো মাত্র গোসল ফরয হয়ে যায়। বীর্য নির্গত হোক বা না হোক।-(আরো জানার জন্য দেখুন 'গুস্ল' শিরোনাম)

২. জানাবাত অবস্থায় যেসব কাজ নাজায়েয

জানাবাত অবস্থায় নামায পড়া, মসজিদে অবস্থান করা, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা এবং খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করা জায়েয নেই। এ বিষয়ে সাহাবা কিরামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো মতবিরোধ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। হায়িয নিফাস ওয়ালা মহিলাদের সাথে সহবাস করাও জায়েয নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ لا

"হায়িযের ব্যাপারে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন ওটা এক অপবিত্রতাবস্থার নাম। সেই অবস্থায় স্ত্রী থেকে পৃথক থাকবে।"—(সূরা বাকারা ঃ ২২২)

৩. জানাবাত অবস্থা দূর করা

জানাবাত দূর করার জন্য গোসল জরুরী। (গুসল শিরোনাম দ্রষ্টব্য)। যদি পানি না পাওয়া যায় কিংবা পেলেও তা ব্যবহারে অক্ষম হয় তাহলে তায়াম্মুম করে জানাবাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। আমাদের জানামতে একমাত্র হযরত ওমর (রা) এবং তাঁর কিছু সঙ্গী সাথী ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি। সে সম্পর্কে আমরা ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।—(আরো দেখুন তায়াম্মুম শিরোনাম)

জানাযা (جنازة)—লাশ/কফিন

—জানাযার জন্য দাঁড়ানো।—('মাওত' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

–জানাযা বহন করা।–('মাওত' শিরোনাম দেখুন)

–অমুসলিমদের জানাযার (শবদেহের) সাথে মুসলমানদের যাওয়া।

–('মাওত' শিরোনাম দেখুন)

–জানাযার নামায এবং তার বিধান।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

জানীন (جنين)–গর্ভস্থ সন্তান

মায়ের পেটে আছে এখনো ভূমিষ্ট হয়নি এমন সন্তানকে জানীন বলা হয়।

'জানীন এর পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা।

–('সাদাকাতুল' ফিতর শিরোনাম দেখুন)

জামায়াত (جماعة)–ঈমানের নেতৃত্বে নামায আদায় করা/ সংগঠন

–জামায়াতে নামায।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

জাযা (جزا)–বিনিময়

১. সংজ্ঞা

ভালো কিংবা মন্দ কাজের সমান ও অনুরূপ বিনিময়কে জাযা বলা হয়।

২. বিভিন্ন প্রকার জাযার মধ্যে নিচের কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত—

–হুদূদ (বিস্তারিত দেখুন, 'হাদ' শিরোনাম)

–তা'যীর (জানতে হলে দেখুন, তা'যীর শিরোনাম)

–কিসাস (বিস্তারিত 'জিনাইয়া' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

–হেরেমের সীমানায় শিকার করলে তার জাযা (বিনিময়)।–('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

জায়িহাহ্ (جائحة)–আসমানী বিপদ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১. সংজ্ঞা

এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জায়িহাহ্ বলে যা মানুষের ধন-সম্পদকে নষ্ট করে দেয়।

২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।–(আরো দেখুন, 'বায়' এবং 'যামান' শিরোনাম)

জাল্দ (جلد)–চাবুক/বেত

–অবিবাহিত ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করা।–('যিনা' শিরোনাম দেখুন)

–ব্যভিচারীকে রজমের (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের) সাথে সাথে চাবুক মারার শাস্তি।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'যিনা' শিরোনাম)

www.amarboi.org

জাহ্‌ল (جهل)—মূর্খতা/অজ্ঞতা

–হাদ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে 'হাদ' মূলতবী হয়ে যায়।–(দেখুন 'হাদ' শিরোনাম)

–দীনি বিষয়ে চুক্তির পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তা বাতিল হয়ে যায়।
–('বায়' এবং 'ইজারা' শিরোনাম দেখুন)

জি'আলাহ্ (جعالة)—পারিশ্রমিক/মজুরী

১. সংজ্ঞা

কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করিয়ে তার বিনিময়ে প্রদেয় নির্দিষ্ট পারিশ্রমিককে জি'আলাহ বলা হয়। যেমন, বলা হলো কেউ আমার ঘোড়াটিকে ফিরিয়ে এনে দিলে আমি তাকে এতো টাকা দেবো।

২. মুসলিমদের কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনকারীদের বেতন

মুসলিমদের কল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ সম্পাদনকারীদের বেতন প্রদান করা রাষ্ট্রের জন্য জায়েয আছে। যেমন–আযান দেয়া, নামাযে ইমামত করা, কুরআন মজীদ শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি। এজন্য হযরত ওসমান (রা) মুয়াযযিনদের বেতন প্রদান করতেন।[১]

হযরত ওসমান (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুয়াযযিনদের বেতন দিতেন।
–(আরো দেখুন 'ইজারা' শিরোনাম।

৩. অক্ষম গোলাম বাঁদীর ওপর নির্দিষ্ট অংকের টাকা আদায়ের বোঝা চাপানো

হযরত ওসমান (রা) এটি জায়েয মনে করতেন না, কোনো গোলাম বা বাঁদী যারা উপার্জনে অক্ষম তাদেরকে কোনো নির্দিষ্ট অংকের টাকা আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করা। এজন্য তিনি বলতেন—যে গোলাম উপার্জনে অক্ষম তাকে উপার্জনের জন্য চাপ সৃষ্টি করো না। বেশী চাপ দিলে সে যখন কিছুই করতে পারবে না, তখন সে চুরি করবে। তদ্রূপ এরূপ বাঁদীকেও উপার্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করো না, যে বাঁদী কোনো কাজ না জানে সে যখন করার কিছুই পাবে না তখন অপকর্মে লিপ্ত হবে।[২]

জিওয়ার (جوار)—নৈকট্য/প্রতিবেশীত্ব

শুধু প্রতিবেশী হলেই শুফআয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।–('শুফআ' শিরোনাম দেখুন)

জিনাইয়াহ্ (جناية)—অপরাধ

আমরা এখানে জিনাইয়া'র নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. সংজ্ঞা ২. জিনাইয়া'হ্‌র প্রকার ৩. জিনাইয়া'হ্‌র ভিত্তি [৩.১] অপরাধী [৩.২] যার ওপর অপরাধ সংঘটিত হয় [৩.৩] সেই ক্ষতির মাত্রা ৪. জিনাইয়া'হ্‌র প্রভাব ও পরিণতি [৪.১] কিসাস [৪.২] দিয়াত [৪.৩] কাফ্‌ফারা [৪.৪] উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

www.amarboi.org

১. সংজ্ঞা

এমন পদক্ষেপকে জিনাইয়াহ্ বলা হয় যার প্রেক্ষিতে মানুষের জান-মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়।

২. জিনাইয়া'হ্‌র প্রকার

জিনাইয়াহ্ তিন প্রকার। [২.১] ইচ্ছেকৃত [২.২] ইচ্ছে সদৃশ [২.৩] ভুলক্রমে।

[২.১] ইচ্ছেকৃত অপরাধ (জিনায়াতু আমাদ) বলতে বুঝায় এমন কোনো হাতিয়ার বা অস্ত্র দিয়ে কাউকে মারার ইচ্ছে করা যা দিয়ে সাধারণত লোকদেরকে হত্যা করা হয় এবং সেই অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা সংঘটিত হওয়া। ইচ্ছেকৃত হত্যায় কিসাস অপরিহার্য (ওয়াজিব) হয়ে পড়ে। যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ হত্যাকারীকে মাফ করে দেন তাহলে দিয়াত মুগাল্লাযা আদায় করা বাধ্যতামূলক। যা হত্যাকারী নিজ সম্পদ থেকে পরিশোধ করবে।

[২.২] ইচ্ছে সদৃশ অপরাধ (জিনায়াতু শিবহে আমাদ) বলতে বুঝায় কাউকে এমন কিছু দিয়ে হত্যা করার ইচ্ছে করা যা সাধারণত হত্যা কাজে ব্যবহৃত হয় না, যার প্রেক্ষিতে সে মারা যায়।

জিনাইয়াতু শিবহে আমাদ (ইচ্ছে সদৃশ অপরাধ)-এর বেলায় দিয়াত মুগাল্লাযা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। হত্যাকারীর পিতার পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মাঝে কিস্তি করে তিন বছরের মধ্যে তা পরিশোধ যোগ্য। এ ধরনের অপরাধের দিয়াত সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

الا ان دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون فى بطونها اولادها۔

'জিনাইয়াতুল খাতা শিবহিল আমাদ (যা চাবুক কিংবা লাঠির আঘাতে সংঘটিত হয়)-এর দিয়াত একশ' উট। তার মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী থাকতে হবে।'

এছাড়া তাকে কাফ্‌ফারাও আদায় করতে হবে।

[২.৩] জিনিয়াতুল খাতা বা ভুলকৃত অপরাধ বলতে বুঝায়—অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছুর আঘাতে কারো মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যাওয়া।

ভুলক্রমের হত্যা সংঘটিত হলে দিয়াত প্রদান ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) হয়। হত্যাকারীর পিতার পক্ষ থেকে কিস্তির মাধ্যমে এ দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধের সর্বোচ্চ মেয়াদ তিন বছর। সেই সাথে কাফ্‌ফারাও আদায় করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَاً ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط

"কোনো মুমিন অপর মুমিনকে হত্যা করবে এটি বৈধ নয়। ভুলে হয়ে গেলে সে ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলে হত্যা করবে তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে—একজন মুসলমান

www.amarboi.org

ক্রীতদাসকে মুক্তিদান এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ (দিয়াত) প্রদান করা। যদি রক্তপণ মাফ করে দেয় সেতো অন্য কথা।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৯২)

৩. অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা

অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা নিম্নরূপ-

[৩.১] অপরাধী।

[৩.২] যার ওপর অপরাধ সংঘটিত হয়।

[৩.৩] অপরাধের মাত্রা।

নিচে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

[৩.১] অপরাধী

[ক] রাষ্ট্র প্রধানের অপরাধ ঃ অপরাধের ব্যাপারে রাষ্ট্র প্রধানও সাধারণ লোকের চেয়ে ভিন্ন (মর্যাদায়) নন। একজন সাধারণ নাগরিক অপরাধ করলে তার সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে, তদ্রূপ একজন রাষ্ট্র প্রধানের সাথেও ঠিক একই রকম আচরণ করা হবে। জনসাধারণের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করে রাষ্ট্র প্রধান পার পাবেন না। ইমাম যুহুরী (রহ) বলেছেন—হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) খলীফা থাকাবস্থায়ও নিজেদেরকে কিসাসের জন্য উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তাদের থেকে কিসাস গ্রহণ করা হয়নি।[৩]

[খ] অপরাধী অন্ধ হলে ঃ অন্ধ ব্যক্তি তার পথপ্রদর্শকের হাতের পুতুল স্বরূপ। তার যাবতীয় তৎপরতা তারই মর্জি মাফিক পরিচালিত হয়। তার সাথে যারা ওঠেন বসেন তার সম্পর্কেও তিনি বেখবর থাকেন। কাজেই তার চলাফেরা ও তৎপরতার মধ্যে অন্যের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এমনকি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তার থেকে এ আশাও করা যায় না যে, তিনি অপরের ক্ষতি করা থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন। কারণ তিনি দেখতে পান না। তিনি যদি তার পথপ্রদর্শক কিংবা কাছে বসা কোনো লোকের ক্ষতি করে ফেলেন সেজন্য তার থেকে কিসাস নেয়া হবে না। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—কোনো ব্যক্তি যদি অন্ধের সাথে চলাফেরা করে আর অন্ধের দ্বারা তার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়-সেজন্য কোনো কিসাস নেই।[৪]

[গ] পরস্পর ঝগড়া করে একে অপরের ক্ষতি করলে ঃ অনেক সময় লোকজন পরস্পর ঝগড়া করে একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চালায়। যদি তাদের কোনো একজনের ক্ষতি হয়েই যায়, তাহলে কিসাস প্রদান করা বাধ্যতামূলক। কারণ এমতাবস্থায় এ অপরাধ ইচ্ছে সদৃশ অপরাধ (জিনাইয়াতু আমাদ) হিসেবে গণ্য হবে। কেননা উভয়েই উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—যখন দু ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করবে এবং একজন আরেকজনকে আঘাত করে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তার ওপর কিসাস কার্যকরী হবে।[৫]

[ঘ] উত্তেজিত অবস্থায় কোনো অপরাধ করে বসলে ঃ এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—উত্তেজিত অবস্থায় কেউ কোনো অপরাধ করে বসলে তার হুকুম জিনাইয়াতুল খাতা বা ভুলে কৃত অপরাধের মত। এ ক্ষেত্রে কিসাসের পরিবর্তে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা অপরিহার্য হবে। যেমন-আবদুর রহমান ইবনু আবু বকর (রা) বর্ণনা করেছেন—যখন

www.amarboi.org

হযরত ওমর (রা)-কে শহীদ করা হলো, তখন আমি হরমুজান, জুফাইনাহ এবং আবু লুলুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তারা মদীনার একটি মহল্লায় বসবাস করতো। আমাকে দেখেই তারা পালাতে শুরু করলো। আমিও তাদের পিছু নিলাম। দৌড়ানোর এক পর্যায়ে তাদের হাত থেকে একটি খঞ্জর (বড়ো আকারের ছুরি) পড়ে গেলো, যা দুদিকেই ধারালো ছিলো। আমি দেখেই (আমার সাথীদেরকে) বললাম—দেখো, এটি সেই খঞ্জর যা দিয়ে ওমর (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে। লোকজন গিয়ে খঞ্জর দেখে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। যখন উবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) সেই খঞ্জর দেখলেন, তখন তরবারী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং হরমুজান, জুফাইনাহকে হত্যা করলেন, আর আবু লুলুর কিশোরী কন্যাকে পেয়ে তাকেও হত্যা করে ফেললেন। তারপর তলোয়ার উচিয়ে বলতে লাগলেন—আল্লাহর কসম ! আজ মদীনার কোনো গোলাম বা বাঁদী আমার তরবারী থেকে রেহাই পাবে না। এদেরকে ছাড়া আরো কিছু লোককেও হত্যা করতে হবে। আরো কিছু লোক বলতে তিনি কতিপয় মুহাজির সাহাবার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। লোকজন তাকে তলোয়ার ফেলে দেয়ার জন্য চাপ দিলেন। তারা কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। এমন সময় সেখানে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এলেন। তিনি খুব নরম ও স্নেহের স্বরে বললেন—'ভাতিজা ! তরবারীটি আমার কাছে দিয়ে দাও।' তিনি তরবারী দিয়ে দিলেন।

হযরত ওসমান (রা) মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করে তাদেরকে বললেন—আপনারা উবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিন। মতামত দিতে গিয়ে শূরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলো। কতিপয় মুহাজির সাহাবা পরামর্শ দিলেন—তাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হোক। অন্যেরা বললেন—কী আশ্চর্য ! কাল তার পিতাকে শহীদ করা হয়েছে আর আজ তাকে হত্যা করা হবে ? আল্লাহ হরমুজান ও জুফাইনাহ্‌কে ধ্বংস করুন। হযরত ওসমান (রা) চিন্তার গভীরে হারিয়ে গেলেন। পরে সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন উবাইদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) এমন অবস্থায় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, যখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলো না। সে এমন কথা বলছে এবং এমন কাজ করছে তা স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মানুষ করতে পারে না। তার মানসিক অবস্থা এমন ছিলো, যা কিসাস মুলতবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সন্দেহের কারণে হদ এর মত কিসাসও মুলতবী হয়ে যায়।

হরমুজান এবং আবু লুলুর কন্যার কোনো উত্তরাধিকারী ছিলো না। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছিলো। অন্য কথায় হযরত ওসমান (রা) তাদের অভিভাবক ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন কিভাবে এ সমস্যার ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান করা যায়। তাই যারা উবাউদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-কে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে অভিমত দিয়েছিলেন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনারা বলনুতো হরমুজানের অভিভাবক কে ? 'আমীরুল মুমিনীন ! তার অভিভাবক তো এখন আপনি।'—তারা উত্তর দিলেন। এ জবাব শুনে তিনি বললেন—'যদি তাই হয় তাহলে আমি উবাউদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-কে মাফ করে দিলাম।'[৬] যখন নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হত্যাকারীকে মাফ করে দেন তখন কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই হযরত ওসমান (রা) বাইতুলমাল থেকে দিয়াত আদায় করে দেবার নির্দেশ দেন। রইলো জুফাইনার ব্যাপারটি। সে খৃষ্টান ছিলো। কোনো অমুসলিম কোনো মুসলমানের হাতে নিহত হলে সেজন্য মুসলমানকে হত্যা করা যায় না। তাই তিনি উবাইদুল্লাহর পক্ষ থেকে তার দিয়াতও আদায় করে দেন।

www.amarboi.org

উল্লেখ্য যে, হযরত ওসমান (রা) উবাইদুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রা)-এর ব্যাপারে এ দলিল উত্থাপন করেননি যে তিনি উত্তেজনা বশত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাই কিসাস নেয়া যাবে না। এরূপ করলে দীর্ঘ বির্তকের অবকাশ থাকতো। এজন্য তিনি বিতর্কের বিষয় না বানিয়ে অভিভাবকত্বের ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সম্ভবত হযরত ওসমান (রা) প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কারণে এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।-(আরো দেখুন, 'ইমারাত' শিরোনাম)

[ঙ] এক চোখ অন্ধ এমন ব্যক্তি দু চোখ ভালো এমন ব্যক্তির একটি চোখ নষ্ট করে দিলে ঃ এক চোখ অন্ধ এমন ব্যক্তি যদি দু চোখ ভালো এমন ব্যক্তির একটি চোখ নষ্ট করে দেন, সে জন্য তাকে পুরো দিয়াত প্রদান করতে হবে।-(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, 'আওয়ার' শিরোনাম)

[৩.২] যার ওপর অপরাধ সংঘটিত হয়

[ক] কোনো পশু বা প্রাণীর ওপর অপরাধ সংঘটিত করা ঃ কোনো পশু বা প্রাণীর ক্ষতি করা হলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মালিককে সেই পশু বা প্রাণীর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যেমন—হযরত ওকবা ইবনু আমির (রা) থেকে বর্ণিত—হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় এক ব্যক্তি দূর্লভ প্রজাতির একটি কুকুর হত্যা করেন। হযরত ওসমান (রা) সেই বিচারে হত্যাকারীকে আটশ' দিরহাম জরিমানা করেন। যা কুকুরের মূল্য বাবদ মালিককে প্রদান করা হয়। তিনি পুরো টাকাটাই কুকুরের মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন।[৭]

আরেক ব্যক্তি একটি শিকারী কুকুরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা) সেই কুকুরের মূল্য বাবদ ২০টি উট তার মালিককে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৮]

[খ] কোনো মানুষের ওপর অপরাধ সংঘটিত করা ঃ যদি কোনো মানুষকে হত্যা করা হয় কিংবা দৈহিক কোনো ক্ষতিসাধন করা হয়, তাহলে দেখতে হবে সেটি ইচ্ছেকৃত করা হয়েছে, না কি ভুলে। ইচ্ছেকৃত হলে কিসাস ওয়াজিব হবে। সেই অপরাধ হত্যাজনিত হোক কিংবা কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হানি করে হোক। শর্ত হচ্ছে যদি কিসাস গ্রহণের ব্যাপারে অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। কিসাস গ্রহণ করা যদি কোনো অবস্থায়ই সম্ভব না হয় অথবা এমন কিছু কারণ থাকে যে জন্য কিসাসের নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। তাহলে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করা অপরিহার্য।

আর যদি ভুলে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে দিয়াত প্রদান ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

[খ.১] মুসলিম কর্তৃক কোনো অমুসলিমের ক্ষতি সাধন ঃ কোনো মুসলমানের হাতে যদি কোনো অমুসলিম (সে যিম্মি হোক কিংবা না হোক) নিহত হয়, সে জন্য মুসলিম থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ করতে হবে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) কোনো মুশরিককে হত্যা করার কারণে কোনো মুসলমান থেকে কিসাস গ্রহণ করতেন না। তার সময়ে একজন মুসলমান এক যিম্মীকে ইচ্ছে করে হত্যা করেন। সে জন্য তিনি কিসাস গ্রহণ করেননি বরং দিয়াতু মুগাল্লাযা (অর্থাৎ পুরো দিয়াত) প্রদানের নির্দেশ দেন।[৯] যদি কোনো মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা না করে হত্যার চেয়ে কম ক্ষতি সাধন করেন, সে ক্ষেত্রে কিভাবে কিসাস গ্রহণ করা যাবে ? এ সম্পর্কে আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত সংক্রান্ত কোনো বর্ণনা পাইনি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা) কিসাস গ্রহণ করতেন না, তবে দিয়াতের পরিমাণ

www.amarboi.org

বাড়িয়ে দিতেন। সম্ভবত হযরত ওসমান (রা) হযরত ওমর (রা)-এর এ মতের ওপরই বহাল ছিলেন।[১০]

[খ.২] আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে যদি অপরাধ সংঘটিত হয় ঃ যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির জান, মাল, ইজ্জত ও আব্রুর ওপর হামলা করে এবং সেই হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষ নিহত হয়, তার সেই রক্ত বৃথা যাবে। ইমাম ইবনু হাযম আল মুহাল্লীতে বর্ণনা করেছেন—এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ওপর আরেক ব্যক্তিকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে মামলা দায়ের করা হলো। তিনি কিসাস মাফ করে দিলেন।[১১]

অবশ্য যদি অবস্থা এরূপ হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রথমে বাড়াবাড়ি করেছে একথা যদি অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হয় তাহলে তার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা যাবে না এবং তার থেকে কিসাসও নেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে শপথ গ্রহণ করে দিয়াত প্রদানের ফায়সালা দিতে হবে। ইমাম যুহুরী বলেন—আমাকে সুলাইমান ইবনু হিশাম এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন, কোনো মহল্লায় যার লাশ পাওয়া গেছে। মহল্লাবাসীর বক্তব্য রাতের আধারে সে চুরি করতে এসেছিলো। নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের বক্তব্য হচ্ছে—মহল্লাবাসী মিথ্যে বলছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে—তারা সেখানে তাকে আহ্বান করেছিলো, সেখানে সে হাজির হওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ইমাম যুহুরী বলেন—আমি সুলাইমান ইবনু হিশামকে জবাবে লিখেছি—নিহত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন লোক এ মর্মে শপথ করবে 'হত্যাকারীদের বক্তব্য মিথ্যে। নিহত ব্যক্তি চুরি করার জন্য সেখানে যায়নি বরং তারা তাকে ডেকে নিয়েছিলো।' যদি তারা শপথ করেন তাহলে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে। আর যদি তারা শপথ করতে অস্বীকার করেন তাহলে মহল্লাবাসী থেকে পঞ্চাশজনের শপথ গ্রহণ করতে হবে। তারা এ মর্মে শপথ করবেন—'আমাদের এখানে সে রাতের আঁধারে চুরি করতে এসেছিলো। তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে।' ইমাম যুহুরী বলেন—হযরত ওসমান (রা) ইবনু বাকিরাহ্ তাগলুবীর ব্যাপারে এ ধরনের ফায়সালা দিয়েছিলেন। যখন তারা শপথ করতে অস্বীকার করলো তখন তিনি দিয়াত পরিশোধের নির্দেশ দিলেন।[১২]

[খ.৩] গোলাম বাঁদীর ওপর অপরাধ সংঘটিত হলে ঃ এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর রায় ছিলো, গোলাম বাঁদী মানুষের মাল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য গোলাম কিংবা বাঁদীকে হত্যা করলে কিসাস নেয়া যাবে না বরং সেই দাস বা দাসীর মূল্য পরিশোধ করলেই হয়ে যাবে। যেমন আরব বংশভূত এক ছেলে এক বাঁদীকে হত্যা করে। হযরত ওসমান (রা) সেই বিচারে দাসীর মূল্য বাবদ ৫টি উট প্রদানের রায় দিয়েছিলেন।[১৩]

[খ.৪] দু চোখ ভালো এমন ব্যক্তি যদি এক চোখ অন্ধ এমন ব্যক্তির ভালো চোখটি নষ্ট করে দেয় ঃ দু চোখ ভালো এবং দু চোখেই সমানভাবে দেখতে পায় এমন ব্যক্তি যদি এক চোখ অন্ধ ব্যক্তির ভালো চোখটি নষ্ট করে দেয়, সে জন্য তাকে পূর্ণ দিয়াত প্রদান করতে হবে।-(আরো দেখুন, 'আওয়ার' শিরোনাম)

www.amarboi.org

[গ] ক্ষতির মাত্রা ঃ ক্ষতি দু ধরনের। এক. যার পরিণতিতে মানুষের মৃত্যু ঘটে যায়। দুই. যার কারণে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু মৃত্যু সংঘটিত হয় না। উভয় অবস্থায় যদি ইচ্ছেকৃতভাবে এরূপ করা হয় তাহলে কিসাস গ্রহণ করতে হবে। আর যদি ভুলে এরূপ হয়ে থাকে তাহলে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর ফায়সালাসমূহ নিম্নরূপ—

[গ.১] গভীর ক্ষত (মূদিহা) ঃ মূদিহা বলতে এমন জখমকে বুঝায় যা হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ক্ষতস্থান দিয়ে হাড় স্পষ্ট দেখা যায়। যদি ইচ্ছেকৃত এরূপ করা হয় তাহলে কিসাস আবশ্যক। আর যদি ভুলে এরূপ ঘটে যায় তাহলে শালিসির মাধ্যমে তার ফায়সালা করতে হবে। কারণ এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট কোনো নির্দেশ নেই। অবশ্য হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মাথা ও মুখমণ্ডলে এ ধরনের ক্ষতের জন্য পূর্ণ দিয়াতের বিশ ভাগের এক ভাগ (১/২০ অংশ) আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার পরিমাণ পাঁচ উট। যদি শরীরের অন্য কোথাও এরূপ ক্ষত হয় তাহলে যে অঙ্গের জন্য যে পরিমাণ দিয়াত নির্দিষ্ট (যেমন–হাত, আঙ্গুল প্রভৃতি তাহলে ঐ সমস্ত অঙ্গের জন্য যে দিয়াত নির্দিষ্ট) তার ১/২০ অংশ প্রদান করতে হবে।[১৪]

হযরত ওসমান (রা) ও তার খিলাফতকালে হযরত ওমর (রা)-এর এ আইন বহাল রেখেছিলেন এবং এ আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেছেন।

[গ.২] মাঝারী ধরনের ক্ষত (সিমহাক) ঃ সিমহাক বলতে এমন ধরনের ক্ষত বুঝায় যা হাড় পর্যন্ত না পৌঁছুলেও গোশতের মাঝামাঝি যে পাতলা ঝিল্লি থাকে সে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যদি ইচ্ছেকৃত এরূপ করা হয় তাহলে অবশ্যই কিসাস আদায় করতে হবে। আর যদি ভুলে এমনটি ঘটে যায়—শালিসির মাধ্যমে তার ফায়সালা করতে হবে। এ ধরনের জখমের জন্য হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত ওমর (রা) গভীর ক্ষতের জন্য যে দিয়াত নির্দিষ্ট করেছিলেন তার অর্ধেক পরিশোধের কথা বলেছেন। সুনানু বাইহাকীতে আছে—হযরত ওসমান (রা) মাঝারী ধরনের ক্ষতের জন্য গভীর ক্ষতের অর্ধেক দিয়াত পরিশোধের নির্দেশ দিতেন।[১৫]

[গ.৩] এমন আঘাত যাতে পায়খানা নির্গত হয় ঃ মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে—হযরত ওসমান (রা) এমন আঘাত যে আঘাতে পায়খানা বেরিয়ে যায়—সে জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রদানের নির্দেশ দিতেন।[১৬]

ইমাম ইবনু হাযম এবং হাফিয আবদুর রাজ্জাক হযরত ওমর ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু তালহা আলখাযায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন—ইবনু ওকাব নামক মোটাসোটা ও ভূড়ি ওয়ালা এক লোক ছিলো। সে খর্বাকৃতির এক লোকের পেটের ওপর চড়ে দাঁড়িয়েছিলো। ফলে খর্বাকৃতির সেই লোকটি পায়খানা করে দেয়। ওমর ইবনু আবদুল আযীয হযরত সাইয়িদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ)-কে ডেকে এ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। সাইয়িদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ) বললেন—হযরত ওসমান (রা) এ ধরনের মামলায় চল্লিশ দীনার অথবা দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ প্রদানের নির্দেশ দিতেন। হযরত নাফি (রহ) দৃঢ়তার সাথে বলেন—এরূপ ক্ষেত্রে তিনি দিয়াতের একশত ভাগের চল্লিশ ভাগ প্রদানের নির্দেশ দিতেন। তিনি আরো বলেন—এ ক্ষেত্রে দিয়াত স্বরূপ ৪০টি উট প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭]

www.amarboi.org

[গ.৪] ঘুষি বা থাপ্পর মারা ঃ হযরত ওসমান (রা) ঘুষি, থাপ্পর কিংবা চাবুকাঘাত করার প্রেক্ষিতে কিসাসের নির্দেশ দিতেন।[১৮]

৪. জিনাইয়াহ্‌র প্রভাব ও পরিণতি

জিনাইয়ার প্রভাব ও পরিণতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

[৪.১] কিসাস[১]

যদি ইচ্ছেকৃতভাবে অপরাধ করা হয়, তার পরিণতিতে কিসাস ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন ইচ্ছেকৃত হত্যার কারণে কিসাস নেয়া হয়। বিভিন্ন ক্ষতের কারণেও কিসাস নেয়া সম্ভব হলে কিসাস নেয়া হয়। তেমনিভাবে এমন নির্যাতন যার ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয় না (যেমন–থাপ্পর বা ঘুষি মারা কিংবা লাঠিপেটা করা ইত্যাদি) তার জন্য কিসাস অপরিহার্য। যেমন আমরা আগেও বলেছি হযরত ওসমান (রা) দৈহিক নির্যাতনের জন্য কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আরো বলেছি–তিনি আমীরুল মুমিনীন হওয়ার পরও নিজেকে কিসাসের জন্য পেশ করেছেন।

[৪.২] দিয়াত

[ক] নিরপরাধ কোনো লোককে ইচ্ছেকৃত হত্যা করলে, যদি কিসাস মাফ করে দেয়া হয় তাহলে (হত্যার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা বাধ্যতামূলক। যেমন আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি, হযরত ওসমান (রা) নিহত ব্যক্তিদের অভিভাবক হিসেবে উবাইদুল্লাহ ইবুন ওমর (রা)-এর হাতে নিহত হরমুজান ও আবু লুলুর কন্যার কিসাস মাফ করে দিয়াত পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অদ্রূপ ইচ্ছেকৃত হত্যার (কাতলু আমাদ) প্রেক্ষিতে কিসাসের শর্ত পূরণ না হলে অর্থাৎ অপরাধী অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা সে স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধির অবস্থায় না থাকলে দিয়াত পরিশোধ বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর যদি হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছে সদৃশ (কাত্‌লু শিবহি আমাদ) হয় কিংবা ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড (কাত্‌লু খাতা) ঘটে যায় উভয় অবস্থায় দিয়াত পরিশোধ করা অপরিহার্য (ওয়াজিব)।

[খ] দিয়াতের পরিমাণ

দিয়াত দু প্রকার। দিয়াত মুখাফফাফাহ এবং দিয়াত মুগাল্লাযা।

দিয়াত মুখাফফাফাহ্

ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে দিয়াত মুখাফ্‌ফাফাহ্ প্রদান করা অপরিহার্য হয়। দিয়াত স্বরূপ যদি উট প্রদান করা হয়—তার পরিমাণ নিম্নরূপ।[১৯]

–জুযআহ (এমন উট যা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে) ৩০টি।

–বিনতু লাবুন (তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন উটনী) ৩০টি।

–ইবনু লাবুন (তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে এমন উট) ৩০টি।

–বিনতু মাখায (এমন উট শাবক যা দ্বিতীয় বছরে পা দিয়েছে) ৩০টি।

---

১. কিসাস (قصاص)-শব্দটি সুবিচার (Justice), সমান সমান (Sameness) ও অনুরূপ (Similarity) অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী আইনের পরিভাষায় কিসাস সব কটি অর্থের একত্র প্রয়োগকে বুঝায়। আল কুরআনে কিসাস শব্দটি হত্যার শাস্তি স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপক অর্থে কিসাস বলতে বুঝায়–কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে কিংবা কারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট বা অকার্যকর করে দিলে কিংবা কোনোরূপ শারীরিক নির্যাতন করলে বিনিময়ে তাকেও হত্যা করা কিংবা যে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ সে নষ্ট করেছে তার সেই অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে দেয়া অথবা যে ধরনের শারীরিক নির্যাতন (যথা কিল, ঘুষি, লাথি কিংবা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা ইত্যাদি) করা হয়েছে ঠিক সেই ধরনের নির্যাতন তাকেও করা।–অনুবাদক।

www.amarboi.org

যদি দিয়াত দীনারে আদায় করা হয় তাহলে এক হাজার দীনার প্রদান করতে হবে। শামের নাব্‌তী গোত্রীয় এক লোক নিহত হলো। তারা যিম্মী হিসেবে ছিলো। হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে মামলা দায়ের করা হলো। তিনি একজন মুসলমানের দিয়াতের সমান অর্থাৎ এক হাজার দীনার দিয়াত পরিশোধের নির্দেশ দেন।[২০]

আর যদি দিরহামের মাধ্যমে সেই দিয়াত পরিশোধ করা হয় তাহলে দিয়াত বাবদ ১২ হাজার দিরহাম প্রদান করতে হবে। হাজ্জের সময় এক ব্যক্তি এক মহিলাকে ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে ফেলেন। এতে মহিলার পাঁজরের হাড় গুড়ো হয়ে যায়, ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ মামলার রায়ে হযরত ওসমান (রা) ঘোষণা করেন–যেহেতু দুর্ঘনাটি হেরেমের সীমানার মধ্যে ঘটেছে সে জন্য দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{1}{3}$ অংশ) অতিরিক্ত যোগ করে মোট আট হাজার দিরহাম প্রদান করতে হবে।[২১] যদি এক-তৃতীয়াংশ যোগ করে মহিলার দিয়াত আট হাজার দিরহাম হয়, তার মানে একজন মহিলার আসল দিয়াত ছয় হাজার দিরহাম। আর মহিলাদের দিয়াত পুরুষের অর্ধেক। একজন পুরুষের দিয়াত বারো হাজার দিরহাম।

দিয়াত মুগাল্লাযা

এখানে আমরা বর্ণনা করবো, কোন্ অবস্থায় দিয়াত মুগাল্লাযা প্রদান করতে হয় এবং তার পরিমাণ কত।

হযরত ওসমান (রা)-এর মতে নিম্ন বর্ণিত অবস্থায় দিয়াত মুগাল্লাযা প্রদান করতে হয়।

[১] কাতুল আমাদ-এর অবস্থায়

এক মুসলিম এক যিম্মীকে হত্যা করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা) সে জন্য কিসাস নেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি দিয়াত মুগাল্লাযা পরিশোধের রায় দিয়েছিলেন।[২২] এটিকে ভিত্তি করে বলা যায় হযরত ওসমান (রা) যিম্মীর দিয়াত একজন মুসলমানের দিয়াতের সমান নির্ধারণ করেছিলেন।

[২] কাত্‌লু শিবহে আমাদ এর অবস্থায়

হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিতে কাতলু শিবহে আমাদ এর দিয়াত নিম্নরূপ ঃ-

–জুযআহ (এমন উট যা পঞ্চম বছরে পদার্পণ করেছে) ৪০টি।

–হিক্কাহ (এমন উট যা চতুর্থ বর্ষে পা দিয়েছে) ৩০টি।

–বিনতু লাবুন (এমন উটনী যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে) ৩০টি।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিয়াত এর কাঠিন্যের জন্য বেশী বয়সী উট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ থেকেই দিয়াত মুগাল্লাযা ও দিয়াত মুখাফফাহ এর পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

[৩] যদি নিষিদ্ধ মাসে হেরেমের ভেতর অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহলে দিয়াত মুগাল্লাযা প্রদান করতে হবে।[২৩] সেই অপরাধ কোনো মানুষের সাথে সংঘটিত হোক কিংবা কোনো পশুর সাথে। মানুষের সাথে সংঘটিত অপরাধের ধরন ও মাত্রা নিয়ে আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। হাজ্জের সময় এক ব্যক্তি হেরেমের মধ্যে তার ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করে এক মহিলার পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে দেন, ফলে তিনি মারা যান। হযরত ওসমান (রা) হেরেমের মধ্যে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় আট হাজার দিরহাম দিয়াত মুগাল্লাযা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছিলো।[২৪]

www.amarboi.org

হেরেমের মধ্যে পশু হত্যার ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। হাজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন এমন এক ব্যক্তির উটনীকে আরেক ব্যক্তি হেরেমের মধ্যে হত্যা করে। সেই মামালার রায়ে তিনি উটনীর মূল্যের সাথে এক-তৃতীয়াংশ মূল্য আরো অতিরিক্ত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি সম্পর্কে তার নিকট এ রকম আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়েছিলো, যিনি নিষিদ্ধ মাসে একটি পশু পেয়ে তার পশু পালের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কিন্তু পরে সেই পশুটি মারা যায়। হযরত ওসমান (রা) এ মামলার রায়ে—শুর মূল্যের সাথে আরো এক-তৃতীয়াংশ মূল্য অতিরিক্ত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৫]

[৪] কেউ যদি যাবিল আরহামের কোনো ক্ষতি করে সে জন্যও দিয়াত মুগাল্লাযা প্রদান করতে হবে।[২৬]

[গ] লিঙ্গ ভেদে দিয়াতের পরিমাণে পার্থক্য

লিঙ্গ ভেদে দিয়াতের পরিমাণে পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন পুরুষের দিয়াত একজন মহিলার দিয়াতের দ্বিগুণ। এজন্য একজন পুরুষের দিয়াত যদি বারো হাজার দিরহাম হয় তাহলে একজন মহিলার দিয়াত ছয় হাজার দিরহাম। আমরা অবশ্য এ সম্পর্কে ওপরে আলোচনা করেছি, হযরত ওসমান (রা) সেই অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। যেমন–তিনি হেরেমের ভেতর ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিহত মহিলার দিয়াত নির্ধারণ করেছিলেন আট হাজার দিরহাম যা মূল দিয়াতের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ বেশী ছিলো। তদ্রূপ অগ্নিপূজক মহিলাদের দিয়াতও তিনি পুরুষের অর্ধেক নির্ধারণ করেছিলেন।[২৭]

[ঘ] স্বাধীন এবং গোলামীর কারণে দিয়াতের পরিমাণে পার্থক্য

স্বাধীন একজন পুরুষের দিয়াত একশ' উট কিংবা এক হাজার দীনার কিংবা বারো হাজার দিরহাম কিন্তু একজন গোলামের দিয়াত তার মূল্যের সমান। তদ্রূপ একজন গোলাম বা বাঁদীর কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দিয়াত তার মূল্যের আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হয়। যেমন হযরত ওসমান (রা) এক বাঁদীর অঙ্গহানী করার অপরাধে এক আরব যুবককে দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) স্বরূপ পাঁচটি উট প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৮]

[ঙ] দীনি পার্থক্যের কারণে দিয়াতের পার্থক্য

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি, একজন স্বাধীন মুসলমান পুরুষের দিয়াত একশ' উট কিংবা এক হাজার দীনার কিংবা বারো হাজার দিরহাম। কিন্তু আহলে কিতাবদের ব্যাপারটি আলাদা। একজন আহলে কিতাব স্বাধীন পুরুষের দিয়াত (যাকে ভুলে হত্যা করা হয়) চার হাজার দিরহাম।[২৯] হযরত ওমর (রা)-এর সময়ও একজন স্বাধীন আহলে কিতাব পুরুষকে ভুলে হত্যা করলে তার দিয়াত এরূপ ছিলো। কিন্তু যদি স্বাধীন কোনো আহলে কিতাব পুরুষকে অন্য কোনো আহলে কিতাব ইচ্ছেকৃত হত্যা করে, তার দিয়াত স্বাধীন মুসলমান পুরুষের দিয়াতের সমান।

–অগ্নিপূজক পুরুষের দিয়াত আট শ' দিরহাম এবং অগ্নিপূজক মহিলাদের দিয়াত তার অর্ধেক।[৩০]

–অগ্নিপূজকদের দিয়াতের এ পরিমাণ হযরত ওমর (রা) নির্ধারণ করেছিলেন।[৩১]

www.amarboi.org

[৪.৩] কাফ্‌ফারা

কাত্‌লু খাতা বা ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে দিয়াতের সাথে সাথে কাফ্‌ফারাও প্রদান করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط .(النساء : ٩٢)

"আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলে হত্যা করে ফেলবে তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে—একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্তির ব্যবস্থা করা এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়াত প্রদান করা। যদি তারা মাফ করে দেয় তবে ভিন্ন কথা।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯২)

প্রশ্ন হতে পারে ভুলক্রমে হত্যা ছাড়াও যদি অন্য কোনো অবস্থায় হত্যাকাণ্ড ঘটে যায় তাহলে কাফ্‌ফারা প্রদান বাধ্যতামূলক কিনা ? তো আমরা এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত সম্বলিত কোনো বর্ণনা পাইনি।

[৪.৪] উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে যদি কারো মৃত্যু ঘটে যায়, চাই সে মৃত্যু ইচ্ছেকৃত ঘটানো হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত। উভয় অবস্থায় নিহত ব্যক্তির মীরাস থেকে হত্যাকারী বঞ্চিত হবে।–(বিস্তারিত জানতে হলে 'ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

জিয্‌ইয়া (جزية)–জিযিয়া

১. সংজ্ঞা

যিম্মী ও তাদের দাস দাসীর প্রতি ইসলামী রাষ্ট্র যে সেবা প্রদান করে, তার বিনিময়ে যে কর (Tax) নির্ধারণ করা হয় তাকে জিয্‌ইয়া বলে।

২. জিয্‌ইয়ার বিধান

যখন হযরত ওসমান (রা) খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন জিযইয়া সম্পর্কে যেসব নীতিমালা পূর্ববর্তী খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর সময় গৃহীত হয়েছিলো। তিনি সেসব নীতিমালা হুবহু সেভাবেই রেখে দেন।[৩২]

আহলে কিতাবদের সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্র সেসব অমুসলিম শহরবাসীর কাছ থেকেও জিয্‌ইয়া আদায় করতো যাদেরকে শহরে বসবাসের অনুমতি দেয়া হতো এবং যাদের সাথে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের চুক্তি ছিলো।

যখন ইমাম যুহ্‌রীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো—যারা আহলে কিতাব ছিলো না সেইসব অমুসলিমদের থেকে কি জিযইয়া গ্রহণ করা হতো ? তিনি হাঁ সূচক উত্তর দিয়ে বললেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইনের অধিবাসী থেকে জিয্‌ইয়া গ্রহণ করেছেন। হযরত ওমর (রা) ইরাকের শহরতলীতে যারা বসবাস করতেন তাদের থেকেও জিয্‌ইয়া নিয়েছেন। আর হযরত ওসমান (রা) বারবার অঞ্চলের অমুসলিম অধিবাসী থেকে জিয্‌ইয়া গ্রহণ করেছেন।[৩৩] নাসর ইবনু আসিম হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন নবী করীম

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিনজন খলীফা—হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) অগ্নি উপাসকদের থেকেও জিয্‌ইয়া গ্রহণ করতেন।[৩৪]

জিহাদ (جهاد)—আল্লাহর পথে সংগ্রাম-লড়াই

১. জিহাদের কারণ

জিহাদ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ

[১.১] যদি কোনো গোত্র মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তারপর সেই চুক্তি তারা লংঘন করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যাবে। হযরত ওসমান (রা) ইস্‌কান্দিয়ার অধিবাসীরা চুক্তি ভঙ্গ করার পর তাদের বিরুদ্ধে হিজরী ২৫ সনে যুদ্ধ করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা)-এর নির্দেশে ২৫ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর নেতৃত্বে তাদেরকে আক্রমণ করা হয়। যুদ্ধে এলাকা মুসলমানদের দখলে চলে আসে কিন্তু শহর দখলে আসে সন্ধির মাধ্যমে।[৩৫]

[১.২] অদ্রূপ সন্ধি চুক্তি হয়েছে এমন জনগোষ্ঠী যদি সন্ধির কোনো শর্তের বিপরীত কাজ করতে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা যাবে। যেমন হযরত ওসমান ইবনু আফফানের সময় ২৪ হিজরীতে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়াবাসীর বিরুদ্ধে সন্ধির শর্ত ভঙ্গের কারণে [হযরত ওমর (রা) তাদের সাথে সন্ধি করে গিয়েছিলেন] হযরত ওয়ালীদ ইবনু ওকবা (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।[৩৬]

২. যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

যদি কোনো সাহসী মহিলা জিহাদের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চান, তাহলে তিনি স্বামীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে ২৮ হিজরীতে হযরত উবাদা ইবনু সামিত (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হারাম বিনতু সালমান (রা) তার স্বামীর সাথে 'কাবরাস' এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩৭]

৩. জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য পিতামাতার অনুমতি নেয়া।

–(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'ইসতিযান' শিরোনাম)

৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো

যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিতে কবীরাহ গুনাহ। কারণ এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ج وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○ (الانفال : ١٦،١٥)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন পেছনে হটবে না। যে পেছন ফিরে পালাতে চেষ্টা করলো সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়েই যেন ফিরে গেল। তার

www.amarboi.org

ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর সেটি নিকৃষ্ট আবাসস্থল। তবে যে যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ করতে গিয়ে কিংবা নিজ সৈন্যদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিছু হটে আসবে তাদের কথা ভিন্ন।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ১৫-১৬)

এ আয়াতে কারীমা সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে এ নির্দেশ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং এ নির্দেশ সবসময়ের জন্য।[৩৮]

৫. সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি

যদি প্রতিপক্ষ জিয্‌ইয়া প্রদানের শর্তে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করতে চায় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের উচিত তাদের সাথে সন্ধি করা। হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে বার্ষিক ৩৩ লাখ দিরহাম জিয্‌ইয়া দেয়ার শর্তে সাবরবাসীদের সাথে সন্ধি করা হয়েছিলো।[৩৯]

৬. যুদ্ধের ময়দানে নামায কসর করা

শত্রু পক্ষের মুখোমুখি অবস্থায় মুজাহিদগণ নামায কসর পড়বেন, যেভাবে সফরের সময় করা হয়। অর্থাৎ চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামায দু রাকায়াত পড়তে হবে। হযরত ওসমান (রা) বসরার অধিবাসীকে লক্ষ্য করে পত্র লিখেছিলেন—'আমি জানতে পারলাম আপনারা ছাগল চড়াতে গেলে কিংবা বেচাকিনি করতে গেলে অথবা ঘুরাফেরা করতে গেলেও নামায কসর পড়েন।* প্রকৃতপক্ষে কসর নামায তো তাদের জন্য যারা ভীতিকর অবস্থায় আছে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের মুকাবেলা করছে।[৪০]

৭. যুদ্ধবন্দী এবং গানিমাতের মাল

-(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-'আসরুন', 'গানিমাত' এবং 'সাবিয়্যু' শিরোনাম)

জুনূন (جنون)—পাগলামী

১. সংজ্ঞা

স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত অবস্থাকে জুনূন বলে।

২. জুনূন বা পাগলামীর প্রভাব ও পরিণতি

[২.১] জুনূন অবস্থায় শারীরিক ইবাদাত এবং আহকামে শরী'আহ যেমন-নামায, রোযা, হাজ্জ ইত্যাদি মূলতবী হয়ে যায় এবং শরী'আহ কর্তৃক নির্ধারিত সাজা যেমন-হাদ্, কিসাস ইত্যাদিও প্রয়োগ করা যাবে না। এ বিষয়ে সকল উম্মাহ্ ঐকমত্য।-(আরো দেখুন, 'হাদ' শিরোনাম)

[২.২] তেমনিভাবে জুনূন অবস্থায় বলা কথা, চুক্তি, কিংবা চুক্তি প্রত্যাহার কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি বেচাকিনি, ভাড়া, দান বা হিবা সবকিছুই বাতিল বলে গণ্য হবে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—জুনূন এবং মাতাল অবস্থায় দেয়া তালাক ছাড়া যে কোনো ধরনের তালাক কার্যকরী হয়ে যাবে।-(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'তালাক' শিরোনাম)

* এখানে সফরের কথা উল্লেখ করেননি। তাই বলে মনে করা যাবে না তিনি সফরের সময় নামায কসর করা পছন্দ করতেন না। সফরের অবস্থায় নামায কসর পড়তে হবে তা বসরার লোকজনও জানতেন। এখানে সফর ছাড়াও আরো দুটো অবস্থায় কসর পড়া যায় সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।—অনুবাদক

www.amarboi.org

[২.৩] অবশ্য মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব জুনূনের কারণে মূলতবী হয়ে যায় না। যেমন–স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করা কিংবা কোনো জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেয়া পাগলের ওপরও অপরিহার্য, যেভাবে একজন সুস্থ মানুষের ওপর অপরিহার্য হয়।

[২.৪] পাগলের লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ।–(বিস্তারিত দেখুন 'হাজর' শিরোনাম)

জুম'আ (جمعة)–জুম'আর নামায/জুম'আবার

–জুম'আর দিন গোসল করা।–('গুসল' শিরোম দেখুন)

–জুম'আর নামাযের সময়।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–জুম'আর আযান।–('আযান' শিরোনাম দেখুন)

–জুম'আর নামাযের খুতবা।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–একই দিনে যদি জুম'আ এবং ঈদ হয় তাহলে ঈদের নামায পড়লে জুম'আ পড়তে হবে কি ?–(দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

জুলূস (جلوس)–বসা

হযরত ওসমান (রা) বসার সময় এক পা আরেক পায়ের ওপর রাখতেন।[৪১]

www.amarboi.org

'জ' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. সুনানু বাইহাকী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪২৯ ; কাশফুল গুম্মাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮।
২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৮।
৩. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫০ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭১।
৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪২১ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৬ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৯৮।
৫. কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪৩ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৯৮।
৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬২ ; আল মুহাল্লী ; ১১শ খণ্ড, পৃ-১১৪।
৭. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৫২৪।
৮. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭।
৯. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৩ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৯৬ ; নাইলুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫১ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৪৯ ; আল ই'তিবার, পৃ-১৯০; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৬৫২, ৭৯৫ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭৫।
১০. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম।
১১. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫২।
১২. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৬৬।
১৩. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬।
১৪. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম।
১৫. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮৩ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১১২ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৮৩৫।
১৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৪ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪৫৯ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১১২ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৮৩৫।
১৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৪ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৪৫৯।
১৮. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৮, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬।
১৯. কিতাবুল খারাজ, আবী ইউসুফ, পৃ-১৮৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭৪ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১১১-১১৩।
২০. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৩ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৯৫।
২১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৯৮ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৯৬।
২২. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৩ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-৯৫-৯৬, কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০৪ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৯৩, ৭৯৫।
২৩. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৭২।
২৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৯৮, সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭১, ৯৫ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৯৬ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৭২।
২৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩০২ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩২৫।
২৬. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৭২।
২৭. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৯৬।
২৮. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬।
২৯. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১০০ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৯৩।
৩০. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৭৯৬।
৩১. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম।
৩২. ফিকহে আবু বকর সিদ্দীক্ব (রা) ও ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম।
৩৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৯ ; ১০ম খণ্ড, ৩২৬ ; আহকামুল কুরআন-আল জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯৩।
৩৪. আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯৩।

www.amarboi.org

৩৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫১।

৩৬. ঐ পৃ-১৪৯।

৩৭. ঐ পৃ-১৫৩ ; আল ইসাবাহ-ইবনু হাজার আসকালানী।

৩৮. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৯৩।

৩৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫১।

৪০. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫২১ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা ; ১ম খণ্ড, পৃ-১১২ ; সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৩৭।

৪১. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-২২৩।

www.amarboi.org

ত

তআম (طعام)–খাদ্য

১. সামুদ্রিক প্রাণী

যেসব প্রাণী পানির মধ্যে থাকে সেগুলো যদি মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবু তা খাওয়া হালাল। যেমন–মাছ ও অন্যান্য প্রাণী। কিন্তু এমন প্রাণী যা পানিতে থাকে আবার পানির বাইরেও থাকে, এ ধরনের প্রাণী মারা গেলে তা খাওয়া জায়েয নেই। যেমন–ব্যাঙ।[১]

২. মুশরিকদের যবেহকৃত প্রাণী

অমুসলিমদের মধ্যে একমাত্র আহলে কিতাব ছাড়া আর কারো যবেহকৃত প্রাণী খাওয়া জায়েয নেই। তদ্রূপ মুশরিক ও অগ্নি উপাসকদের যবেহ করা প্রাণী না খাওয়ার ব্যাপারেও ইজমা হয়েছে।–(দেখুন 'কিতাবী' শিরোনাম)

৩. ইহরাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তির শিকার কিংবা তার জন্য শিকার করা হয়েছে এমন প্রাণী

ইহরাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তির শিকার করা প্রাণী খাওয়া জায়েয নেই। তদ্রূপ মুহরিম ব্যক্তির জন্য এটিও জায়েয নেই যে, সে অন্যের শিকার করা প্রাণীর গোশত খাবে। অবশ্য অন্যেরা গাইর মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা প্রাণীর গোশত খেতে পারেন।

–(আরো দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

৪. হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি কেউ ইহরাম অবস্থায় বন মোরগ, কবুতর, টিড্ডি, বটের প্রভৃতি প্রাণী শিকার করতেন, তাহলে হযরত ওসমান (রা) তার জন্য ফিদইয়া বাধ্যতামূলক করে দিতেন।–('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন), কারণ তিনি মনে করতেন এগুলো এমন ধরনের শিকার, যার গোশত খাওয়া যায়। যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় না, ইহরাম অবস্থায় সেগুলো শিকারের কথা তো চিন্তাও করা যায় না।

তইর (طير)–পাখী

পাখী চুরি করার কারণে হাত কাটা যাবে না।–('সিরকাহ' শিরোনাম দেখুন)

তাওবাহ্ (توبة)–অনুশোচনা/প্রত্যাবর্তন

১. মানুষ কোনো অপরাধ করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসাকে তাওবা বলে।

২. তাওবার দ্বারা সকল গুনাহ (এমনকি নর হত্যার অপরাধও) মাফ হয়ে যায়। সুনানু বাইহাকীকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন–

আমীরুল মুমিনীন ! আমি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছি, আমার তাওবা কবুল হবে কি ? জবাবে হযরত ওসমান (রা) সূরা গাফির (বা আল মুমিন)-এর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন।

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ

الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ (الغافر : ١-٣)

www.amarboi.org

"হা-মীম। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সবজান্তা। পাপ মার্জনাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থবান। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"–(সূরা আল গাফির ঃ ১-৩)

তারপর সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন–

اِعْمَلْ وَلَا تَيْأَسْ

"তুমি নিরাশ হয়ো না, আমল করতে থাকো।"

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এমন কোনো অপরাধ যদি সংঘটিত হয়, যা কারো অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে তাওবার সাথে সাথে তার অধিকারও ফিরিয়ে দিতে হবে। অথবা তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

তাওয়াফ (طواف)–কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করা

নিয়ত করে নির্দিষ্ট নিয়মে খানায়ে কা'বা চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'হাজ্জ' শিরোনাম)

তাক্‌ফীন (تكفين)–কাফন পরানো

ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর কাফন।–(দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

তাক্‌বীর (تكبير)–'আল্লাহু আকবার' বলা

–নামাযে তাক্‌বীরে তাহরীমা বলা।–('সালাত' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

–নামাযে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা।
–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–ঈদ এবং ইসতিস্‌কার নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর।–(দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

–জানাযা নামাযের তাকবীর।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

তাক্‌বীল (تقبيل)–চুমো দেয়া

–রোযাদার ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে চুমো দেয়।–('সিয়াম' শিরোনাম দেখুন)

–মুহরিম ব্যক্তির জন্য স্ত্রীকে চুমো দেয়া নিষিদ্ধ।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

তাকরার (تكرار)–বারবার করা

১. তাকরার অর্থ কোনো কাজ বারবার করা।

২. শরঈ কোনো নির্দেশ বারবার লংঘন করলে শাস্তির কাঠিন্য করা।–('আশরাবাহ' ও 'তাযীর' শিরোনাম দেখুন)

তাক্‌লীদ (تقليد)–অমুসলিমদের অনুকরণ

অমুসলিমদের অনুকরণ করা।–(বিস্তারিত দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম)

www.amarboi.org

তাকাল্লুম (تكلم)–কথাবার্তা বলা

–ওযুর সময় কথাবার্তা বলা মাকরূহ।–(দেখুন 'ওযু' শিরোনাম)

–কথাবার্তার কারণে নামায নষ্ট হয়ে যাওয়া।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

তাখ্‌লীল (تخليل)–খেলাল করা

তাখ্‌লীল অর্থ খিলাল করা, অর্থাৎ এক জিনিসের ভেতর অন্য জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া।

ওযুর সময় দাড়ি খেলাল করা।

–(বিস্তারিত জানার জন্য 'ওযু' এবং 'লিহ্‌ইয়াহ' শিরোনাম দেখুন)

তাখাত্‌তুম (تختم)–আংটি পরা

পুরুষের জন্য রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। যদি সেই আংটিতে কারুকাজ করা হয় তাও জায়েয আছে। এটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খচিত যে আংটি ব্যবহার করতেন তাও ছিলো রূপার তৈরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সেই আংটি হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে ছিলো, তারপর হযরত ওমর (রা)-এর হাত হয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর হাতে এসে পৌছে। অতপর হিজরী ৩০ সনে তাঁর হাত থেকে সেটি আরীস নামক কূপে পড়ে যায়। হযরত ওসমান (রা) সেই আংটির তল্লাসীর জন্য অনেক টাকা খরচ করেন কিন্তু তা আর পাওয়া যায়নি। তিনি অনুরূপ আরেকটি আংটি বানিয়ে তার ওপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খুদাই করে নেন। হযরত ওসমান (রা)-এর ইন্তিকালের পর সেই আংটিও কোথায় যেন হারিয়ে যায় কিংবা কে বা কারা নিয়ে যায় তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।[২]

সম্ভবত হযরত ওসমান (রা) একাধিক আংটি বানিয়ে রাখতেন। তাঁর ছেলে আমর ইবনু ওসমান এবং উম্মু আমর (যিনি ইযদ গোত্রের কন্যা ছিলেন) বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এমন একটি আংটি ছিলো যার ওপর 'আমানতু বিল্লাযী খালাকা ফাসাওওয়া' খুদাই করা ছিলো।[৩]

বাম হাতের আঙ্গুলে আংটি পরা জায়েয আছে। হযরত ওসমান (রা) বাম হাতের আঙ্গুলে আংটি পরতেন।[৪]

তাখাল্লী (تخلى)–মলত্যাগ করা/পায়খানায় যাওয়া

হযরত ওসমান (রা) যে কাপড় পরে মসজিদে যেতেন, সেই কাপড় পরে পায়খানায় যেতেন না।[৫]

তাগ্‌রীব (تغريب)–দেশ থেকে বহিষ্কার করা/নির্বাসন

১. সংজ্ঞা

তাগ্‌রীব অর্থ কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা বা নির্বাসনে পাঠানো।

২. ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া।–('যিনা' শিরোনাম দেখুন)

–তাযীর হিসেবে কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা।–('তাযীর' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

তাগ্‌লীয (تغليظ)–কঠিন করা/মজবুত করা

–কা'বার নিকট গিয়ে শপথ করে শপথকে আরো মজবুত করা।–(দেখুন 'কাযা' শিরোনাম)

–অপরাধ বার বার করলে সে জন্য শাস্তির কাঠিন্য করা।

–('আশরাবাহ্' এবং 'তাযীর' শিরোনাম দেখুন)

তাগলীস (تغليس)–রাতের শেষ ভাগে কোনো কাজ করা

১. সংজ্ঞা

রাতের শেষ ভাগে যখন আঁধার হাল্কা হয়ে আসে তখন কোনো কাজ করাকে তাগ্‌লীস বলে।

২. ফযর নামাযে তাগলীস।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'সালাত' শিরোনাম দেখুন)

তাতাইয়্যুব (تطيب)–সুবাসিত হওয়া/সুগন্ধি ব্যবহার

মুহ্‌রিম ব্যক্তির সুগন্ধি ব্যবহার।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'ইহ্‌রাম' শিরোনাম দেখুন)

তাতাব্বু' (تطوع)–অতিরিক্ত/নফল

১. সংজ্ঞা

বাধ্যতামূলক (ফরয) কাজ শেষ করার পর স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কাজ করার বৈধতাকে তাতাব্বু' বলে।

২. নফল নামাযের নির্দেশ।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–নফল রোযার বিধান।–('সিয়াম' শিরোনাম দেখুন)

–নফল সাদাকাত বা দান খয়রাতের বর্ণনা।–('সাদাকাত' শিরোনাম দেখুন)

–সফর কালিন সময়ে নফল ইবাদাত ছেড়ে দেয়ার অনুমোদন।–('সফর' শিরোনাম দেখুন)

তাদ্‌বীর (تدبير)–মৃত্যুর পর গোলামকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দেয়া

কোনো ব্যক্তি তার গোলামের স্বাধীনতাকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখাকে তাদ্‌বীর বলা হয়।

তান্‌ফীল (تنفيل)–অতিরিক্ত দেয়া/পুরস্কার

১. তান্‌ফীল অর্থ আমীরের পক্ষ থেকে গানিমাতের মাল হতে কোনো সৈনিককে তার পাওনার অতিরিক্ত কিছু প্রদান করা।

২. জিহাদের আগ্রহ সৃষ্টি এবং শত্রু সৈন্যের মুকাবেলায় উৎসাহ প্রদানের জন্য তানফীল জায়েয। খুলাফা-ই-রাশিদীনের মধ্যে সবাই [হযরত ওসমান (রা) ও তাদের সাথে শামিল] এ ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিতেন। হযরত ওসমান (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনু সা'দ ইবনু আবী সুরাহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আফ্রিকায় সেনা অভিযান চালানোর জন্য এবং বলেছিলেন বিজয় লাভ করলে গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ তান্‌ফীল হিসেবে প্রদান করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সেই অভিযানে সফলতা দান করেছিলেন। তিনি আফ্রিকা বিজয়

www.amarboi.org

করলেন। তারপর তিনি খুমূসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিজে রেখে অবশিষ্ট চার ভাগ (অবশিষ্ট গানিমাত) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যেন সমস্ত মালে গানীমাতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারেন।[৬]

–(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন–'গানিমাত' শিরোনাম)

তান্‌শীফ (تنشيف)–কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে শরীর মুছে শুকানো

হযরত ওসমান (রা) ওযুর পর শরীর মুছে ফেলা জায়েয মনে করতেন।[৭] বর্ণিত আছে—তিনি একবার ওযু করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে শুকিয়ে নিয়েছিলেন।[৮] প্রকৃতপক্ষে তিনি সবসময়ই এরূপ করতেন।[৯]–(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'ওযু' শিরোনাম)

তাফ্‌বীয (تفويض)–হস্তান্তর/ক্ষমতা প্রদান

–অভিভাবক তার মেয়ের বিয়েতে অন্য কাউকে অভিভাবকত্ব প্রদান করতে পারেন।

–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

তাফ্‌রীক (تفريق)–পৃথক করা

বিস্তারিত জানার জন্য 'তালাক' শিরোনাম দেখুন।

তাব্‌যীর (تبذير)–অপব্যয়

১. তাব্‌যীর অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা।

২. অপব্যয়কারীকে বাধা দান।–('হিজর' শিরোনাম দেখুন)

তাবার্‌রু' (تبرع)–নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু দেয়া/দান

১. কেউ তার নিজের কোনো জিনিস কোনোরূপ বিনিময় বা প্রতিদান ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে দেয়ার নাম তাবাররু'।

২. তাবার্‌রু' অনেক প্রকার। নিচে কয়েক প্রকারের পরিচয় দেয়া হলো ঃ

[২.১] হিবা ('হিবা' শিরোনাম দেখুন)।

[২.২] সাদাকাত ('সাদাকাত' শিরোনাম দেখুন)।

[২.৩] ওসিয়্যত ('ওসিয়্যত' শিরোনাম দেখুন)।

[২.৪] ওয়াকফ্ (বিস্তারিত জানার জন্য 'ওয়াকফ্' শিরোনাম দেখুন)।

৩. তাবার্‌রু'র সমস্ত প্রকারের মধ্যে যে কোনো প্রকার তখনই কার্যকর হয় যখন তাবার্‌রু'কৃত বস্তুটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয়ত্বে চলে যায়। যেমন এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—সাদাকাত তখনই কার্যকরী হবে যখন সাদাকাতের বস্তুটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয়ত্বাধীন হয়ে যাবে।[১০]

তামাত্তু (تمتع)–কল্যাণ লাভ করা/তামাত্তু হাজ্জ

তামাত্তু অর্থ হাজ্জের মাসে প্রথমে ওমরা করা এবং তারপর হাজ্জ করা।

–('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

তাযাইয়্যুন (تزين)–সুন্দর করা/সাজানো

(কারু কাজের মাধ্যমে) কুরআন শরীফকে সুন্দর করা।

–(বিস্তারিত দেখুন 'কুরআন' শিরোনাম)

তা'যীর (تعزير)–শাস্তি প্রদান

১. সংজ্ঞা

এরূপ শাস্তিকে তা'যীর বলা হয় যা বিচারক কোনো অপরাধের কারণে নির্দিষ্ট করে থাকেন এবং শরী'আহ যে অপরাধের শাস্তির মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

২. হাদ ও তা'যীর একত্রে প্রয়োগ

হযরত ওসমান (রা)-এর মতে প্রয়োজনে হাদ এবং তা'যীর একই সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন তিনি অভ্যস্ত এক মাদক সেবীকে একই সাথে হাদ এবং তাযীর প্রয়োগও করেছেন। চল্লিশ ঘা হাদ স্বরূপ এবং অবশিষ্ট চল্লিশ ঘা তাযীর স্বরূপ মেরেছেন। মোট আশি ঘা চাবুক মেরেছেন। পদস্খলনের কারণে (এক আধদিন) মাদক দ্রব্য সেবন করতেন এরূপ লোকদেরকে তিনি চল্লিশ ঘা এর বেশী মারতেন না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শুধু হাদ প্রয়োগ করতেন।–(আরো দেখুন 'আশরাবাহ', 'হাদ' এবং 'রিককুন' শিরোনাম)

৩. তা'যীর কখন প্রয়োগ করতে হয়

এমন অপরাধের জন্য তা'যীর প্রয়োগ করা হয়, যে জন্য শরী'আহ্ কোনো হাদ নির্দিষ্ট করে দেয়নি। যেমন–যাদু করা, ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা, অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, এমন খেলাধূলা যা নাজায়েয, এমন পাত্রে নাবীয তৈরী করা যেসব পাত্র ব্যবহার করতে ইসলাম নিষেধ করেছে কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো কাজ। তাছাড়া সন্দেহের কারণে যদি হাদ প্রয়োগ সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রেও তা'যীর প্রয়োগ জরুরী।

৪. তা'যীর কিভাবে প্রয়োগ করা উচিত

তা'যীর এমনভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যেন অপরাধী অপরাধ জগত থেকে ফিরে আসে এবং ভবিষ্যতে সেই অপরাধে পুনরায় লিপ্ত না হয়। বিচারক চিন্তাভাবনা করে এর মাত্রা নির্ণয় করবেন।

[৪.১] চাবুক মেরে কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করে অথবা সতর্ক করার মাধ্যমেও তা'যীর হতে পারে।–(আরো দেখুন 'সারিকাহ' শিরোনাম)

[৪.২] তা'যীরকে কার্যকর করার আরেক পথ হচ্ছে অপরাধের উপায় উপকরণকে নষ্ট করে দেয়া। যেমন বর্ণিত আছে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো যার কাছে লাউয়ের খোল ছিলো এবং সেখানে নাবীযও বর্তমান ছিলো। ওসমান (রা) তাকে চাবুক মারলেন এবং নাবীয মাটিতে ফেলে দিলেন এবং পাত্রটিকে টকুরো টুকরো করে ফেললেন।[১১]–(আরো দেখুন 'আশরাবাহ' শিরোনাম)

তিনি একবার বলেছিলেন–'হে লোক সকল! তোমরা জুয়া ও লটারী থেকে বিরত থাকো। (এখানে জুয়া বলতে তিনি পাশা খেলাকে বুঝিয়েছেন) আমি জানতে পেরেছি তোমাদের ঘরে

www.amarboi.org

জুয়ার কোর্ট রয়েছে। যাদের কাছে সেগুলো আছে তারা যেন তা জ্বালিয়ে দেয় অথবা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে।' তারপর আবার একদিন বলেছিলেন 'আমি তোমাদেরকে জুয়ার কোর্ট নষ্ট করে ফেলতে বলেছিলাম। কিন্তু তোমরা তা নষ্ট করতে রাজী হওনি। তাই আমি ইচ্ছে করেছি লোকদেরকে লাকড়ির বোঝা সংগ্রহ করার নির্দেশ দেবো। তারপর লোক পাঠাবো ঘর তল্লাশীর জন্য। যে ঘরে জুয়ার কোর্ট পাওয়া যাবে ঘরসহ তা জ্বালিয়ে দেবো।'[১২]

[৪.৩] বিচারক ইচ্ছে করলে তাযীরের মাত্রা এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে পারেন যা হাদ-এর সমান। ইয়াহইয়া ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হাতিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—যখন আমার পিতা আবদুর রহমান ইবনু হাতিব ইন্তিকাল করলেন, তখন তিনি এমন সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে গিয়েছিলেন, যারা নামায রোযা করতো। তার মধ্যে এমন একজন বাঁদী ছিলো যে নামায রোযা করতো সত্যি কিন্তু অনারব হওয়ার কারণে দীনি ইল্‌ম ছিলো না। তাছাড়া যে জিনিস তাকে পেরেশান করে তুলেছিলো, সেটি তার গর্ভ। সে ছিলো অকুমারী। ইয়াহইয়া ইবনু আবদুর রহমান উপায়ান্তর না দেখে হযরত ওমর (রা)-এর নিকট গিয়ে সবকিছু খুলে বললেন। তিনি তাকে বললেন—তুমি এমন ব্যক্তি যে ভালো কোনো খবর নিয়ে আসোনি। অতপর তিনি বাঁদীকে ডেকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করলেন। বললেন—তুমি কি সত্যিই গর্ভবতী ? সে উত্তর দিলো—হাঁ, আমি মারউশের দ্বারা গর্ভবতী। সে আমাকে এ কাজের জন্য দুটো দিরহাম দিয়েছে। সেই সময় হযরত ওমর (রা)-এর কাছে হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাদেরকে বললেন— আপনারা এ সম্পর্কে আমাকে পরামর্শ দিন। হযরত ওসমান (রা) বসাছিলেন, শুয়ে পড়লেন। হযরত আলী (রা) এবং আবদুর রহমান (রা) বললেন—সে হাদ এর উপযুক্ত হয়ে গেছে। তখন হযরত ওমর (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন—এবার আপনার পরামর্শ দিন। তিনি বললেন—এ সম্পর্কে তো দুজনের মতামত শুনলেন। ওমর (রা) আবার বললেন—আপনি আপনার মতামত দিন। হযরত ওসমান (রা) বললেন—আপনি দেখলেন না সে যেভাবে বলে বেড়াচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সে তার অপরাধের মাত্রা সম্পর্কে একেবারেই বেখবর। হাদ তো শুধু তার ওপরই প্রয়োগ করা যায়, যে ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে জানে। তখন হযরত ওমর (রা) বাঁদীকে একশ' ঘা বেত লাগিয়ে দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি হযরত ওসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন—আপনি বিলকুল ঠিক বলেছেন। সেই সত্তার কসম ! যার হাতে আমার জীবন, হাদ্ শুধু ঐ ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করা চলে যে অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে অবগত থাকে।[১৩] হযরত ওসমান (রা) হযরত ওমর (রা)-এর একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করেননি।

[৪.৪] তা'যীর হিসেবে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া যায়। হযরত নাফি' (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর রেফারেন্সে বর্ণনা করেছেন—উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা)-এর এক বাঁদী ছিলো, যে তাকে যাদু করেছিলো। এমনকি পরে সে কথা স্বীকারও করেছে। তখন হাফসা (রা) আবদুর রহমান ইবনু কায়িস (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্য। তিনি তাকে হত্যা করে দিলেন। হযরত ওসমান (রা) এ পদক্ষেপের কথা শুনে অপছন্দ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) বললেন—যে মহিলা উম্মুল মুমিনীনকে যাদু করেছে এবং একথার সত্যতাও স্বীকার করেছে আপনি সেই মহিলার জন্য উম্মুল মুমিনীনের এ পদক্ষেপকে অপছন্দ করছেন ? অতপর হযরত ওসমান (রা) চুপ করে রইলেন।

www.amarboi.org

[৪.৫] হেরেম শরীফের মধ্যে পড়ে থাকা কোনো বস্তু কেউ ওঠিয়ে নিলে তার ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত হিসেবে তা'যীর প্রয়োগ।–('লুকতাহ' শিরোনাম দেখুন)

৫. এমন মোকদ্দমার বর্ণনা, যেখানে হযরত ওসমান (রা) তা'যীর প্রয়োগ করেছেন

আমরা ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এমন কিছু মোকদ্দমার বর্ণনা করেছি যেখানে হযরত ওসমান (রা) তা'যীর প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনার কারণে তা'যীর প্রয়োগ করতেন।[১৪] তাছাড়া তিনি শরাবের পাত্র ব্যবহারের অপরাধেও তা'যীর প্রয়োগ করেছেন।–('আশরাবাহ' শিরোনাম দেখুন)

তায়ামুন (تيامن)-ডান হাত দিয়ে করা

হযরত ওসমান (রা) পছন্দনীয় যাবতীয় কাজ ডান হাত দিয়ে করতেন। অন্যান্য কাজের জন্য তিনি বাম হাত ব্যবহার করতেন। ওকবাহ ইবনু সাহবান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ওসমান (রা)-কে বলতে শুনেছি যেদিন ডান হাত দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, আমি সেইদিন থেকে ডান হাত দিয়ে আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।[১৫]

তার্‌কাহ (تركة)—মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ/মীরাস

১. তার্‌কাহ বলতে সেই মালকে বুঝায় যা কোনো ব্যক্তি রেখে মারা যান এবং যে সম্পদের মধ্যে আর কারো অধিকার থাকে না।

২. তার্‌কাহ থেকে মৃত ব্যক্তির কাফন দাফন ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

তার্‌তীব (ترتيب)—ধারাবাহিকতা

শারীরিক ইবাদাতের সময় তার্‌তীব ঠিক রাখা ওয়াজিব। ওযুও তার মধ্যে একটি।
–('ওযু' 'সালাত' এবং 'হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

তা'রীফ (تعريف)—ঘোষণা করা

হারানো বস্তু প্রাপ্তির ঘোষণা।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'লুকতাহ' শিরোনাম)

তা'রীয (تعريض)—কটাক্ষ করা/প্রশ্ন উত্থাপন

১. বক্তা তার কথা এমনভাবে উপস্থাপন করে, শ্রোতা তা সরাসরি না বুঝে কৌশলে বুঝে নেয়। এরূপ কথাকে তা'রীয বলা হয়।

২. কটাক্ষর ভঙ্গিতে কোনো অপবাদ বা গালি দিলে তার শাস্তি।
–(বিস্তারিত জানার জন্য 'কাযফ' শিরোনাম দেখুন)

তাল্‌কীন (تلقين)—শেখানো

১. তাল্‌কীন অর্থ কাউকে কোনো কিছু শেখানো।

www.amarboi.org

২. নামাযী কুরআন তিলাওয়াতে ভুল করলে তাকে লুকমা দেয়া।

-('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

তাল্‌বিয়া (تلبية)—সাড়াদান

নিম্নোক্ত কথাগুলোকে তাল্‌বিয়া বলে ঃ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ

"আমি হাজির। হে আল্লাহ ! আমি হাজির। আমি হাজির, আপনার কোনো অংশীদার নেই আমি হাজির। নিসন্দেহে যাবতীয় প্রশংসা, নিয়ামত আপনার জন্য। রাজত্বও আপনার। রাজ্য পরিচালনায় আপনার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির।"

-হাজ্জ এবং ওমরার সময় তালবিয়া পাঠ।-('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

-হাজ্জের সময় কখন তালবিয়া পাঠ শেষ করতে হয়।-('হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)।

তালাক (طلاق)—বিবাহ বিচ্ছেদ

১. সংজ্ঞা

তালাক বলতে বুঝায় দাম্পত্য সম্পর্ককে শেষ করে দেয়া।

২. তালাক প্রদানাকারী

তালাক তখনই কার্যকর হবে যখন তালাক প্রদানকারীর মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাবে।

[২.১] তালাক প্রদানকারী ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা মহিলার স্বামী হবেন কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক প্রদানের অধিকার প্রাপ্ত হবেন অথবা তিনি স্বামীর ওলী বা অভিভাবক হবেন।

[ক] তালাক প্রদানকারী ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা মহিলার স্বামী হবেন। একথার অর্থ স্বামী সেই ব্যক্তি, যার হাতে বিয়ের বন্ধন থাকে।

[খ] রইলো সেই ব্যক্তির তালাকদানের অধিকার যাকে স্বামীর পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তো এটি কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন—স্বামী নিজে তার স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করতে পারেন, স্ত্রী চাইলে নিজের তালাক নিজেই নিতে পারেন। এরও কয়েকটি অবস্থা আছে। যেমন—স্ত্রীকে সরাসরি নিজের তালাক নিজেই নেবার অধিকার হস্তান্তর করে দেয়া কিংবা এমন অবকাশ দেয়া যাতে সে চাইলে স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে, আবার চাইলে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান করতে পারে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ সে চাইলে স্ত্রী হিসেবে থাকবে আর না চাইলে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাবে। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—এ ব্যাপারে (ক্ষমতা প্রদানের পর) স্ত্রী যা করবে তা ঠিক হবে।[১৬]

[গ] স্বামীর ওলী বা অভিভাবকের মাধ্যমে তালাক প্রদানের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা প্রকারান্তরে বিচারকের ক্ষমতাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ বিচারক বা প্রশাসক

www.amarboi.org

সাধারণভাবে মুসলমানের ওলী বা অভিবাবক হিসেবেই বিবেচ্য হন। সেই অধিকার বলেই কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে তিনি তার স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন।[১৭]

তেমনিভাবে তিনি একজন নপুংসক স্বামী থেকেও তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে পারেন।[১৮] তদ্রূপ যে গোলাম নিজেকে স্বাধীন বলে ধোঁকা দিয়ে কোনো স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করে, বিচারক তাদের মধ্যেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়ার অধিকার রাখেন।

এ সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

[২.২] দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—তালাক প্রদানকারী ব্যক্তি সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হবেন। জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এমন ব্যক্তির তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ পাগল হয়ে গেছে কিংবা এ ধরনের কোনো কারণে স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছে—যেমন মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের হয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় মাদকদ্রব্য সেবন করুক কিংবা কেউ তাকে জোর করে সেবন করিয়ে দিক। এজন্য হযরত ওসমান (রা) মাতাল অবস্থায় তালাক দিলে তা গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না।[১৯] হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—মাতাল এবং পাগলের তালাক ছাড়া সকলের তালাকই কার্যকরী হয়ে যায়।[২০] কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—মাতাল অবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক গ্রহণযোগ্য নয় এবং মাতাল অবস্থায় গোলাম বাঁদী মুক্ত করে দিলে তাও কার্যকর হবে না।[২১]-(আরো দেখুন 'আশারাবাহ্' শিরোনাম)

[২.৩] আরেকটি শর্ত হচ্ছে, তালাক প্রদানকারী বালেগ হতে হবে। না বালেগের তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর দ্বারা তালাক দাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কাজেই এ পদক্ষেপ কেবল সেই নিতে পারে যে পরিপক্ক জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী। নাবালিগরা সেই ধরনের পরিপক্ক জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারী হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কে আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর কোনো অভিমত জানতে পারিনি।

[২.৪] মারজুল মাওতের তালাকের ব্যাপারে বক্তব্য হচ্ছে—মারজুল মাওতের অবস্থায় তালাক দিলে তা কার্যকরী হবে। অবশ্য এর পরিণতিতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তার স্বামীর ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা এ অবস্থায় তালাক দেয়ার প্রকাশ্য কারণ একটিই হতে পারে, তাকে সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা। সে জন্য তার ইচ্ছেকে নষ্ট করে দিয়ে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মীরাশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।-(আরো দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

[২.৫] ক্রীতদাসের তালাক

যদি তালাকদাতা গোলাম বা মুকাতাব গোলাম হয়, তাহলে সে মাত্র দুটো তালাক প্রদান করতে পারে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

৩. তালাকের সংখ্যা

[৩.১] একজন স্বাধীন পুরুষ তার স্ত্রীকে (চাই সে স্বাধীন হোক কিংবা দাসী) সর্বোচ্চ তিনটি তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। তার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার এ আয়াত-

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ صلے فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط(البقرة : ٢٢٩)

"তালাক দুটো। অতপর স্ত্রীকে রাখবে না হয় ভালোয় ভালোয় বিদায় করে দেবে।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

www.amarboi.org

[৩.২] একজন গোলাম বা ক্রীতদাস তার স্ত্রীকে সর্বসাকুল্যে দুটো তালাক দিতে পারে। স্ত্রী স্বাধীন বা দাসী যা-ই হোক না কেন। হযরত আয়িশা (রা)-এর এক গোলাম তার স্বাধীন স্ত্রীকে দু' তালাক দিয়েছিলো, তো হযরত ওসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন—সে যেন তার স্ত্রীর কাছে আর না যায়।[২২]

সেই সাথে তিনি এও বলেছিলেন যে, তালাকের সম্পর্ক পুরুষের সাথে এবং ইদ্দতের সম্পর্ক মহিলার সাথে।[২৩]

মুকাতাব সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে—যতক্ষণ সে তার চুক্তির শেষ কিস্তি পরিশোধ না করবে ততক্ষণ সে দাস হিসেবেই বিবেচিত হবে। এজন্য মুকাতাবও একজন গোলামের মত সর্বোচ্চ দু' তালাক প্রদানেরই অধিকার রাখে। দু' তালাক প্রদানের পর তার স্ত্রী চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

যেমন হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর মুকাতাব গোলাম নাফী তার স্বাধীন স্ত্রীকে দু' তালাক দিয়েছিলো তখন কতিপয় লোক চেষ্টা করেছিলেন যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় কিন্তু হযরত ওসমান (রা) ও হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন —ঐ মহিলা তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে।[২৪]-(আরো দেখুন, 'রিক্‌কুন' শিরোনাম)

যদি মুকাতাবের স্ত্রীও বাঁদী হয় এবং সে তাকে দু' তালাক দেয় তাহলে তার স্ত্রীও সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবে। পুনরায় যদি তাকে কিনে নিজের মালিকানাভুক্ত করে নেয় তবু তার সাথে সহবাস করা বৈধ হবে না।[২৫]-(আরো দেখুন 'রিক্‌কুন' শিরোনাম)

৪. তালাকের ভাষা

[৪.১] **সরীহ্ তালাক (স্পষ্ট ভাষায় তালাক দেয়া) ঃ** যদি স্পষ্ট ভাষায় তালাক দেয়া হয় তাহলে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তালাকদাতার নিয়ত কী ছিলো। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—তালাকের ইচ্ছে মনের মধ্যে গোপন রাখা পর্যন্ত তালাক কার্যকরী হয় না। বরং মুখে ভাষায় প্রকাশ করলেই তা কার্যকর হয়।[২৬]

এ প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—তালাক মহিলাদের ওপর কার্যকর হয় কোনো পুরুষের ওপর হয় না। এজন্য ততক্ষণ তা কার্যকরী হয় না যতক্ষণ তা নির্দিষ্ট করে দেয়া না হয়। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে— أنا منك طالق "আমি তোমার থেকে তালাক গ্রহণ করলাম।"

অথবা তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীকে প্রদানের পর বললো- أنت طالق "তোমাকে তালাক।"

তো একথার প্রেক্ষিতে তালাক সংঘটিত হবে না। আবার যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো পুরুষকে তালাক দেয় তবু তালাক হবে না। কারণ তালাক কার্যকর হয় মহিলাদের ওপর।[২৭]

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ের ঘটনা। মুহাম্মদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবু বকর (রা) তার স্ত্রী রমীসা ফারাসিয়াকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণ করে রেখেছিলেন। তিনি তাকে বললেন- أنت طالق ثلاث مرات "তোমাকে তিনবার তালাক দেয়া হলো।"

এ মামলার রায়ে হযরত ওসমান (রা) বললেন—মহিলা এরূপ বলে ভুল করেছে। কারণ মহিলাতো তালাক দিতে পারে না (বরং তালাক গ্রহণ করতে পারে)।[২৮]

www.amarboi.org

[৪.২] **তিন তালাক দেয়া ঃ** আমরা দেখেছি হযরত ওসমান (রা) তালাকের ব্যাপারে ঐসব বাক্যকে যা তালাকদাতা তালাকের সময় বলে থাকেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব রাখতেন। তাঁর মতে তালাকদাতা তালাক প্রদানের সময় যে কটি তালাকের উল্লেখ করেন ঠিক সেই কটি তালাক-ই কার্যকরী হয়ে যায়। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললো—আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম, তাহলে তিন তালাক-ই কার্যকর হবে।

মুয়াবিয়া ইবনু আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত—এক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন—তিন তালাক দেয়ার পরই তো তোমার স্ত্রী তোমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে।[২৯]

তদ্রূপ অন্য এক ব্যক্তি এসে বললেন—আমি আমার স্ত্রীকে একশ' তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন—তিন তালাকেই তোমার স্ত্রী তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ৯৭টি বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩০]

[৪.৩] যদি কেউ স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে 'তুমি আমার জন্য হারাম' সেটি তালাক হবে না, যিহার হবে।–(বিস্তারিত দেখুন, 'যিহার' শিরোনাম)

[৪.৪] স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা স্বামীর জন্য জায়েয আছে। যদি স্ত্রীকে এ সুযোগ দেয়া হয় আর ঐ মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বেই তিনি তা ব্যববহার করতে না পারেন, তাহলে মজলিস শেষ হয়ে গেলে এ অধিকার আর অবশিষ্ট থাকে না। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে কিন্তু স্ত্রী সুযোগ কাজে লাগানোর পূর্বেই মজলিস শেষ হয়ে যায় এবং স্বামী স্ত্রী সেখান থেকে ওঠে অন্যত্র চলে যায়, তাহলে তালাক প্রদানের ক্ষমতা পুনরায় স্বামীর নিকট ফিরে আসে।[৩১]

[৪.৫] **খুলা' ঃ** যদি কোনো ব্যক্তি খুলা'র ভিত্তিতে তার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে সেই খুলা'কে এক তালাক গণ্য করা হবে। অবশ্য খুলা'র সময় যদি স্বামী স্পষ্টভাবে তালাকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে যে ক'টি তালাকের নিয়ত করবে সেই কটি তালাক-ই কার্যকর হবে।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'খুলা' শিরোনাম দেখুন)

[৪.৬] ঈলার অবস্থায় নির্দিষ্ট চার মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এমনিই তালাক কার্যকরী হয়ে যায়।–(বিস্তারিত দেখুন 'ঈলা' শিরোনাম)

[৪.৭] গোলাম কিংবা বাঁদী বিক্রি করে দিলে যদি সেই গোলাম বা বাঁদী বিবাহিত হয় তাহলে সেই বাঁদী এবং গোলামের স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকরী হয় না।
–(আরো দেখুন 'বায়' শিরোনাম)

৫. পুরুষত্বহীনতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ

যদি স্বামী পুরুষত্বহীন হোন এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে না পারেন, তাহলে স্ত্রীর অধিকার রয়েছে স্বামীর অক্ষমতার কারণে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করে মামলা দায়ের করার। মামলা দায়ের করার পর বিচারক ঐ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য এক বছরের অবকাশ দেবেন। যদি সেই সময়ের মধ্যে তিনি স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হন তাহলে স্ত্রী তারই থাকবে অন্যথায় বিচারক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।[৩২]

www.amarboi.org

৬. স্বামী নিরুদ্দেশ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ

যদি কোনো মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তাহলে তিনি চার বছর পর্যন্ত স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবেন। অতপর তিনি বিধবার ইদ্দত পালন করে অন্যত্র বিয়ে করতে পারবেন।

–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'মাফকূদ' শিরোনাম)

৭. প্রতারণা কিংবা মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ের ঘটনা। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা)-এর এক গোলাম, উট চড়াতো। সে প্রতারণা করে নিজেকে স্বাধীন বলে এক স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করে। সে এ ব্যাপারে আবু মূসা আশয়ারী (রা)-এর অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন মনে করেনি। মহিলাকে উটের বাথান থেকে পাঁচটি উটও মোহরানা স্বরূপ প্রদান করে। পরে ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। তখন আবু মূসা আশয়ারী (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে মামলা দায়ের করেন। হযরত ওসমান (রা) এ মামলার রায়ে সেই বিয়েকে বাতিল করে দেন এবং দুটো উট সেই মহিলাকে প্রদান করার নির্দেশ দেন। অবশিষ্ট তিনটি উট আবু মূসা আশয়ারী (রা)-কে ফেরত দেন।[৩৩]

সম্ভবত হযরত ওসমান (রা) সেই ফায়সালা দিয়েছিলেন এ নীতির ভিত্তিতে যে, গোলামের বিয়ে কিংবা তালাক মালিকের ইচ্ছেধীন। তিনি চাইলে বিয়ের অনুমতি দিতে পারেন আবার চাইলে তাদের বিয়ে বাতিলও করতে পারেন। (এ ব্যাপারটি আল্লাহই ভালো জানেন)

আবার এ কারণেও তিনি সেই বিয়ে বাতিল করে থাকতে পারেন, কেননা সে একজন স্বাধীন মহিলার সাথে প্রতারণা করে বিয়ে করেছিলো।

আর উটের ব্যাপারে যে রায় দিয়েছিলেন তা ঐ মহিলার মোহরানা বাবদ হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'ইসতিযান' শিরোনাম দেখুন)

৮. তালাক মুগাল্লাযা প্রদানের পর পূর্ব স্বামীর জন্য সেই স্ত্রী বৈধ কিনা ?

যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেন তাহলে সেই স্ত্রী পূর্ব স্বামীর জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না যতক্ষণ সেই স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিয়ে করে তার থেকে তালাক নিতে না পারবেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط ـ(البقرة : ٢٢٩ـ٢٣٠)

"তালাক দুটো। অতপর হয় তাকে রেখে দেবে, না হয় তাকে ভালোয় ভালোয় বিদায় করবে। তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো সেগুলো ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ

www.amarboi.org

নয়। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর সীমা লংঘনের ভয় করে এবং মনে করে যে তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নেয়—তাতে কোনো দোষ নেই। এটি হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালংঘন করবে তারা যালিম। তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয় তবে সেই স্ত্রী যে পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ না করবে তার জন্য হালাল হবে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯-২৩০)

৯. তালাকে ফিরার

তালাকে ফিরারের কারণে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে (মীরাসের) অংশ পাবেন।

-(বিস্তারিত দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

তালাফুন (تلف)—নষ্ট করা/নষ্ট হওয়া

বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে পৌছুবার আগেই বিক্রেতার কাছে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যাওয়া।-(বিস্তারিত 'বায়' শিরোনাম দেখুন)

তাশাব্বাহ (تشبه)—অনুকরণ

অন্য কারো অনুকরণ করা।-(বিস্তারিত জানার জন্য 'তাকলীদ' শিরোনাম দেখুন)

তাস্‌বীক (تسويك)—মিসওয়াক করা

বিস্তারিত জানার জন্য 'ইসতিয়াক' শিরোনাম দেখুন।

তাসলীম (تسليم)—সালাম দেয়া

১. 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' বলাকে তাসলীম বলা হয়।

২. নামাযের শেষে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ' বলা।

-('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

৩. ওযু করার সময় সালাম দেয়া।-('সালাম' শিরোনাম দেখুন)

৪. খতীব মিম্বারে বসে লোকদেরকে সালাম দেয়া।

-('খুতবা' এবং 'সালাম' শিরোনাম দেখুন)

তাসারুরুফুন (تسرى)—বাঁদীর সাথে সহবাস করা

১. সংজ্ঞা

তাসাররুফুন অর্থ নিজের মালিকানাধীন বাঁদীর সাথে সহবাস করা।

২. বাঁদীর সাথে সহবাসের শর্তাবলী

নিম্ন বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বাঁদীর সাথে সহবাস বৈধ ঃ

[২.১] বাঁদীর সাথে সহবাস করতে চাইলে বাঁদী এককভাবে তার মালিকানাধীন হতে হবে। [অন্য কেউ বাঁদীর মালিকানায় শরীক থাকলে সেই বাঁদীর সাথে সহবাস করা যাবে না।]

www.amarboi.org

[২.২] বাঁদীর যদি স্বামী না থাকে। স্বামী থাকলে তার সাথে সহবাস করা যাবে না যতক্ষণ স্বামী তাকে তালাক না দেয় এবং সে ইদ্দত পালন না করে। বর্ণিত আছে—আবদুল্লাহ ইবনু আমির (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে একজন বাঁদী দিয়েছিলেন, যাকে বসরা থেকে কেনা হয়েছিলো এবং তার স্বামী ছিলো। হযরত ওসমান (রা) বললেন—আমি তার কাছে যেতে পারি না যদি তার স্বামী তাকে তালাক না দেয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আমির (রা) সেই বাঁদীর স্বামীকে গিয়ে রাজী করালেন তাকে তালাক দেয়ার জন্য। সে তালাক দিয়ে দিলো।[৩৪]

[২.৩] এমন দুজন বাঁদীর সাথে একই সময়ে সহবাস করা যাবে না যাদের একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের দুজনের মধ্যে পরস্পর বিয়ে হতে পারে না। হযরত ওসমান (রা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো দু বোনকে একত্রে বাঁদী হিসেবে রাখা যাবে কি ? অর্থাৎ এক বোনের সাথে সহবাস করে তাকে নিজ মালিকানায় রেখে একই সময়ে অন্য বোনকে মালিকানাভুক্ত করে তার সাথেও সহবাস করতে পারবে কি ? হযরত ওসমান (রা) বললেন—এক আয়াত অনুযায়ী বাঁদী হিসেবে দু বোনের সাথেই সহবাস করা জায়েয।[৩৫] অন্য আয়াত অনুযায়ী হারাম। তবে আমি এরূপ করা পছন্দ করি না।[৩৬] যদি কোনো ব্যক্তি বাঁদী হিসেবে এক বোনের সাথে সহবাস করে এবং অন্য বোনও তার মালিকানাধীন থাকে তাহলে অন্য বোনের সাথে ততক্ষণ সহবাস করা জায়েয হবে না যতক্ষণ সহবাসকৃত বোনকে দান করে না দেয় কিংবা বিক্রি না করে অথবা মুক্তি না দেয়। দু বোনকে যেমন একত্রে বিয়ে করা যায় না এ ব্যাপারটিও ঠিক তেমন।

ইমাম শু'রানী কাশফুল গুম্মাহ্‌য় লিখেছেন—হযরত ওসমান (রা)-কে এমন এক বাঁদী ও তার মেয়ে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো—যারা একই মালিকানাভুক্ত হওয়ার কারণে উভয়ের সাথে সহবাস করা হয়েছে। তিনি বললেন—একই মালিকানাধীন এরূপ দুজন মহিলার সাথে সহবাস করাকে আমি নিষিদ্ধ করা পছন্দ করি না।[৩৭]

[২.৪] তালাকে বাইন প্রদানের পর পুরোপুরি পৃথক করা না হলে এবং সেই সময় অপর স্বামীর সাথে বিয়েও যদি না হয়, (তার সাথে সহবাস করা যাবে না।) যেমন হযরত ওসমান (রা)-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যিনি বাঁদীকে বিয়ে করেছিলেন, তারপর তাকে দু তালাক দিয়েছেন এবং পুনরায় কিনে নিয়েছেন। নতুন মালিকানার ভিত্তিতে তার সাথে সহবাস করা যাবে কি ? তিনি জবাব দিলেন, যতক্ষণ সেই বাঁদী অন্য কাউকে বিয়ে না করবে (এবং সে তালাক না দেবে) ততক্ষণ তার সাথে সহবাস করা জায়েয নয়।[৩৮]

৩. সহবাসের প্রভাব ও পরিণতি

বাঁদীর সাথে সহবাসের প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ—

[৩.১] বাঁদীর সাথে সহবাস করলে হুরমতে মুসাহারাত (বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম) প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেমন আমরা ওপরে ইমাম শু'রানী সংকলিত রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছি। যেখানে বলা হয়েছে, হযরত ওসমান (রা)-কে মা ও মেয়ে যদি একই মালিকের অধীনে বাঁদী হিসেবে থাকে এবং মালিক যদি উভয়ের সাথে সহবাস করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে হযরত ওসমান বলেছিলেন—তাদের দুজনকে হারাম করা আমি পছন্দ করি না।

www.amarboi.org

[৩.২] মালিক তালাকপ্রাপ্তা বাঁদীর সাথে সহবাস করলেও পূর্ব স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যায় না।–(আরো দেখুন 'তাহলীল' শিরোনাম)

তাহ্‌কীম (تحكيم)-ফায়সালা করা

১. সংজ্ঞা

তাহকীম অর্থ মামলায় উভয় পক্ষ (বাদী-বিবাদী) কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ফায়সালাকে মেনে নেয়া।

২. তাহ্‌কীমের বৈধতা

যে কোনো ধরনের ঝগড়া-বিবাদে তাহ্‌কীমের বৈধতা রয়েছে। ঝগড়া-বিবাদ যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হয়, সেখানে তাহ্‌কীম ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا○(النساء : ٣٥)

"তোমাদের মধ্যে যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর সংসার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে একজন বিচারক স্বামীর পক্ষ থেকে এবং একজন বিচারক স্ত্রীর পক্ষ থেকে, তারা দুজন বসে মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। আল্লাহও তাদের একটি ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং খবর রাখেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৫)

৩. বিচারকের ফায়সালাকে মেনে নেয়া

কাউকে বিচারক নিয়োগের পর উভয় পক্ষের উচিত তার রায়কে মেনে নেয়া। যদি কোনো এক পক্ষ তার রায়কে মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক নিয়োগ করার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে—হযরত আকীল ইবনু আবী তালিব (রা) এবং তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতু ওতবা ইবনু রবি'আর মধ্যে কোনো একটি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়। ফাতিমা তার কাপড় ঠিক করতে করতে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এসে হাজির হন এবং পুরো ঘটনা খুলে বলেন। হযরত ওসমান (রা) তার স্বামীর পক্ষের আত্মীয় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)-কে এবং স্ত্রীর পক্ষের আত্মীয় মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রা)-কে বিচারক মনোনীত করেন এবং বলেন, তোমরা যদি ভালো মনে করো তাহলে উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করে দেবে। আর যদি উভয়কে পৃথক করে দেয়াই সমুচীন মনে করো তাহলে পৃথক করে দেবে। তারা আকীল ইবনু আবী তালিবের (রা) বাড়ির দিকে রওয়ানা করলেন। পথে ইবনু আব্বাস (রা) বললেন—আমি তাদের দু'জনকে পৃথক করে দেবো। মুয়াবিয়া (রা) বললেন—আমি বানু আবদে মুনাফের দুজন বয়স্ক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করাবো না। উভয়ে কথা বলতে বলতে আকীল ইবনু আবী তালিবের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন বুঝতে পারলেন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে। তারা ভেতর থেকে দরোজা বন্ধ করে রেখেছেন।[৩৯]

তাহদীদ (تهديد)—ভীতি প্রদর্শন করা

যদি উলিল আমর মনে করেন ভয় দেখালে কিংবা ধমক দিলে শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে তাহলে তাকে ধমকানো কিংবা ভয় দেখানো জায়েয আছে। যেমন আমরা

www.amarboi.org

দেখি হযরত ওসমান (রা) যারা পাশা খেলতেন এবং পাশার কোর্ট যাদের কাছে ছিলো তাদেরকে তিনি হুমকী দিয়েছিলেন—যদি তারা পাশার কোর্ট ছিড়ে টুকরো টুকরো না করে তাহলে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। আমরা তা'যীর শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে, তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

'হে লোক সকল ! তোমরা জুয়া ও পাশা খেলা থেকে বিরত থাকো। আমি জানতে পারলাম তোমাদের ঘরে জুয়া ও পাশার কোর্ট রয়েছে। কাজেই যার ঘরে তা রয়েছে সে যেন সেগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে কিংবা জ্বালিয়ে দেয়।'

তার কিছুদিন পর আবার লোকদেরকে উদ্দেশ করে বললেন—

'হে লোক সকল ! আমি তোমাদেরকে জুয়া ও পাশার কোর্ট ছিড়ে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি দেখছি এখনো তোমরা তা করোনি। আমি ইচ্ছে করেছি লাকড়ির বোঝা সংগ্রহ করার নির্দেশ দেবো। তারপর লোকদের বাড়িতে পাঠাবো। যার ঘরে সেগুলো পাওয়া যাবে সে ঘরে যেন আগুন লাগিয়ে দেয়।[৪০]

তাহ্‌রীম (تحريم)—স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়া

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়া।

–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন–'তালাক' এবং 'জিহার' শিরোনাম)

তাহ্‌লীল (تحليل)—হালাল করা

১. সংজ্ঞা

যে মহিলাকে তালাকে মুগাল্লাযা দেয়া হয়েছে, কেউ তাকে এজন্য বিয়ে করলো যাতে সে আগের স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়, একে তাহ্‌লীল বলা হয়।

২. তাহ্‌লীলের প্রকার ও বিধান

একজন পুরুষ তালাকপ্রাপ্তা কোনো মহিলাকে বিয়ে করলে তা তিনভাবে হতে পারে।

[২.১] তিনি স্থায়ীভাবেই বিয়ে করবেন। তার নিয়ত এমন হবে না যে, তিনি বিয়ে করার পর তালাক দিয়ে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করে দেবেন। কিংবা অস্থায়ীভাবে বিয়ে করে ক'দিন পর তাকে তালাক দিয়ে দেবেন। সেই মহিলা ইদ্দত শেষে আবার পূর্ব স্বামীকে বিয়ে করবেন। এ ধরনের বিয়ে সম্পূর্ণ বৈধ। এতে কোনো দোষ নেই।

[২.২] এক ব্যক্তি জানতে পারলেন অমুক মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছেন। আরো জানতে পারলেন তারা দুজন আবার পরস্পর বিয়ে করতে আগ্রহী। তারপরও তিনি এ নিয়তে বিয়ে করলেন, ক'দিন রেখে তালাক দিয়ে দেবেন যেন আগের স্বামীর জন্য ঐ মহিলা হালাল হয়ে যায়। কিন্তু তার এ অভিপ্রায়ের কথা সাবেক স্বামী বা স্ত্রী কেউ জানতে পারলেন না। এ ধরনের বিয়েও হযরত ওসমান (রা)-এর মতে জায়েয নেই। বর্ণিত আছে—হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফত কালে এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—আমীরুল মুমিনীন ! আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। তিনি বললেন—আমার তাড়া আছে, চাইলে আমার

www.amarboi.org

সওয়ারীর পেছনে বসে পড়ুন, তখন না হয় আপনার কথা শোনা যাবে। সেই ব্যক্তি সওয়ারীর পেছনে বসে পড়লেন। তারপর বলতে লাগলেন—আমার এক প্রতিবেশী রাগের বশে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এখন তিনি খুবই অসুবিধায় আছেন। আমি চাচ্ছি সওয়াবের নিয়তে আমার কিছু টাকা খরচ করে হলেও ঐ মহিলাকে বিয়ে করি। তারপর তার সাথে সহবাস করে তাকে তালাক দিয়ে দেই যেন পূর্বস্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) বললেন—ঐ মহিলাকে শুধু বিয়ের জন্যই বিয়ে করুন।[৪১]

[২.৩] যদি বিয়ের সময় এ শর্ত লাগানো হয় যে, এ বিয়ে করা হচ্ছে যেন সেই মহিলা পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। আমি অবশ্যই তাকে বিয়ের পর তালাক দিয়ে দেবো। হযরত ওসমান (রা)-এর মতে এ ধরনের শর্তারোপের ফলে বিয়ে ফাসিদ (নষ্ট) হয়ে যায়। আর যদি উভয় পক্ষ (প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী) তার এ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত থাকেন তাহলে এটিও আগের শর্তযুক্ত বিয়ের সমার্থবোধক কাজ। তিনি বলেছেন—এ ধরনের বিয়ে করে যদি তারা স্বামী স্ত্রী হিসেবে বিশ বছরও অতিবাহিত করেন তবু তারা ব্যভিচারী হিসেবে চিহ্নিত হবেন।[৪২]

হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে মামলা দায়ের করা হলো, যিনি একজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করেছেন, যাতে সেই মহিলা আগের স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে পৃথক করে দিলেন এবং বললেন—তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ততক্ষণ তার আগের স্বামীর জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি তাকে সঠিক নিয়তে বিয়ে না করবে।[৪৩]

হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে এজন্য পৃথক করে দিয়েছিলেন যে, তারা শর্তারোপ করে বিয়ে করায় তা ফাসিদ বা বাতিল হয়ে গিয়েছিলো।

৩. কে হালাল করতে পারেন ?

দু ব্যক্তি শুধু হালাল করতে পারেন। যেমন–

[৩.১] স্বামী ঃ এর অর্থ কোনো ব্যক্তি তাহলীল করার নিয়ত ও শর্ত ছাড়া তালাক প্রাপ্তা কোনো মহিলাকে বিয়ে করলেন। তারপর তারা উভয়ে একান্তে মিলিত হলেন এবং একে অপরকে উপভোগ করলেন। যেমন সাইয়িদা আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে—এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে আরেকজন বিয়ে করেন। কিন্তু তিনি তার সাথে বিছানায় না গিয়েই তাকে তালাক দিয়ে দেন। পূর্ব স্বামী তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ইচ্ছে করলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন—তা হতে পারে না যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে উপভোগ করবে।' অর্থাৎ তাদের সহবাস না হবে।[৪৪]

[৩.২] মালিক ঃ যদি কেউ তার বাঁদীকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দেন এবং বাঁদীর স্বামী তাকে তালাকে মুগাল্লাযা (তিন তালাক) দিয়ে পৃথক করে দেয় এবং সে মালিকের কাছে ফিরে আসে। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর মালিক তার সাথে সহবাস করেন। তো হযরত ওসমান (রা)-এর মতে সেই বাঁদী পুনরায় আগের স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। আবু রাফি (রা) বর্ণনা করেছেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলাম সেখানে যায়িদ ইবনু সাবিত এবং আলী ইবনু আবী তালিবও উপস্থিত আছেন। আমি তাঁকে এমন এক ব্যক্তি

www.amarboi.org

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যিনি এক দাসীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাকে তিনি তালাক দিয়েছেন ফলে তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গেছেন। এখন যদি মালিক তার স্বামীর জন্য হালাল করার নিয়ত ছাড়াই তার সাথে সহবাস করেন, তাহলে ঐ বাঁদী আগের স্বামীর জন্য হালাল হবে কি ? তো হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) বললেন—হাঁ, এমতাবস্থায় সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আলী (রা) সেখান থেকে ওঠে চলে গেলেন। সম্ভবত তাদের দুজনের রায় তাঁর পছন্দ হয়নি।[৪৫]

তাহাল্লা/তাহাল্লী (تحلي)—সজ্জিত হওয়া/অলংকার পরা

বিস্তারিত জানার জন্য 'হাল্লা' শিরোনাম দেখুন।

তিজারাত (تجارت)—ব্যবসা

–ব্যবসার মালের যাকাত।–('যাকাত' ও 'বায়' শিরোনাম দেখুন)

তিফ্‌লুন (طفل)—শিশু

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে তিফলুন বলা হয়।
–(বিস্তারিত জানার জন্য 'সাগীরুন' শিরোনাম দেখুন)

তীব (طيب)—সুগন্ধি

মুহরিম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'ত' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. আল মাজমু', ৯ম খণ্ড, পৃ-৩১।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৫ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩২৩।
৩. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৮৭।
৪. তাবাকাত ইবনু সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৮।
৫. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৬।
৬. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫১।
৭. আল মাজমু' ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯৮।
৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪২।
৯. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৭০।
১০. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭০।
১১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-২২৭ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪১।
১২. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-২২৩।
১৩. আল মুহাল্লা, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৬৫, ২০৪ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩৮।
১৪. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫৩।
১৫. আল মুহাল্লা, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৯ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৮।
১৬. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৯ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫১৮ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-৭৬ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৬৫ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৭ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; আল মুহাল্লা, ১০ম খণ্ড, পৃ-১১৭।
১৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৮ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৯৫ ; আল মুহাল্লা, ১০ম খণ্ড, পৃ-১১৭।
১৮. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৬৭।
১৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৭ ; ওমদাদুল কারী শরহে বুখারী, ২০শ খণ্ড, পৃ-২৫১ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১৫।
২০. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৬৮ ; সুনানু বাইহাকী ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৫৯ ; আল মুহাল্লা, ১০ম খণ্ড, পৃ-২০৯; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৯ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৬।
২১. সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ৩১৯৩ ; সুনানু ইবনু মাজাহ্, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ২০৪৬।
২২. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৬০ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৬৫ ; কাশফুল গুম্মাহ, পৃ-৯৯২।
২৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৩৪ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৬৫।
২৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৩৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪২ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানুসর, ১ম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-৩১৪ ; আল মুয়াত্তা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৭৪ ; সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৩৫।
২৫. আল মুহাল্লা, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮০।
২৬. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-২৮২।
২৭. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৩৩।
২৮. আল মুহাল্লা, ১০ম খণ্ড, পৃ-১২০।
২৯. ঐ পৃ-১৭২ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩৯৪।
৩০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৫।
৩১. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৯ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৭।
৩২. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৬৭।
৩৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৬২-২৬৩ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-২২২ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫১৭।

www.amarboi.org

৩৪. আল মুয়াত্তা-২য় খণ্ড, পৃ-৬১৭।
৩৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১২।
৩৬. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১২ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৮৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৬৩ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৫১১ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৮৪ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৫২২ ; মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৩৮ ; আহকামুল কুরআন-আবু বকর আল জাস্‌সাস, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩০।
৩৭. কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৫।
৩৮. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-৩৪৮ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮০।
৩৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫১২ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৮৩ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৯।
৪০. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-২২৩।
৪১. সুনানু-বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২০৮ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮১।
৪২. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৪৬-৬৪৭।
৪৩. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-২০৮ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৭০৩ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৪।
৪৪. সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।
৪৫. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৯-১৮১।

www.amarboi.org

দ

দাইন (دين)–ঋণ

বিস্তারিত জানার জন্য 'কারয' শিরোনাম দেখুন।

দাওয়াত (دعوة)–অনুরোধ/দাওয়াত

দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত। কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে তার উচিত দাওয়াত গ্রহণ করা। ওয়ালীদ ইবনু মুগিরা (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে তার বিয়েতে হযরত ওসমান (রা)-কে দাওয়াত করেছিলেন। তিনিও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—'আমি রোযা রেখেছি। তবু এসেছি সকলের সাথে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে এবং সবার সাথে মিলে বরকতের জন্য দু'আ করতে।'[১]

দিয়াত (دية)–রক্তপণ

–অবৈধভাবে নর হত্যা সংঘটিত হলে তার বিনিময়ে প্রদেয় জরিমানাকে দিয়াত বা রক্তপণ বলে।–('জিনাইয়াহ্' শিরোনাম দেখুন)

–নর হত্যার কারণে দিয়াত প্রদান তো বাধ্যতামূলক হয়ই ('জিনাইয়া' দ্রষ্টব্য) উপরন্তু শারীরিক কোনো ক্ষতিসাধন করলেও দিয়াত প্রদান অপরিহার্য।

–(বিস্তারিত জানার জন্য 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম দেখুন)

দীন (دين)-জীবন ব্যবস্থা

মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে দীনের প্রভাব।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

০ রক্তপণ বা দিয়াতের পরিমাণে কমবেশী হওয়া দীনের ভিন্নতার প্রভাব।

–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম)

দু'আ (دعاء)-

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন–'যিকির' শিরোনাম।

'দ' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ–২৭১ ; আল মুহাল্লী, ১ম খণ্ড, পৃ–৪৫১।

www.amarboi.org

ন

নাওম (نوم)–ঘুম

–মসজিদে ঘুমানো।–(বিস্তারিত দেখুন–'ইমারাত' এবং 'মাসজিদ' শিরোনাম)

–ঘুম ওযু নষ্টকারী।–('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

নাজাসাহ (نجاسة)–অপবিত্রতা/নাপাকী

১. নাজাসাহ্র প্রকার

নাজাসাহ দু প্রকার। জাহিরী এবং মানুভী।

–নাজাসাতে মানুভী বলতে ঐ নাপাকীকে বুঝায় যার কারণে ওযু নষ্ট হয়ে যায় কিংবা গোসল ফরয হয়।–(বিস্তারিত দেখুন 'ওযু' এবং 'গুস্ল' শিরোনাম)

–নাজাসাতে জাহিরী বা প্রকাশ্য নাপাকী, যেমন–পেশাব, পায়খানা, মৃত জীবজন্তু ইত্যাদি।

২. নাপাকী থেকে বেঁচে থাকা

হযরত ওসমান (রা) নাপাকী থেকে বেঁচে থাকার খুব চেষ্টা করতেন। এমনকি তিনি যে কাপড় পরে মলমূত্র ত্যাগ করতেন সেই কাপড় পরে মসজিদে যেতেন না।[১]

৩. জুতার পবিত্রতা

জুতা পবিত্র হওয়ার শর্ত তার সাথে কোনো নাপাকী লেগে না থাকা। হযরত ওসমান (রা) জুতা পায়ে নামায পড়তেন।[২]

নাফয়ুন (نفي)–বহিষ্কার করা/নির্বাসন দেয়া

–কাউকে দেশ থেকে বহিষ্কার করাকে নাফয়ুন বলে।

–যিনার শাস্তি স্বরূপ দেশান্তর করে দেয়া।–('যিনা' শিরোনাম দেখুন)

–তা'যীর স্বরূপ কাউকে নির্বাসনে পাঠানো।–(দেখুন, 'তাযীর' শিরোনাম)

নাফিলাহ্ (نافلة)–অতিরিক্ত, নফল

ঐসব ইবাদাতকে নাফিলাহ্ বলা হয় যা ফরযের অতিরিক্ত।

–নফল নামায ঃ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'সালাত' শিরোনাম, (১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ও ১৮নং কলাম)

–নফল রোযা ঃ দেখুন 'সিয়াম' শিরোনাম (৬ ও ৭নং কলাম)

–নফল সাদাকাত ঃ বিস্তারিত দেখুন 'সাদাকাত' শিরোনাম

নাবিয়্যুন (نبي)–নবী

নবীদের জিনিসপত্র স্মৃতি ও বরকতের জন্য সংরক্ষণ করা শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ। যেমন আংটি কাপড় ইত্যাদি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট ছিলো। তারপর হযরত ওমর (রা)-এর হাত হয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট

www.amarboi.org

তা পৌঁছে। হিজরী ৩০ সনে মদীনা থেকে দু মাইল দূরে আরীস নামক এক কূপে সেই আংটি হযরত ওসমান (রা)-এর হাত থেকে পড়ে যায়। অনেক টাকা খরচ করে তিনি সেই আংটির তল্লাশী করান কিন্তু তা আর পাওয়া যায়নি।[৩]

নাবীয (نبيذ)—স্যুপ/মিশ্র পানীয়

নাবীয ঐ পানীয়কে বলে যার মধ্যে কোনো মিষ্টি জিনিস যেমন–খুরমা, মনাক্কা, আঙ্গুর প্রভৃতি দিয়ে সুস্বাদু করা হয়।

নাবীযের বিধান ঃ বিস্তারিত জানার জন্য 'আশরাবাহ' শিরোনাম দেখুন।

নারদুন* (نرد)—পাশা খেলা/জুয়া খেলা

–নারদুন এক ধরনের খেলা। এটি 'নারদুন শীর' নামে অত্যধিক খ্যাত। হাদীসেও একে এ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

مَنْ لَعِبَ النَّرْدُ شِيْرُ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِىْ لَحْمِ الْخِنْزِيْرِ وَدَمِهِ

যে ব্যক্তি নারদুনশীর খেলায় হাত লাগালো সে যেন শূকরের রক্ত-মাংস দিয়ে নিজের হাতকে কলুষিত করলো।[৪]

–নারদুনের উপকরণ ঘরে রাখা এবং তা খেলা নিষিদ্ধ।–(দেখুন, 'লাহ্‌ভুন' শিরোনাম)

–যে ব্যক্তি জুয়া বা পাশা খেলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।-(দেখুন 'শাহাদাত' শিরোনাম)

না'ল (نعل)-জুতা

–জুতা পায়ে নামায পড়া।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন–'সালাত' এবং 'নাজাসাহ' শিরোনাম)

নাসইয়াহ (نسية)—ধার/ঋণ

–ঋণে সুদ–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'রিবা' শিরোনাম)

–একই জাতীয় জিনিস ধারে বা বাকীতে ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।

–(বিস্তারিত দেখুন 'রিবা' শিরোনাম)

নাসাব (نسب)—বংশ প্রমাণিত হওয়া

কোনো মহিলার সাথে বিছানায় গেলে অর্থাৎ যৌন মিলন হলে বংশধারা প্রমাণিত হয়। সেই মিলন বিয়ের ভিত্তিতে হোক কিংবা মালিকানাভুক্ত দাসত্বের ভিত্তিতে। বিয়ের ভিত্তিতে বংশধারা প্রমাণিত হওয়ার দলিল সেই হাদীস যা খাল্লাস ইবনু আমর কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন—এক বাঁদী তাঈ গোত্রে এসে নিজেকে মুক্ত মহিলা ঘোষণা করে। তখন সেই গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করেন। সেই ঘরে তার কয়েকজন সন্তানও হয়। বাঁদীর মালিক খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। অবশেষে হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে মামলা দায়ের করা হলো। তিনি রায় দিলেন—সন্তান বাঁদীর মালিকের। স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক

* নারদুন শব্দের ইংরেজী সমার্থক শব্দ হচ্ছে–Backgmmon, Lexicon এ এর অর্থ লেখা হয়েছে–A game for two player's with draughts and dice.–অনুবাদক।

www.amarboi.org

স্থাপন করেছেন এটিই তার পাওনা। তবে পিতা যদি তার সন্তানকে নিজের কাছে নিতে চান তাহলে মাথাপিছু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিদইয়া শিশু এবং বাঁদীর মালিককে প্রদান করতে হবে।[৫] অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা) সন্তানের মায়ের মনিব থেকে যিনি তাদের মালিক হয়েছিলেন তার থেকে সন্তানদেরকে মুক্ত করার জন্য ফিদইয়া নির্দিষ্ট করেছেন। যেহেতু বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিলো তাই সন্তানের বংশ পরিচয় পিতার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন।

–অনারব মুশরিকদের সন্তানও তাদের পিতার পরিচয়ে বংশ পরিচিতি লাভ করবে।
–(আরো দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

–দাসত্বের মালিকানার ভিত্তিতে সহবাস করলে বংশ ধারা প্রমাণিত হবে তার দলিল হচ্ছে—উম্মু ওয়ালাদ তার মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথে এজন্য মুক্ত হয়ে যায়, তার গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর সেই সন্তান মনিবের বংশোদ্ভূত বলেই পরিচিতি লাভ করে।–(আরো দেখুন–'রিক্‌কুন' শিরোনাম)

নিকাহ্ (نِكَاح)—বিয়ে

বিয়ে সংক্রান্ত হযরত ওসমান (রা)-এর মতামতগুলো আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামসমূহে আলোচনা করবো।

১. সংজ্ঞা, ২. স্বামী, ৩. স্ত্রী, ৪. ওলী, ৫. মোহর, ৬. বিয়ের শর্তাবলী ৭. বিয়ের ভিত্তিতে একে অপরের ওয়ারিশ হওয়া।

১. সংজ্ঞা

বিয়ে এমন এক (নৈতিক) বন্ধনকে বলা হয়, যার কারণে স্বামী স্ত্রী একে অপরের থেকে স্বাদ আস্বাদনের অধিকার বৈধ (হালাল) হয়ে যায়।

২. স্বামী

[২.১] স্বামী-মুক্ত মানুষ হোক কিংবা দাস ঃ স্বামী যদি মুক্ত মানুষ হন, তার জন্য এক সাথে চারজন স্ত্রী রাখা জায়েয। যদি তার চারজন স্ত্রী থাকে এবং একজনকে তালাক দেন তাহলে তালাক প্রাপ্তার ইদ্দতের মধ্যেই তিনি অন্য মহিলাকে বিয়ে করতে পারেন। যদি চতুর্থ স্ত্রীকে এক কিংবা দু তালাক রিজঈ প্রদান করা হয় তাহলে স্ত্রী ইদ্দত পালন করে পুরোপুরি পৃথক হওয়ার আগে স্বামী অন্য মহিলাকে বিয়ে করতে পারবেন না।[৬]

আর যদি স্বামী গোলাম হন তাহলে তিনি সর্বসাকুল্যে এক সাথে দুজন স্ত্রী রাখতে পারেন। মুক্ত মানুষের অধিকারের অর্ধেক অধিকার তিনি ভোগ করতে পারবেন। এ ব্যাপারে সকল সাহাবা কিরাম ঐকমত্য।[৭]

[২.২] অসুস্থ ব্যক্তির বিয়ে ঃ মানুষ যখন মুমূর্ষ (মারজুল মাওত) অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন সম্পত্তি নষ্ট করা থেকে তাকে বাধা দেয়া যাবে। এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশী দান করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ তো আছেই। কিন্তু বিয়ে করার ব্যাপারটি সম্পদ নষ্ট কিংবা অপচয়ের পর্যায়ে পড়বে না। মোহরের পরিমাণ বেশী হোক কিংবা কম। কারণ মুমূর্ষ অবস্থায়ও বিয়ে করার অনুমতি আছে। হযরত ওসমান (রা)-এর সময় একদল সাহাবা এ অভিমত পোষণ

www.amarboi.org

করতেন। তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), হযরত মুয়ায ইবনু জাবাল (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত কুদামা ইবনু মাযউন (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনু রবীআহ্ (রা) অন্যতম। তখন যেসব সাহাবা জীবিত ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ এ অভিমতকে চ্যালেঞ্জ করেননি।[৮]

[২.৩] **যদি স্ত্রী মুসলমান হন, স্বামীরও মুসলমান হওয়া শর্ত ঃ** হযরত ওমর (রা)-এর বক্তব্য—'কোনো খৃষ্টান, মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করতে পারে না।' হানযালা ইবনু বাসার তার মেয়েকে খৃষ্টান ভাতিজার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। আওফ ইবনু কা'কা' বাহনে করে এসে হযরত ওমর (রা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলেন। হযরত ওমর (রা) সরকারী ফরমান জারী করলেন—'যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে স্ত্রী তারই থাকবে। নইলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হবে।' কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করলো না। ফলে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হলো। তখন কা'কা' (রা) সেই মহিলাকে বিয়ে করলেন।[৯] হযরত ওমর (রা)-এর সিদ্ধান্তে হযরত ওসমান (রা) সহ কোনো সাহাবাই প্রতিবাদ করেননি।

[২.৪] **স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে ঃ** বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হচ্ছে স্বামী স্ত্রী কেউ হাজ্জ কিংবা ওমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকবেন না। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তি নিজে বিয়ে করতে পারবে না। এমনকি নিজের জন্য কিংবা অন্য কারো জন্য বিয়ের পয়গামও পাঠাতে পারবে না।[১০]

–(আরো দেখুন 'ইহ্‌রাম' শিরোনাম)

[২.৫] **কাফায়াত বা সমতা ঃ** স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সমতা থাকা শর্ত। এক ব্যক্তি বানু লাইছ গোত্রের এক অকুমারী (ছাইয়্যিবাহ) মহিলাকে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। তার পিতা এ পয়গাম প্রত্যাখ্যান করলেন। হযরত ওসমান (রা) তাঁকে লিখে পাঠালেন—যদি উভয়ের মধ্যে সমতা থাকে তাহলে মেয়ের পিতাকে বলে দাও তিনি যেন এ বিয়ে দিয়ে দেন। যদি তিনি রাজী না হন তাহলে তোমরা তাদের বিয়ে দিয়ে দাও।[১১] সকল আরব পরস্পর কুফূ বা সমান। হযরত ওসমান (রা) বানু আবদে শামস গোত্রের সন্তান ছিলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাইয়ের মর্যাদা পেয়ে ছিলেন। একে একে দু মেয়েকেই তিনি তাঁর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বানু হাশিম গোত্রের। আর বানু হাশিম আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।[১২] যদিও বানু হাশিমের মর্যাদা সমস্ত আরবদের চেয়ে বেশী ছিলো। একবার হযরত ওসমান (রা) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন—আমরা আমাদের হাশিমী ভাইদের মর্যাদাকে অস্বীকার করছি না যা আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তিনি আপনার মত পবিত্র সত্তাকে দান করেছেন।[১৩]

–গোলামের বিয়ের জন্য মালিকের অনুমতি।–(দেখুন 'ইসতিযান' শিরোনাম)

৩. স্ত্রী

স্ত্রীর মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো থাকা প্রয়োজন ঃ-

[৩.১] **স্ত্রী মুসলমান হবেন কিংবা আহ্‌লে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী না হয় খৃষ্টান হবেন ঃ** হযরত ওসমান (রা) নিজেও নায়িলা বিনতু ফারাফসাহ্ নামের আহ্‌লে কিতাব এক মহিলাকে

www.amarboi.org

বিয়ে করেছিলেন। যিনি বানু কাল্‌ব গোত্রের খৃষ্টান মহিলা ছিলেন। অথচ তখন তার মুসলমান স্ত্রীগণও ছিলেন। অবশ্য পরে নায়িলা হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[১৪]

[৩.২] তিনি হবু স্বামীর মুহাররাম হবেন না ঃ

[ক] বংশগত কারণে হারাম ঃ মানুষের মূল বংশধারা যত ওপরেরই হোক। যেমন–পিতা, মা, দাদা, দাদী, নানা নানী প্রমুখ। আবার শাখা বংশধারা যত নিচেই হোক। যেমন–সন্তান, সন্তানের সন্তান প্রমুখ। পিতার শাখা বংশধারা যেমন–তার ভাই, বোন এবং তাদের সন্তানাদি। দাদা এবং নানার শাখা বংশধরের শুধু প্রথম স্তর। যেমন–চাচা, ফুফু, মামা, খালা। তাদের সন্তানাদি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

[খ] হুরমাতে মুসাহারাত অর্থাৎ বৈবাহিক সূত্রে হারাম ঃ স্ত্রীর মূল বংশধারা যত ওপরেরই হোক না কেন। তার শাখা বংশধর, যত নিচের দিকের হোক। পিতার স্ত্রী এবং পুত্র বধূ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤءِ كُمْ وَرَبَاۤئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ ٧

"তোমাদের স্ত্রীদের মা, তাদের কন্যা যারা তোমাদের নিকট প্রতিপালিত হয়েছে, ঐ স্ত্রীদের মেয়ে যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আর যদি সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তাহলে দোষের কিছু নেই এবং তোমাদের দুধ-ছেলেদের স্ত্রীগণ।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৩)

সূরা আন নিসার ২২নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُ كُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ط ـ(النساء : ٢٢)

"যে মহিলাদেরকে তোমাদের পিতা বিয়ে করেছেন তাদেরকে তোমরা বিয়ে কোরো না। ইতোপূর্বে যা হয়েছে তাতো হয়েছেই।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২২)

[গ] দুধ পানের কারণে হারাম।–(বিস্তারিত দেখুন 'রিযা' শিরোনাম)

[ঘ] সাময়িক কারণে হারাম ঃ এমন কিছু মহিলাও আছেন, সাময়িক কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম। কিন্তু কারণ দূর হয়ে গেলেই বিয়ে করা বৈধ হয়ে যায়। যেমন–

মুশরিক মহিলা, ইরশাদ হচ্ছে–

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ع ـ(البقرة : ٢٢١)

"তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে কোরো না, যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২১)

www.amarboi.org

–এমন দুজন মহিলাকে একত্রে বিয়ে করা যাদের একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের পরস্পরের সাথে বিয়ে হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে–

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ .(النساء : ٢٣)

"দু বোনকে একত্রে বিয়ে কোরো না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৩)

তালাকের ইদ্দত পালনরত অবস্থাও বিয়ের মধ্যে শামিল, তাই ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য বোনকে বিয়ে করা জায়েয নয়।[১৫]

–বিবাহিতা মহিলা। যতক্ষণ স্বামী তাকে তালাক না দেন এবং তিনি ইদ্দত পালন না করেন।

–ইদ্দত পালন করছেন, এখনো ইদ্দত শেষ হয়নি এমন মহিলাকেও বিয়ে করা যাবে না।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইদ্দত' শিরোনাম)

একত্রে চারজন স্ত্রী থাকলে চতুর্থ স্ত্রীকে (রিজঈ) তালাক দিলে তার ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না।–('ইদ্দত' শিরোনাম দেখুন)

[৩.৩] হবু স্ত্রীর সম্মতি ঃ যে মহিলাকে বিয়ে করবেন তার সম্মতি থাকা শর্ত। হযরত ওসমান (রা) যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইতেন তখন তাকে পৃথক রুমে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন—অমুক ব্যক্তি তোমার কথা বলেছে অর্থাৎ তোমাকে বিয়ে করতে চায়।[১৬]–(আরো দেখুন 'ইসতিযান' শিরোনাম)

৪. ওলী

মহিলাদের বিয়েতে ওলীর সম্মতি শর্ত। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَانِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ .

"ওলীর সম্মতি এবং ন্যায়পরায়ণ দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া বিয়ে হয় না।"

ওলীর জন্য এটি জায়েয আছে, কাউকে অভিভাবক বানিয়ে তার কন্যার বিয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা। বর্ণিত আছে, এক আরব হযরত ওমর (রা)-এর নিকট তার কন্যাকে রেখে গিয়েছিলেন এই বলে, বিয়ের ব্যাপারে সমতা পেলে আপনি আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন। মোহর যদি জুতোর ফিতে হয় তবু। হযরত ওমর (রা) সেই মেয়েকে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। তার গর্ভে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে যার নাম ছিলো আমর।[১৭]

সেই মহিলার নাম ছিলো উম্মু আমর বিনতু জুনদুব।[১৮]

যদি ওলী (অভিভাবক) কোনো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান এবং মেয়ে বিয়ের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তাহলে বিচারক দেখবেন বর কনের সমতা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে বিচারক তাদের বিয়ে দিয়ে দেবেন। ওলীর মতামতের কোনো পরওয়া তিনি করবেন না। এক ব্যক্তি বানু লাইস গোত্রের অকুমারী এক মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেন কিন্তু মেয়ের পিতা এ বিয়েতে অমত করেন। ঐ মহিলা হযরত ওসমান (রা)-কে ঘটনা লিখে জানান। প্রতি উত্তরে হযরত ওসমান (রা) সেখানকার লোকদেরকে লিখলেন—যে ব্যক্তি

www.amarboi.org

মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, তার সাথে যদি মহিলার সমতা থাকে, তাহ্‌লে তার পিতাকে বলো বিয়ে দিয়ে দেয়ার জন্য। যদি পিতা রাজী না হয় তাহলে তোমরা তার বিয়ে দিয়ে দাও।[১৯]

৫. মোহর

বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে বিছানায় গেলে কিংবা নির্জনে মিলিত হলে (যৌন মিলন না হলেও) স্ত্রী পুরো মোহরানা পাওয়ার অধিকারী হয়ে যান। যিরারা ইবনু আবী ওয়াইল থেকে বর্ণিত—খুলাফা-ই-রাশিদীনের রায় ছিলো, যখন স্বামী স্ত্রী ঘরের দরোজা বন্ধ করে দেবে এবং পর্দা ঝুলিয়ে দেবে তখনই মোহর ওয়াজিব হয়ে যাবে।[২০]

৬. বিয়ের শর্তাবলী

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'তাহলীল' এবং 'শারৃত' শিরোনাম।

৭. বিয়ের ভিত্তিতে একে অপরের ওয়ারিশ হওয়া

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম।

নিসাব (نصاب)–

–যাকাতের নিসাব।–('যাকাত' শিরোনাম দেখুন)

–চোরাই মালের নিসাব, যে পরিমাণ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায়।

–(বিস্তারিত দেখুন 'সারিকাহ্‌' শিরোনাম)

নুকূল (نكول)–ভীতু হয়ে পড়া/অস্বীকার করা

–শপথ করতে অস্বীকার করাকে নুকূল বলে।

মামলার কোনো পক্ষ শপথ করতে অস্বীকার করলে বিচারক সেই মামলার রায় ঘোষণা করতে পারেন।–(বিস্তারিত দেখুন 'কাযা' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'ন' বর্ণমালার তথ্য নির্দেশিকা

১. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৬
২. নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৫।
৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৫।
৪. মুসলিম শরীফ, 'তাহরীমুল লাব বিন নারদুন শীর' অনুচ্ছেদ ; আবু দাউদ, কিতাবুল আদব।
৫. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৩৭, ১৪১, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৭ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৭।
৬. আল মুহাল্লী ১০ম খণ্ড, পৃ-২৮ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-২১৭।
৭. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৪০।
৮. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৬।
৯. ফিকহে হযরত ওমর (রা), নিকাহ শিরোনাম।
১০. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৬৮ ; আল মাজমু', ৭ম খণ্ড, পৃ-২৯০।
১১. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৮ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৫২৮।
১২. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৮৩।
১৩. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৮৩।
১৪. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৭২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৫ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৮৯ ; আহকামুল কুরআন, আল জাসসাস, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২৫।
১৫. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৪৪।
১৬. কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৪৯৯।
১৭. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৭৬।
১৮. সাফওয়াতুস সাফওয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২৯৫।
১৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৮ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৫২৮ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৭৬।
২০. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৮৩।

www.amarboi.org

ফ

ফযর (فجر)—ফযর নামায/প্রভাত

–ফযরের নামাযের সময়।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–ফযরের নামাযে পাঠ্য সূরাসমূহ।–(ঐ)

–ফযর নামাযে কুনূত পড়া।–(ঐ)

–ফযর নামাযের পর অন্য নামায পড়া।–(ঐ)

–ফযর শুরু হওয়ার সাথে সাথে রোযা শুরু হয়ে যায়।–(দেখুন 'সিয়াম' শিরোনাম)

ফাকরুন (فقر)—দরিদ্রতা

–ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষি হওয়ার নাম ফাকরুন (দরিদ্রতা)।

–দরিদ্র যাকাত পাওয়ার অধিকারী।–(বিস্তারিত দেখুন 'যাকাত' শিরোনাম)

–গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশে ফকীর বা দরিদ্রের অংশ।

–(বিস্তারিত দেখুন 'গানিমাত' শিরোনাম)

আল ফাত্‌হু আলাল ইমাম ফিস্ সালাত الفتح على الامام فى الصلوة—ইমামকে লোকমা দেয়া

নামাযের কিরায়াতে গড়মিল হলে কিংবা ভুল হলে লোকমা দেয়া জায়েয। যিনি লোকমা দেবেন তিনি তার পেছনে নামায পড়ুন বা না পড়ুন।–(বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

ফারাইয (فرائض)—উত্তরাধিকার আইন

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম।

ফালাস (فلس)—নিঃস্ব/দেওলিয়া

১. সংজ্ঞা

ফালাস বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ঋণগ্রস্ত এবং সেই ঋণ পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী।

২. দেওলিয়া সংক্রান্ত বিধান

কেউ দেওলিয়া হয়ে গেলে তার দেওলিয়াত্বের ঘোষণা দেয়া যাবে এবং তার যাবতীয় মালামাল আটক করা যাবে। তারপর সমস্ত মালামালের তালিকা প্রস্তুত করে ঋণদাতাদেরকে উপস্থিত করা যাবে। যে ঋণদাতা দেওলিয়া ঘোষণার পূর্বে তার ঋণের কিছু অংশ ওসূল করে নিয়েছে সেটি তার হয়ে যাবে। তার সাথে আর কেউ অংশীদার হতে পারবেন না। কিন্তু তার ঋণের অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য ঋণদাতার অংশের সাথে নির্দিষ্ট করতে হবে।

যিনি তার বিক্রিত মাল দেওলিয়া ব্যক্তির নিকট অক্ষত পাবেন তিনি ক্রয় বিক্রয় বাতিল করে দিয়ে সেই মাল ফেরত নিয়ে নেবেন।[১]

www.amarboi.org

উম্মু হাবীবাহ (রা)-এর এক গোলামকে দেওলিয়া ঘোষণা করা হয়েছিলো। হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে সেই মামলা নিষ্পন্ন হয়েছিলো। তিনি রায় দিয়েছিলেন তার দেওলিয়াত্ব প্রকাশিত হবার আগে যে ব্যক্তি তার অধিকার আদায় করে নিয়েছে সেটি তারই হবে। যিনি তার কোনো সম্পদ অক্ষত পাবেন তিনি তা নিয়ে নেবেন।[২] তারপর দেওলিয়া ব্যক্তির যাবতীয় মালের তালিকা প্রস্তুত করে ঋণদাতাদের মধ্যে সমান অংশে সেই মাল বন্টন করে দেয়া হবে।

–(আরো দেখুন, 'হাজর' শিরোনাম)

ফিদা (فداء)-ফিদ্‌ইয়া

১. সংজ্ঞা

ফিদা সেই বিনিময়কে বলে যা কোনো ক্ষতিকর কাজ বা কথার প্রতিকারের জন্য কোনো জিনিসের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

২. পিতা তার এমন সন্তানের জন্য ফিদইয়া প্রদান করা, যে সন্তান এমন স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে যে অন্যের মালিকানাধীন। কিন্তু অজান্তে বিয়ে হয়েছিলো।

–(বিস্তারিত দেখুন–'ইসতিহ্‌কাক' শিরোনাম)

–ইচ্ছেকৃত হত্যাকাণ্ডে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ যদি কিসাস না নিয়ে দিয়াত নেয়ার জন্য রাজী হয় তাহলে দিয়াত আদায়ের মাধ্যমে ফিদইয়া আদায় করা।

–('জিনাইয়াহ' শিরোনাম দেখুন)

–সম্পদের মাধ্যমে বন্দীদের ফিদইয়া আদায় করা।–(বিস্তারিত দেখুন 'আসির' শিরোনাম)

ফিদ্দাহ (فضة)—রূপা

–রূপার যাকাত।–(দেখুন 'যাকাত' শিরোনাম)

–রৌপ্য মুদ্রায় দিয়াত এর পরিমাণ।–(দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

–পুরুষদের জন্য রূপার আংটি ব্যবহারের বৈধতা।–('তাখাত্তুম' শিরোনাম দেখুন)

ফিস্‌ক (فسق)—কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হওয়া

কবীরাহ গুনাহয় লিপ্ত হওয়া এবং সগীরা গুনাহকে অবজ্ঞা করার নাম ফিস্‌ক।

ফাসিকের সাক্ষ্য।–(বিস্তারিত দেখুন 'শাহাদাত' শিরোনাম)

'ফ' বর্ণমালার তথ্য নির্দেশিকা

১. আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ–৪০৯।

২. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৪৬ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ–১৭৬।

www.amarboi.org

ব

বাইতুন (بيت)—ঘর/বাড়ি

কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঘরের মালিকের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

–(বিস্তারিত দেখুন 'ইসতিযান' শিরোনাম)

বাইতুলমাল (بيت المال)—ট্রেজারী

১. সংজ্ঞা

বাইতুলমাল বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেখানে সাধারণ মুসলমানের সম্পদ জমা করা হয় এবং তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়।

২. বাইতুলমালের আয়ের উৎস

বাইতুলমালের আয়ের উৎস অনেক। তার মধ্যে নিচে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো।

[২.১] **যাকাত ঃ** যাকাত বাবদ আমদানীকৃত সম্পদ বাইতুলমালে পৃথকভাবে জমা করতে হবে। কারণ যাকাত নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হয়।–(বিস্তারিত দেখুন, 'যাকাত' শিরোনাম)

[২.২] **ফাই (যার মধ্যে ওশর, 'খারাজ' এবং 'জিযিয়াহ' অন্তর্ভুক্ত)**

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ওশর', 'খারাজ' এবং 'জিযিয়াহ' শিরোনাম।

[২.৩] **গানিমাতের এক-পঞ্চমাংশ**

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'গানিমাত' শিরোনাম।

[২.৪] **এমন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ যার কোনো ওয়ারিশ নেই।**

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম।

[২.৫] **এমন সম্পদ যার অধিকারীগণ আছেন কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।**

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'রিককুন' শিরোনাম।

৩. বাইতুলমাল থেকে যেসব খাতে ব্যয় করা হয়

হুকুমত কিংবা মুসলমানদের নেতার নেতৃত্বে বাইতুলমাল থেকে খরচ করা হয়। যা জনকল্যাণমূলক কাজ সহ অন্যান্য কাজেও ব্যয় হয়। 'আতা' শিরোনামে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. বাইতুলমাল সংরক্ষণে খলীফার কর্তব্য

বিস্তারিত দেখুন 'ইমারাত' শিরোনাম

বাকারা (بقر)—গাভী/গরু

একটি গরু সর্বোর্চ্চ সাতজন অংশীদার মিলে কুরবানী করতে পারেন।

–(আরো দেখুন 'আযহিয়াহ' শিরোনাম)

www.amarboi.org

বায়' (بيع)—বেচাকেনা

১. পণ্য

[১.১] যখন কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিস কিনবে তখন পণ্যটি সেখানে মওজুদ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যদি পণ্যটি মওজুদ থাকে তাহলে বেচাকেনা কার্যকরী করার বাধ্যবাধকতা উভয় পক্ষের সমান। শর্ত হচ্ছে এমন কোনো কারণ না থাকা যাতে কোনো পক্ষের বেচাকেনা বাতিল করে দেবার অধিকার অর্জিত হয়।

যদি পণ্য বর্তমান না থাকে তবু বেচাকেনা হয়ে যাবে কিন্তু এক্ষেত্রে খরিদ্দারের অধিকার থাকে পণ্য দেখার পর তিনি বেচাকেনা বহাল রাখতে পারেন আবার নাও রাখতে পারেন। তবে যিনি বিক্রি করেছেন তার এ অধিকার থাকবে না যে, তিনি পণ্য দেখানোর পর বিক্রি বাতিল করে দেবেন। কারণ ধরে নেয়া হয় তিনি যা বিক্রি করেছেন তা ভালোভাবে দেখে শুনেই তো বিক্রি করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে, হযরত ওসমান (রা) তাঁর কুফার জমির পরিবর্তে হযরত তালহা (রা) থেকে মদীনার কিছু জমি বা বাড়ি কিনে নেন। লোকজন হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন—আপনি কিনে ঠকেছেন। তিনি বললেন—আমি যে জমি বিক্রি করেছি তাও আমি দেখিনি। কাজেই ইচ্ছে করলে বেচাকেনা বাতিল করতে পারবো। সে অধিকার আমার আছে। যখন তালহা (রা)-কে একথা বলা হলো তিনি বললেন—বেচাকেনা বহাল রাখা না রাখার অধিকার আমার (তার নয়)। কেননা আমি তার থেকে যে জমি কিনেছি তা না দেখেই কিনেছি। উভয়ে তাদের দাবীর প্রশ্নে অটল রইলেন। অতপর এ মামলা হযরত যুবাইর ইবনু মুতয়িমের নিকট পেশ করা হলো। তিনি ফায়সালা দিলেন বেচাকেনা বহাল রাখার দায়িত্ব হযরত ওসমান (রা)-এর জন্য অপরিহার্য আর তালহা (রা) ইচ্ছে করলে বহাল রাখতে পারেন আবার নাও রাখতে পারেন। এ অধিকার (শুধু) তাঁর। কারণ তিনি না দেখে একটি জিনিস কিনেছেন।[১]

সামনে যখন আমরা 'আকদুল বায়' বা 'বিক্রি চুক্তি' নিয়ে আলোচনা করবো, সেখানে হযরত ওসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-এর নিকট না দেখে ঘোড়া বিক্রির ঘটনাও আলোচনা করবো।

[১.২] **কুরআনুল কারীম বেচাকেনা ঃ** কুরআনুল কারীম বেচাকেনা জায়েয নেই। এ ব্যাপারে সকল সাহাবা কিরাম ঐকমত্য।[২]

[খ] খারাজের জমি বেচাকেনা।–(এ সম্পর্কে দেখুন 'আরদ' শিরোনাম)

[১.৩] **বণ্টনের অযোগ্য এমন পণ্যের বেচাকেনা ঃ** এমন পণ্য যা বণ্টনের অযোগ্য তা আংশিক বেচাকেনা জায়েয আছে। যেমন–কূপ। এ ধরনের জিনিসের অংশীদারগণ তা থেকে কল্যাণলাভের জন্য তারা কোনো ফর্মূলা বের করে নেবেন। প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে—একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বলেছিলেন—'তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি যে 'বিরে রাওমা' (বা রুমা কূপটি) খরিদ করে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তা ওয়াকফ্ করে দেবে? তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আহ্বানে হযরত ওসমান (রা) ইহুদী মালিকের কাছে গিয়ে কূপের অর্ধেক মালিকানা খরিদ করে নিলেন এবং দুজনে চুক্তিবদ্ধ হলেন সেই কূয়ার পানি একদিন আপনি

www.amarboi.org

ব্যবহার করবেন আর একদিন আমি। এজন্য আপনি আলাদা বালতি ব্যবহার করবেন এবং আমার বালতিও ভিন্ন থাকবে। অতপর একদিন ইহুদী এবং একদিন হযরত ওসমান (রা)-এর জন্য পালা নির্দিষ্ট হলো তারপর দেখা গেল যেদিন হযরত ওসমান (রা)-এর পালা আসতো সেদিন লোকজন পানি তুলে দুদিনের জন্য জমা করে রাখতেন। (ইহুদীর পালার দিন কেউ তার থেকে পানি কিনতে যেতেন না)। ফলে সেই ইহুদী হযরত ওসমান (রা)-কে বলতে বাধ্য হলো—আপনি অর্ধেক মালিকানা কিনে আমাকে বড়ো বিপদে ফেলে দিয়েছেন অবশিষ্ট মালিকানাও আপনি কিনে নিন। তখন তিনি আট হাজার দিরহামে অবশিষ্ট মালিকানাও খরিদ করে নেন।[৩]

[১.৪] বিক্রেতার কর্তব্য হচ্ছে বিক্রিত পণ্য ওজন বা পরিমাপ করে কিংবা গুণে গুণে ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেবেন। তদ্রূপ ক্রেতার দায়িত্ব তা ওজন বা পরিমাপ করে কিংবা গুণে গুণে বুঝে নেয়া। এর ভিত্তি হচ্ছে হযরত ওসমান (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেছেন—আমি ইহুদীদের একটি গোত্র বানু কাইনুকা থেকে খেজুর কিনতাম। যখন একথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন। তখন বললেন—যখন তুমি কোনো জিনিস বিক্রি করবে তা ভালোভাবে ওজন করে কিংবা মেপে দেবে। আয় যখন কিনবে তখনো ভালোভাবে ওজন করে কিংবা মেপে তা গ্রহণ করবে।[৪]

তাছাড়া পণ্য পুরোপুরি দখলে আসার পূর্বে তা বিক্রি করা হযরত ওসমান (রা) জায়েয মনে করতেন না। তবে পণ্যটি যদি এমন হয়, যা মাপ বা ওজন করাই সম্ভব নয় তাহলে তা হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয আছে।[৫]

[১.৫] যে বাঁদী মুক্ত মহিলা বলে ধোঁকা দিয়ে বিয়ে করেছে তার গর্ভজাত সন্তানকে, সন্তানের পিতা যদি সেই বাঁদীর মালিক থেকে খরিদ করতে চান।-(এ ব্যাপারে জানতে হলে দেখুন 'ইসতিহকাক' শিরোনাম)

[১.৬] গোলাম পিতাপুত্রকে একে অপর থেকে পৃথক না করা ঃ হযরত ওসমান (রা) গোলাম বিক্রির সময় তার ছোট সন্তান থাকলে সন্তান রেখে পিতাকে কিংবা পিতাকে রেখে সন্তানকে অথবা পিতা ও পুত্রকে দুই মালিকের কাছে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ—ছোট বাচ্চাদের পিতামাতা কর্তৃক দেখাশুনা করার প্রয়োজন। তাছাড়া সন্তানকে পৃথক করলে পিতামাতার মন সন্তানের দিকে টানতে থাকে। হযরত হাকীম (রা) ইবনু ওক্‌কাল বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) তাকে লিখেছিলেন—আমার জন্য একশ' গোলাম কিনে পাঠাবে। সেই সাথে আরো লিখেছিলেন—কোনো গোলামকে যেন তার পিতামাতা থেকে পৃথক করে খরিদ করা না হয়।[৬]

তদ্রূপ হযরত ওসমান (রা) থেকে একথাও বর্ণিত আছে—গোলামকে তার সপরিবারে খরিদ করা উচিত। অর্থাৎ পিতামাতার সাথেই যেন তাকে খরিদ করা হয়।[৭]

[১.৭] বিক্রিত পণ্যের কোনো দোষ পাওয়া গেলে ঃ এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত নিম্নরূপ-

[ক] যদি পণ্যের ত্রুটি সম্পর্কে বিক্রেতার জানা থাকে এবং তিনি বিক্রির সময় বলে দেন এ পণ্যের দোষ-ত্রুটির জন্য আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এতে ক্রেতার খিয়ারুল আয়িব

www.amarboi.org

(ক্রটির কারণে ক্রয় বিক্রয় প্রত্যাহার)-এর অধিকার নষ্ট হয়ে যায় না। কারণ এটি এক ধরনের প্রতারণা। ইসলামে যাবতীয় কাজ কল্যাণের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়। তাই বেচাকেনার সময় যদি তা কল্যাণের ভিত্তিতে সম্পন্ন না হয়, তা জায়েয হতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)-এর নিকট একটি গোলাম বিক্রি করেন। একথাও বলে দেয়া হয় যে, গোলামের মধ্যে কোনো ক্রটি নেই। পরে হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) গোলামের মধ্যে কিছু দোষ দেখতে পেয়ে ইবনু ওমর (রা)-কে বললেন—আপনি গোলামের দোষ গোপন করে আমার নিকট বিক্রি করেছেন। উভয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর আদালতে মামলা দায়ের করলেন। হযরত ওসমান (রা) আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-কে এ মর্মে আদালতে হলফ করতে বললেন—যখন তিনি গোলাম বিক্রি করেছিলেন সে সময় তার মধ্যে কোনো দোষ ছিলো না। আবদুল্লাহ (রা) শপথ করতে অস্বীকার করলেন। ফলে গোলাম তাকে ফেরত দেয়া হলো। ফেরত নেয়ার পর দেখা গেলো গোলাম ভালো হয়ে গেছে। পরবর্তীতে তিনি সেই গোলাম এক হাজার পাঁচশ দিরহামে বিক্রি করে ছিলেন।[৮] –(আরো দেখুন 'খিয়ার' শিরোনাম)

[খ] ক্রেতা পণ্যের ক্রটি সম্পর্কে জানতে পারলেন না। না জেনে তা ব্যবহার শুরু করে দিলেন। সে জন্য ক্রীত পণ্য ফেরত দেয়ার অধিকার নষ্ট হয়ে যায় না। যদি ব্যবহারের সময় সেই পণ্যে কোনো ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে ফেরত দেয়ার সময় তার ক্ষতিপূরণ কেটে নেয়া হবে। যেমন হযরত ওসমান (রা) এমন কাপড় ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ক্রেতা ব্যবহারের পর তার ক্রটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।[৯]

যদি কোনো কুমারী বাঁদীর বেলায় এরূপ ঘটে, তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু ক্রেতা তার সাথে সহবাসের পর ঘটনাটি জানতে পারলেন। এরূপ অবস্থায়ও ক্রেতা ইচ্ছে করলে সেই বাঁদী ফেরত দিতে পারেন। কারণ ক্রেতা তাকে ভোগ করেছেন, এতে এমন কোনো ক্ষতি হয়নি, যে কারণে তাকে ফেরত দেয়া যাবে না। ব্যবহারের পরও যেমন ক্রীত কোনো জিনিস ফেরত দেয়া যায় তদ্রূপ ভোগ করার পর দাসীও ফেরত দেয়া যাবে। এতে কোনো বাধা নেই।[১০]

[গ] বিক্রিত পণ্য ক্রেতার হস্তগত হওয়ার আগে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা আংশিক ক্ষতি হলে যাবতীয় দায় ক্রেতার (বিক্রেতার নয়)। কারণ কেনার পর সেই জিনিসের মালিক ক্রেতা। বিক্রেতা এক্ষেত্রে শুধু আমানত গ্রহণকারী। তবে এ ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতার বাড়াবাড়ির কারণে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে অবশ্যই তিনি দায়ী হবেন।[১১]

২. মূল্য নির্ধারণ

ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে মিলে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন। কিংবা মূল্য নির্ধারণের সময় বিক্রেতা দেখবেন পণ্যটি কত টাকায় তার কেনা। কেনা টাকার ওপর সম্ভাব্য লাভ যোগ করে মূল্য পুনর্নির্ধারণ করবেন। উভয় পদ্ধতিই জায়েয যেমন হযরত ওসমান (রা) উট কিনতেন এবং বলতেন—এর মধ্যে কিছু উট এমন আছে যা বিক্রি করলে শুধু সেই রশিটি লাভ হবে। যা দিয়ে এটিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আবার কিছু উট আছে যা বিক্রি করলে প্রতিটি উটে এক দীনার করে লাভ হবে।[১২]

www.amarboi.org

৩. চুক্তি

বেচাকেনার সময় অবশ্যই এমন চুক্তি হওয়া উচিত যা উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। চুক্তির শর্ত বিক্রেতার পক্ষ থেকেও হতে পারে আবার ক্রেতার পক্ষ থেকেও। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—ক্রেতা বিক্রেতা ঐকমত্য হয়ে যে কোনো শর্তারোপ করতে পারেন। তবে এমন শর্ত যেন না হয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। এজন্য হযরত ওসমান (রা) বলতেন—যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য বেচাকেনা করার সময় এমন শর্তারোপ করেন যা মূলত উপকারী, জায়েয আছে।[১৩]

যেমন হযরত ওসমান (রা) হযরত সুহাইব (রা) থেকে এ শর্তে বাড়ি কিনেছিলেন যে, বিক্রির পরও তিনি সেখানে থাকতে পারবেন।[১৪]

একবার হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) হযরত ওসমান (রা) থেকে কতগুলো ঘোড়া কিনেন। বেচাকেনার মহূর্তে ঘোড়াগুলো অন্য জায়গায় ছিলো। এ শর্তে তিনি ঘোড়াগুলো কিনেন—যদি সেগুলো সুস্থ সবল থাকে তাহলে হযরত ওসমান (রা) সেগুলোর মূল্য বাবদ চল্লিশ হাজার দিরহাম পাবেন। একথা বলে তিনি ওঠে কিছুদূর চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে এসে বললেন—আমি লোক পাঠাবো, যদি সে ঘোড়াগুলো সুস্থ-সবল দেখতে পায় তাহলে আপনাকে আরো ছ' হাজার দিরহাম বাড়িয়ে দেবো। হযরত ওসমান (রা) বললেন—ঠিক আছে। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-এর লোক সেখানে পৌছে দেখলো ঘোড়াগুলো মরে গেছে। দ্বিতীয় শর্তের কারণে আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) বিক্রি চুক্তির যিম্মা থেকে মুক্তি পেলেন।-(আরো দেখুন 'শরত' শিরোনাম)

বিক্রেতার পক্ষ থেকে এরূপ শর্তারোপ করা যে, বিক্রিত পণ্য কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি তার দায়মুক্ত।

-(বিস্তারিত দেখুন 'বায়' শিরোনাম ১নং প্যারা এবং 'খিয়ার' শিরোনাম)

৪. বেচাকেনায় উদারতা

হযরত ওসমান (রা) সর্বদা চাইতেন লোকজন পরস্পর ভালো আচরণ করুক এবং বেচাকেনায় উদারতা প্রদর্শন করুক। এ ব্যাপারে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটির উদ্বৃতি দিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি ক্রেতা-বিক্রেতা, বিচারক এবং বাদী হিসেবে অপরের সাথে কোমল ও নম্র ব্যবহার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৫]

আমরা ইতোপূর্বে বলেছি—হযরত ওসমান (রা) উট কিনতেন এবং বলতেন কিছু উটে আমার উট বাঁধার রশি ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না আবার কিছু উটে প্রতিটিতে আমার এক দীনার করে লাভ হবে। একথা থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি ক্রয় বিক্রয়ে কতো নম্রতা ও সরলতা প্রদর্শন করতেন।

৫. বিবাহিত গোলামের ক্রয়-বিক্রয়

হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন বিবাহিত গোলাম বিক্রি করলে তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক সংঘটিত হয় না। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) তার বিপরীত মত পোষণ করতেন।[১৬]

www.amarboi.org

বাস্‌মালাহ্ (بسملة)—বিসমিল্লাহ্ বলা বা লিখা

১. সংজ্ঞা

বাসমালাহ শব্দের তাৎপর্য—বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' পড়া (বা বলা কিংবা লিখা)।

২. নামাযে 'বাসমালাহ' বলা

ইমাম তাহাভী শরহে মা'আনিল আসার গ্রন্থে বলেছেন এ বর্ণনা তাওয়াতির পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, হযরত ওসমান (রা) নামাযে 'বাসমালাহ' উচ্চ শব্দে পড়তেন না।[১৭]

ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেনে—হযরত ওসমান (রা) 'আলহামদুল্লিাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে নামায শুরু করতেন। তিনি তার প্রথমে কিংবা পরে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' পড়তেন না।[১৮]

অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা) সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বেও উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন না এবং পরে (অন্য সূরা শুরু করার আগে)-ও না। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন —আমি হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর পেছনে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই সূরা ফাতিহা দিয়ে নামায শুরু করেছেন।[১৯] অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পূর্বে সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়তেন না বরং আস্তে পড়তেন।

একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) তার ছেলেকে নামাযে সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়তে শোনলেন। তখন ছেলেকে ডেকে বললেন—বেটা ! দীনের মধ্যে নতুন কোনো জিনিস যোগ করা থেকে বিরত থাকো। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর পেছনে নামায পড়েছি। তাদের কাউকে জোরে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে শুনিনি। তুমিও আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দিয়ে কিরায়াতের শুরু করো।[২০] অর্থাৎ বিসমিল্লাহ জোরে না পড়ে আস্তে পড়ো তারপর জোরে আলহামদু সূরা শুরু করবে। ইমাম নববী এক আজব কথা বলেছেন। তিনি ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, চুপি চুপি নামাযে হযরত ওসমান (রা) আস্তে বিসমিল্লাহ পড়তেন আর উচ্চ শব্দের নামাযে জোরে বিসমিল্লাহ পড়তেন।[২১]

সত্যি কথা বলতে কি, তিনি এ রিওয়ায়েতটি এজন্যই বর্ণনা করেছেন যেন তার মাসলাক এর পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পায়।-(আরো দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

বাহীমাহ্ (بهيمة)—চতুষ্পদ প্রাণী

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'হাইওয়ান' শিরোনাম।

বিত্‌র (وتر)—বিজোড়/বিতর নামায

-বিতর নামায।-(দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

বিদ'আত (بدعة)—

বিদ'আত বলা হয় দীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন জিনিস প্রবেশ করিয়ে দেয়াকে যার সাথে দীনের কোনো সম্পর্ক নেই এবং দীনের উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী। যদি দীনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য থাকে তাহলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে না। এ সূত্রের ভিত্তিতে হযরত ওসমান

www.amarboi.org

(রা) জুম'আর দ্বিতীয় আযানের প্রচলন করেন। অথচ তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এবং পূর্ববর্তী দু' খলীফার সময়ও প্রচলিত ছিলো না। তিনি মনে করতেন আযানের উদ্দেশ্য লোকদেরকে নামাযের সংবাদ দেয়া। মদীনার জনপদের বিস্তৃতি ঘটায় মসজিদে নববীতে দেয়া আযানে মদীনার দূর-দূরান্তে যারা অবস্থান করেন তাদেরকে সংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। এজন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন—প্রথমে একটি আযান যূরা মহল্লায় অবস্থিত তার বাড়ির ছাদ থেকে দেয়ার জন্য। তারপর দ্বিতীয় আযান মসজিদে নববীতে। যেন লোকদেরকে নামাযের সংবাদ দেয়ার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়ে যায়। সাহাবা কিরামের মধ্যে কেউই হযরত ওসমান (রা)-এর এ পদক্ষেপকে বিদ'আত বলেননি।

–(আরো দেখুন 'আযান' শিরোনাম)

বিলাইয়াহ্ (ولاية)—অভিভাবকত্ব

প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো শিশু কিশোরের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণকে বিলাইয়াহ বা অভিভাবকত্ব বলে।

–মহিলাদের বিয়ের জন্য ওলীর অনুমোদন শর্ত।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–নিহত ব্যক্তির ওলী কর্তৃক কিসাস মাফ করে দেয়া।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

বিরুন (بئر)—কূপ/কুয়া

কুয়োর ব্যাপারে শুফ'আর (ক্রয়ের অগ্রাধিকার) অধিকার নেই।–(বিস্তারিত জানার জন্য 'শুফ'আহ' শিরোনাম দেখুন)

বুলূগ (بلوغ)—প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া

১. সংজ্ঞা

বুলূগ বলতে মানুষের এমন একটি বয়সে উপনীত হওয়াকে বুঝায় যে বয়সে তিনি বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

২. বুলূগের আলামত

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বেশ কিছু আলামত আছে। তার মধ্যে কতিপয় আলামত এমন যা মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সমানভাবে পাওয়া যায়। আবার এমন কিছু আলামত আছে যা শুধু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট।

[২.১] যেসব আলামত মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সমানভাবে প্রকাশিত হয় তা নিম্নরূপ—

[ক] পুরুষ এবং মহিলার লজ্জাস্থান দিয়ে মনি বের হওয়া। তা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে আবার ঘুমের মধ্যেও হতে পারে।

[খ] পুরুষ ও মহিলার বস্তি প্রদেশে (যৌনাঙ্গের চারপাশে) লোম গজানো। যেমন বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এক বালককে চুরির অপরাধে ধরে আনা হলো। তিনি বললেন—দেখতো তার লজ্জাস্থানের পাশে লোম গজিয়েছে কিনা। দেখা গেলো তার লজ্জাস্থানে লোম ওঠেনি। তখন হযরত ওসমান (রা) তাকে হাত কাটার শাস্তি থেকে রেহাই দিলেন।[২২]

তিনি একবার এও বলেছিলেন হদ শুধু তার ওপরই কার্যকর করা যাবে যার যৌন প্রদেশে ঘনো লোম গজিয়েছে।[২৩]

আমাদের জানা মতে কোনো সাহাবা এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করেননি।

–(আরো দেখুন 'হদ' শিরোনাম)

[২.২] মহিলাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আরো দুটো বিশেষ আলামত আছে। হায়েয হওয়া এবং গর্ভ ধারণ করা। এ ব্যাপারে সমস্ত উম্মাহ্ ঐকমত্য।

৩. বুলূগের প্রভাব ও ফলাফল

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একজন মানুষ তার আচার আচরণ ও লেনদেনে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বিবেচিত হয় এবং অপ্রাপ্ত বয়সের সাথে যেসব বিধান সংশ্লিষ্ট তা শেষ হয়ে যায়।–(আরো দেখুন 'সগীরুন' শিরোনাম)

৪. প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে কিনা তা প্রমাণের জন্য লজ্জাস্থান দেখা জায়েয আছে।

–(আরো জানার জন্য দেখুন 'আওরাতুন' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'ব' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. আল মাজমু', ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩০ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৮০ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮।
২. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৪৫ ; ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৫ ; আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৬৩।
৩. আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৭৯।
৪. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৪১।
৫. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫২০ ; আল মাজমু, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৯৫ ; আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১০৭, ১১৩।
৬. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২য় খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, পৃ-২২৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৯ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৭৩।
৭. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৩১।
৮. আল মুয়াত্তা, ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৬১১ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪২ ; আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৬৩ ; সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩২৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১১।
৯. আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৪৮ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৭৮।
১০. আল মাজমু', ১২শ খণ্ড, পৃ-২২৮।
১১. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৮৪।
১২. সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩২৯।
১৩. আল মাজমু', ৯ম খণ্ড, পৃ-৫২৪।
১৪. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪২০।
১৫. সুনানু নাসাঈ, কিতাবুল বুয়ূ (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)
১৬. ফিকহে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), তালাক শিরোনাম।
১৭. শরহে মা'আনিল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৯ ; আল ই'তিবার পৃ-৮১ ; আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫২।
১৮. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫০ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১১৫।
১৯. আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫৩।
২০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬২ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-৮১ ; আসার-আবু ইউসুফ, পৃ-১০৭ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৭৭।
২১. আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫৩।
২২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮ ; ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৭৭।
২৩. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬।

www.amarboi.org

ম

মযী (مذى)—লজ্জাস্থান দিয়ে নির্গত আঠালো পদার্থ

মযী নির্গত হলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়।-(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'ওযু' শিরোনাম)

মাওত (موت)—মৃত্যু

১. জীবিত ব্যক্তি তার কবরের জন্য জমি ক্রয় করা

কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার কবরের জন্য জায়গা কেনা এবং সেখানে দাফন করার জন্য ওসিয়ত করা জায়েয আছে। হযরত ওসমান (রা) তার জন্য কবরের জায়গা কিনেছিলেন এবং সেখানে তাকে দাফন করার জন্য ওসিয়তও করেছিলেন।[১]

২. মৃতকে গোসল দেয়া

বেশ কিছু সাহাবা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁরা তাদের স্ত্রীকে গোসল দিয়েছিলেন কিন্তু কোনো সাহাবা এটি অপছন্দ করেননি। হযরত আলী (রা) তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রা)-কে গোসল দিয়েছিলেন।[২] হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) তো এতটুকু বলেছেন যে, স্ত্রীকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে স্বামীর অধিকারই বেশী। সাহাবা কিরামের মধ্যে একথার বিপরীত কোনো কথা জানা যায়নি।[৩]

৩. মৃত ব্যক্তির কাফন

মুহরিম ব্যক্তি যদি ইহরামের অবস্থায় মারা যায়, মৃত্যুর কারণে তার ইহরাম নষ্ট হয় না। এজন্য তাকে ইহরামের কাপড় দিয়েই কাফন দেয়া হয়, তার মাথা খোলা রাখা হয় এবং খুশবু লাগানো হয় না। পূর্বেই একথা আলোচনা করা হয়েছে।-('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

৪. জানাযার নামায

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

৫. জানাযা দেখে ওঠে দাঁড়ানো

জানাযা দেখে ওঠে দাঁড়ানো কিংবা বসে থাকা উভয় মতই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। অনেক সাহাবার অভিমত হচ্ছে—জানাযা দেখে না দাঁড়ানোর হাদীস থেকে দাঁড়ানোর হাদীস রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। কারণ না দাঁড়ানোর হাদীস পরে বর্ণিত হয়েছে। আবার কতিপয় সাহাবার অভিমত হচ্ছে—না দাঁড়ানোর হাদীস মূলত বৈধতা প্রমাণের জন্য। দুটোরই অবকাশ আছে। ইচ্ছে হয় দাঁড়াবে অথবা দাঁড়াবে না। হযরত ওসমান (রা)-ও এ দলের সাথে ছিলেন। তিনি মনে করতেন—জানাযা দেখে দাঁড়ানো কিংবা না দাঁড়ানো ব্যক্তির ইচ্ছেধীন। ওসমান (রা) সম্পর্কিত এক বর্ণনায় আছে, একবার তিনি এক জানাযা দেখে ওঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন—আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাযা দেখে দাঁড়াতে দেখেছি।[৪]

৬. জানাযা বহন করা

দু' বাঁশের মাঝে জানাযা (শবদেহ) রেখে বহন করা মুবাহ। ঈসা ইবনু তালহা (রহ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রা)-কে তাঁর মায়ের জানাযা দু' বাঁশের মাঝে রেখে বহন করতে

www.amarboi.org

দেখেছি। যতক্ষণ তা মাটিতে রাখা না হয়েছে ততক্ষণ তিনি তাঁর মায়ের জানাযা থেকে পৃথক হননি।[৫]

৭. জানাযার সাথে চলা

[৭.১] জানাযার আগে চলা ভালো নাকি পিছে চলা, তা নিয়ে আলিমগণ দ্বিধা বিভক্ত। হযরত ওসমান (রা) জানাযার আগে আগে চলাকে উত্তম মনে করতেন। এমনকি তিনি নিজেও এরূপ করতেন।[৬]

[৭.২] অমুসলিমের জানাযার সাথে মুসলমানদের চলা জায়েয। এজন্য সাহাবা কিরাম হারিস ইবনু রবী'আহ'র মায়ের জানাযার সাথে চলেছেন, যিনি একজন খৃস্টান (মহিলা) ছিলেন। এর বিপরীত কোনো কথা বা কাজ কোনো সাহাবা থেকে প্রমাণিত নেই।[৭]

৮. মৃতের কবর

বিস্তারিত দেখুন 'কাবরুন' শিরোনাম।

৯. মৃতের দাফন

দিন কিংবা রাতের যে কোনো সময় মৃতকে দাফন করা যায়। হযরত ওসমান (রা)-এর দাফন হয়েছিলো রাতের বেলা ইশার নামাযের পর। যুর'আ ইবনু ওমর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন—আমরা ইশার নামাযের পর হযরত ওসমান (রা)-কে দাফন করেছিলাম। তাঁর জানাযা বহনকারী চারজনের একজন আমি ছিলাম।[৮]

১০. জানাযা বহন করার পর ওযু করা

মনে হয় হযরত ওসমান (রা) একথার সমর্থক ছিলেন, জানাযা বহন করার পর ওযু করা মুস্তাহাব। ইবনু আবী শাইবা তার নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি জানাযা বহন করবে সে যেন ওযু করে নেয়।[৯] তাঁর বক্তব্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের অনুরূপ। আবু হুরাইরা মারফু সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন–

من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا

"যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেবে সে যেন গোসল করে ফেলে আর যে জানাযা বহন করবে সে যেন ওযু করে নেয়।"[১০]

১১. উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য ব্যক্তির মৃত্যু শর্ত

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম

মাক্কাহ্ (مكة)—মক্কা

১. মক্কা মুকাররমার সীমা পরিসীমা

হেরেমের যে সীমা-পরিসীমা মক্কা মুকাররমার পরিসীমাও তাই। সেই পরিসীমা হযরত জিবরাঈল (আ) নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে। তা সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এমন কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বছর মক্কা বিজয় করেন সেই

www.amarboi.org

বছর হযরত তামীম ইবনু আসাদ খুযাঈ (রা)-কে পাঠিয়ে নতুনভাবে তা চিহ্নিত করেন। হযরত ওমর (রা) তার খিলাফত কালে কুরাইশদের চার ব্যক্তিকে যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াত করতেন তাদেরকে হেরেমের সীমানা নতুনভাবে চিহ্নিত করার জন্য পাঠান এবং বলে দেন, এমন প্রতিটি উপত্যকা যা হেরেমের দিকে ঢালু তার ওপর চিহ্ন পুঁতে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে আর যেসব উপত্যকা হেরেমের বিপরীত দিকে ঢালু তা হেরেম বহির্ভূত এলাকার (হাল্লা) মধ্যে শামিল করে দেবে।[১১] হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালেও এ চৌহদ্দি বলবত ছিলো এবং তা আজও বলবত আছে।

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, হেরেমের সীমা এবং ইহ্‌রাম বাঁধার এলাকা এক নয়। হেরেমের এলাকা মক্কার চারপাশে নির্দিষ্ট একটি সীমানা পর্যন্ত কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধার সীমা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। যুল হুলাইফা এবং জিদ্দা বন্দর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এলাকাগুলো রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করলে যে পরিধি দাঁড়ায় তা।

২. মক্কা সম্পর্কিত বিধান

(বিস্তারিত 'হেরেম' শিরোনামে দেখুন)

মনে হয় হযরত ওসমান (রা) মক্কা শরীফের জায়গা জমি বেচাকেনা করা জায়েয মনে করতেন না। তিনি বলেছেন—মক্কায় আমার আবাসস্থলে আমার সন্তানেরা থাকবে। তারা যেখানে খুশী সেখানেই ঘর উঠিয়ে থাকবে।[১২] একথা দিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন বসবাসের এ জায়গা বেচাকিনির মাধ্যমে হস্তান্তর করা যাবে না। অবশ্য একথার আরেকটি অর্থ হতে পারে—তিনি তার জায়গা জমি সম্ভবত ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

মাগরিব (مغرب)—মাগরিবের নামায

–মাগরিব নামাযের ওয়াকত।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–মাগরিব নামাযের আগে দু রাকায়াত নফল নামায পড়া।–(দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

মাজনূন (مجنون)—পাগল

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'জুনূন' শিরোনাম

মাজূস (مجوس)—অগ্নি উপাসক

–অগ্নি উপাসকদের দিয়াত (রক্তপণ) সম্পর্কে দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম।

–অগ্নি উপাসকদের থেকে জিযইয়া গ্রহণ।–(বিস্তারিত দেখুন 'জিযইয়া' শিরোনাম)

মান্‌নুন (من)—অনুগ্রহ, উপকার

বন্দীদের ওপর সদয় হওয়া।–(বিস্তারিত 'আসির' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

মানিয়্যুন (منى)—শুক্র, বীর্য, মনী

–বীর্যপাত হওয়া প্রাপ্তবয়স্কের একটি আলামত।–('বুলূগ' শিরোনাম দেখুন)

–বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়ে যায়।–(বিস্তারিত দেখুন 'গুস্‌ল' শিরোনাম)

www.amarboi.org

মাফকূদ (مفقود)—নিখোঁজ ব্যক্তি

১. সংজ্ঞা

মাফকূদ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি কোথাও গিয়ে এমনভাবে নিখোঁজ হয়ে যান, কেউ বলতে পারেন না যে, তিনি জীবিত না মৃত।

হযরত ওসমান (রা) নিখোঁজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না।[১৩] অর্থাৎ কেউ সফররত অবস্থায় হারিয়ে গেলেন, বাহ্যত মনে হলো তিনি নিহত হয়েছেন কিংবা তিনি অন্য কোনো উপায়ে নিখোঁজ হলেন। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর বক্তব্য—যে মহিলা তার স্বামীকে হারিয়ে বসে এবং সে জানতে পারে না, তার স্বামী কোথায় আছেন, তো সে চার বছর স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবে। তারপর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে।[১৪] তাঁর এ বক্তব্যে বুঝা যায় তিনি নিখোঁজের মধ্যে কোনো শ্রেণী বিন্যাস করতেন না।

২. নিখোঁজ ব্যক্তির বিধান

নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রী চার বছর পর্যন্ত স্বামী ফিরে আসার অপেক্ষা করবেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি ফিরে আসেন তো ভালো নইলে নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর স্ত্রী বিধবার ইদ্দত পালন করবেন (অর্থাৎ চার মাস দশ দিন তিনি পুনরায় বিয়ে থেকে বিরত থাকবেন)। তারপর চাইলে অন্যত্র বিয়ে করতে পারবেন। অন্যত্র বিয়ের পর যদি তার আগের নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসেন তাহলে তাকে অবকাশ দেয়া হবে, হয় তিনি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবেন, না হয় তার দেয়া মোহরানা ফেরত নেবেন। সাঈদ ইবনু মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে এ ফায়সালা দিয়েছেন—তার স্ত্রী চার বছর পর্যন্ত স্বামী ফিরে আসার অপেক্ষা করবে। তারপর চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করার পর ইচ্ছে করলে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। দ্বিতীয় বিয়ের পর যদি নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসেন তাহলে তাকে সুযোগ দেয়া হবে, ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবেন কিংবা প্রদত্ত মোহরানার টাকা ফেরত নেবেন।[১৫] সুহাইমা বিনতু ওমাইর শাইবানী থেকে বর্ণিত, তার স্বামী সাইফী ইবনু কাতীল মুজাহিদদের সাথে এক অভিযানে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। কোনোভাবেই জানা গেলো না তার স্বামী জীবিত আছেন নাকি মৃত। তিনি চার বছর স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে আব্বাস ইবনু তারীফ কায়সীকে বিয়ে করেন। একদিন তার নিখোঁজ স্বামী হাজির হলেন। তার আত্মীয় স্বজন হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তখন বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি ছাদে ওঠে বললেন—এ অবস্থায় আমি কী ফায়সালা দিতে পারি? তারা বললেন —আপনি যে ফায়সালা দেবেন, আমরা মেনে নেবো। তিনি বললেন-প্রথম স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করার কিংবা মোহরানার টাকা ফেরত নেয়ার মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নিতে পারবে।[১৬]

৩. নিখোঁজ ব্যক্তির উত্তরাধিকার

চার বছর শেষ হওয়ার পর নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদ তার ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া যাবে। যুহুরী হযরত ওসমান (রা) থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন।[১৭]

মাযমাযাহ্ (مضمضة)—কুলি করা

–ওযুতে কুলি করা।–('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

–গোসলে কুলি করা।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'গুসল' শিরোনাম)

www.amarboi.org

মারাআহ্ (مرأة)–মহিলা, স্ত্রীলোক

–মেয়েরা কখন বালেগ হয় ?–('বুলূগ' শিরোনাম দেখুন)

–মহিলাদের ইহরামের পোশাক।–(দেখুন–'ইহরাম' শিরোনাম)

–ইদ্দত পালনরতা মহিলার সফর।–(বিস্তারিত দেখুন 'সফর' শিরোনাম)

–যদি পুরুষ ও মহিলার জানাযা একই সাথে আনা হয় তাহলে কিভাবে রেখে জানাযার নামায পড়তে হবে।–(বিস্তারিত দেখুন সালাত শিরোনাম)

–ইহরামের সময় মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখবে না বরং কাপড় ঝুলিয়ে দেবে (সেই কাপড় যেন মুখমণ্ডল স্পর্শ না করে)।–(আরো জানতে হলে দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

–তালাক প্রাপ্তা মহিলা।–('তালাক' শিরোনাম দেখুন)

–যেসব মহিলাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–মহিলাদের হায়িয ও ইস্তিহাযা।–(যথাক্রমে 'হায়িয' ও 'ইস্তিহাযা' শিরোনাম দেখুন)

–মহিলাদের সাক্ষ্য।–('শাহাদাত' শিরোনাম দেখুন)

–কোনো মহিলাকে নির্যাতনের শাস্তি।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

–যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের অংশগ্রহণ।–('জিহাদ' শিরোনাম দেখুন)

–মহিলা বন্দীদেরকে হত্যা করা যাবে না।–('আসির' শিরোনাম দেখুন)

–যদি কোনো মহিলা কাফিরদের হাত থেকে ছুটে মুসলমানদের কাছে চলে আসেন ফিদইয়ার জন্য কিন্তু ফিদইয়া পরিশোধে অসমর্থ হলেও তাকে পুনরায় কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না।–(বিস্তারিত দেখুন, 'আসির' শিরোনাম)

–যদি মহিলারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তাহলে গানিমাতের মাল থেকে তাদেরকে কিছু দিয়ে দেয়া।–(বিস্তারিত দেখুন 'গানিমাত' শিরোনাম)

–বাঁদীর মালিকানার অধিকারে তার সাথে বিছানায় যাওয়া।–('তাসরিয়ুন' শিরোনাম দেখুন)

মারায (مرض)–অসুখ, অসুস্থতা

–অসুস্থ ব্যক্তির বিয়ে।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–যদি স্বামী মারাযুল মাওতের সময় স্ত্রীকে তালাক দেন তাহলে স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিশ হবেন।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

মাসজিদ (مسجد)–মসজিদ

১. মসজিদে বিচার অনুষ্ঠান

হযরত ওসমান (রা) মামলা নিষ্পত্তির জন্য মসজিদকে আদালত হিসেবে ব্যবহার করতেন।–('কাযা' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

২. মসজিদে ওযু করা

মসজিদে ওযু করা জায়েয। হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) সহ সকল খলীফাই মসজিদে ওযু করতেন। তাঁরা মসজিদে বসে বড়ো পাত্র চাইতেন, তার মধ্যে ওযু করতেন।[১৮]

৩. মসজিদে দস্তরখান বিছানো

হযরত ওসমান (রা) ইবাদাতকারী, ই'তিকাফকারী, মুসাফির, ফকীর এবং মিসকীনদের জন্য মসজিদে দস্তরখান বিছিয়ে রাখতেন[১৯] (অর্থাৎ তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে রাখতেন)।

৪. মসজিদে শোয়া

মসজিদে শোয়া মুবাহ। আহলে সুফ্‌ফাগণ মসজিদে নববীতেই থাকতেন এবং সেখানেই ঘুমুতেন।[২০] হযরত ওসমান (রা) তাঁর খিলাতকালে মসজিদে কাইলুলা* করতেন। যখন শোয়া থেকে ওঠতেন তাঁর পিঠের দু পাশে চাটাইয়ের দাগ দেখা যেত। তিনি বলতেন—দেখো এ হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন, দেখো এই হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন।[২১]

-(আরো দেখুন 'ইমরাত' শিরোনাম)

৫. মসজিদে বসে কাজকর্ম করা

মসজিদে কাজকর্ম করা যেমন কাপড় সেলাই করা, ব্যবসা বাণিজ্য করা কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো কাজকর্ম করা জায়েয নেই। কারণ মসজিদ কাজের জন্য তৈরী করা হয়নি। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হযরত ওসমান (রা) মসজিদে বসে এক দর্জিকে কাপড় সেলাই করতে দেখলেন। তিনি তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেবার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম-আমীরুল মুমিনীন! অনেক সময় মসজিদ ঝাড় দেয়া, মসজিদে পানি ছিটানো এবং মসজিদের দরোজা বন্ধ করার জন্য লোক নিয়োগ করা হয় ? তিনি বললেন-আবুল হাসান ! আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, جنبوا مساجدكم صناعكم 'তোমরা মসজিদকে কাজের জায়গা ও উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ো না।[২২]

৬. মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া।

-(বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

৭. মসজিদে নববীর সংস্কার এবং সেখান থেকে মনযোগ আকর্ষণকারী বস্তুর অপসারণ

হযরত ওসমান (রা) ২৯ হিজরীতে মসজিদে নববীর ইমারত সংস্কার করেন এবং কিছু সম্প্রসারণও করেন। তিনি মসজিদের দেয়ালে কারুকাজ করা পাথর লাগিয়েছিলেন এবং চুনকাম করিয়েছিলেন। খুটিগুলো কাঁচা ইটের পরিবর্তে পাথর দিয়ে ঢালাই করে দিয়েছিলেন। তাঁর সংস্কার কাজের পর মসজিদের পরিধি দাঁড়ায় দৈঘ্যে ৪৮০ ফুট এবং প্রস্থে ৩৯০ ফুট।

তিনি মসজিদের দেয়ালের উচ্চাতাও বৃদ্ধি করেন এবং ছাদের কাছাকাছি আলো বাতাস চলাচলের জন্য দেয়ালে ভেন্টিলেটারের ব্যবস্থা রাখেন।[২৩]

---

*দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে বিশ্রাম নেয়াকে কাইলুলা বলে।-অনুবাদক।

www.amarboi.org

মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি ঝাড়বাতির মত অনেক সৌন্দর্য-উপকরণও মসজিদের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো, যিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন তিনিই মুগ্ধ হয়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। হযরত ওসমান (রা) এ খবর পেয়ে সেগুলো মসজিদ থেকে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।[২৪]

–(আরো দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

মাসলাহাত (مصلحة)–স্বার্থ, কল্যাণ

জনসাধারণের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেয়া।

–(বিস্তারিত দেখুন 'আসির' শিরোনাম)

মাহর (مهر)–দেনমোহর, মোহরানা

বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'নিকাহ' শিরোনাম।

মীকাত (ميقات)–ইহরাম বাঁধার স্থান

হাজ্জ এবং ওমরার জন্য মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

–(বিস্তারিত দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

মুকাতাব (مكاتب)–মুক্তি চুক্তিকৃত গোলাম

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'রিককুন' শিরোনাম।

মুদাব্বার (مدبر)–এক শ্রেণীর গোলাম

ঐ গোলাম বা ক্রীতদাসকে মুদাব্বার বলা হয় যার মুক্তি মনিবের মৃত্যুর শর্তে ঝুলিয়ে রাখা হয়।–(বিস্তারিত দেখুন 'রিককুন' শিরোনাম)

মুফলিস (مفلس)–নিঃস্ব, দেউলিয়া

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ফাল্‌স' শিরোনাম।

মুফাওওয়াযাহ (مفوضة)–তালাক গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলা

তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এমন মহিলাকে মুফাওওয়াযাহ বলা হয়।

–(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'তালাক' শিরোনাম)

মুযদালিফা (مزدلفة)–একটি স্থানের নাম

–আরাফাত থেকে মুযদালিফা যাত্রা।–(বিস্তারিত 'হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

মুযারা'আহ (مزارعة)–বর্গাচাষ

১. সংজ্ঞা

মুযারা'আহ বলা হয় নিজের জমি চাষ করার জন্য এই শর্তে কাউকে দেয়া যে, উৎপাদিত ফসল দুজনের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

www.amarboi.org

২. শরঈ ভিত্তি

বর্গাচাষ শরী'আহ সম্মত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্ধেক ফসল দেয়ার শর্তে খায়বারের ইহুদীদের কাছে জমি বর্গা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)ও এ পদ্ধতি বহাল রেখেছিলেন।[২৫] হযরত ওসমান (রা) এক-তৃতীয়াংশ ফসল দেবার শর্তে তার জমি বর্গা দিতেন।[২৬]

মুযারাবা/মুদারাবা (مضاربة)—অংশীদারী কারবার

এমন অংশীদারী কারবারকে মুযারাবা বলে যে কারবারে পুঁজি একজনের এবং শ্রম অন্যজনের।—(বিস্তারিত দেখুন 'শিরকাহ' শিরোনাম)

মূযিহা (موضحة)—গুরুতর জখম

—যে আঘাত হাড়ের ওপরিভাগের ঝিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে এবং হাড় দেখা যায় তাকে মূযিহা বলে।

—মূযিহা জখমের দিয়াত।—(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

মুয়াল্লিফাতু কুলুবুহুম (المؤلفة قلوبهم)—হৃদয় আকৃষ্ট করা

মুয়াল্লিফাতু কুলূবকে যাকাতের অর্থ না দেয়া।—(বিস্তারিত দেখুন 'যাকাত' শিরোনাম)

মুরাবাহাত (مرابحة)—লভ্যাংশ বন্টনের ভিত্তিতে ব্যবসা

লাভ ভাগাভাগির শর্তে ব্যবসা পরিচালনাকে মুরাবাহাত বলে।

—বায়ে মুরাবাহাত।—(বিস্তারিত জানার জন্য 'বায়' শিরোনাম দেখুন)

মুশা' (مشاع)—সাধারণ/একাধিক মালিকানাধীন বস্তু

—এমন বস্তুকে মুশা' বলা হয় যা একাধিক মালিকানাধীন এবং কোনো মালিকের অংশই নির্দিষ্ট নয়।

মুশা'র ক্রয় বিক্রয়

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'বায়' শিরোনাম।

মুহাল্লিল (محلل)—তাহলীলকারী/যে অন্যের স্ত্রীকে হালাল করে দেয়

—তাহলীলকারীর বিয়ে।—(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'তাহলীল' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'ম' বর্ণের তথ্যসূত্র

১. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১০।
২. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫২৪ ; সাফওয়াতুস সাফওয়া, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪।
৩. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৭৫।
৪. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭২৫।
৫. সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২০।
৬. আল মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-২২৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৬৫ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭২১; আল মাজমু', ৫ম খণ্ড, পৃ-২৩৮ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৭৪ ; নাইলুল আওতার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১১৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৫৫।
৭. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১১৭।
৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫২ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩১ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৫৫।
৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৪।
১০. জামি' আত তিরমিযি সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থ।
১১. কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৩৮০৯৩।
১২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮৮।
১৩. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৪০।
১৪. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৪৫।
১৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬, ৩৭১ ; ১০ম খণ্ড, পৃ-১৩৬ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২১৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৪৫ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৬৯৫ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬৮ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৯১।
১৬. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৪৭ ; আল মুহাল্লী, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৬ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৯৯।
১৭. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৩৬।
১৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২০৬।
১৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৪৮।
২০. আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৪১।
২১. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৪৭ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮২।
২২. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩১৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৮১।
২৩. আল মাসাজিদ-ডঃ হুসাইন মুনাস।
২৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৯।
২৫. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১৪ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩৬০, ৩৬১, ৩৮৪।
২৬. কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পৃ-১০৭।

www.amarboi.org

য

যফার (ظفر)-নখ

যিনি কুরবানী দেয়ার জন্য পশু ক্রয় করবেন তিনি কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত নখ কাটা থেকে বিরত থাকবেন।'-(বিস্তারিত দেখুন 'আযহিয়াহ' শিরোনাম)

যাওজ (زوج)—স্বামী

(এ প্রসঙ্গে আরো দেখা যেতে পারে–'নিকাহ', 'তালাক', 'ঈলা', 'যিহার' এবং 'খুলা' শিরোনাম)

–ওয়ারিশীস্বত্ব বণ্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বণ্টন করা যাবে না।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

–উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বামীর বিভিন্ন অবস্থা।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

–উত্তরাধিকারী হিসেবে স্ত্রীর বিভিন্ন অবস্থা।–(ঐ)

–মৃত স্ত্রীকে স্বামী গোসল দিতে পারেন।–('মাওত' শিরোনাম দেখুন)

যাওয়ায়িদ (زوائد)—

অধিকারীকে তার অধিকার প্রত্যাবর্তন করা হবে।

–(বিস্তারিত দেখুন–'ইসতিহকাক' শিরোনাম)

যাকাত (زكاة)—

১. সংজ্ঞা

সাহিবে নিসাব* ব্যক্তির সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।

২. যেসব সম্পদে যাকাত ফরয হয়

নগত টাকা, ব্যবসার সম্পদ, জমি থেকে উৎপন্ন ফসল এবং গবাদি পশুর যাকাত আদায় করা ফরয। এ ব্যাপারে সমস্ত উম্মত ঐকমত্য। ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করবো। হযরত ওমর (রা) তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে এসে ঘোড়ার যাকাত আদায় শুরু করে দিয়েছিলেন। এমনকি হযরত ওসমান (রা)-ও তাঁর ঘোড়ার যাকাত ওমর (রা)-এর কাছে প্রদান করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন তিনি ঘোড়ার যাকাত আদায়ে বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেন। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আদায় করতেন তার থেকে তা গ্রহণ করা হতো এবং ঘোড়ার বাবদ সেই পরিমাণ টাকা পরিশোধ করা হতো যে পরিমাণ টাকা হযরত ওমর (রা)-এর সময় দেয়ার প্রচলন ছিলো।[১]

৩. কোনো সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

---

* যদি কোনো ব্যক্তির নিকট সারা বছরের ব্যয়ভার নির্বাহের পর সাড়ে সাত ভরি সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা তার সমমূল্যের নগদ টাকা বা সম্পদ এক বছর পর্যন্ত তার কাছে জমা থাকে অথবা ৫টি উট বা ৩০টি গরু বা ৪০টি ছাগল ভেড়া থাকে তাকে শরঈ পরিভাষায় সাহিবে নিসাব বলে।–অনুবাদক

www.amarboi.org

কোনো সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া প্রয়োজন।

[৩.১] নিম্নোক্ত মাল নিসাব পরিমাণ হওয়া (যদি তাৎক্ষণিক আদায়যোগ্য ঋণ না থাকে)ঃ

–সোনা ২০ মিসকাল, রূপা দুশ' দিরহাম, উট পাঁচটি, ছাগল-ভেড়া চল্লিশটি থাকলে সমস্ত উম্মতের মতে যাকাত ফরয। আর উল্লেখিত মালের পরিমাণকে নিসাব বলা হয়। হযরত ওমর (রা) গরুর নিসাব উটের নিসাবের ওপর কিয়াস করে পাঁচটির কথা বলেছেন।[২] হযরত আলী (রা)-এর নিকট গরুর নিসাব ৩০টি।[৩]

যদি সাহিবে নিসাব ঋণগ্রস্ত থাকেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক হয়–তাহলে ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে। (যদি তা নিসাব পরিমাণ থাকে)। হযরত ওসমান (রা) মিম্বারে খুতবা দেয়ার সময় বলতেন—যাকাতের মাস এসে গেছে, তোমাদের মধ্যে যারা ঋণগ্রস্ত এবং ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তারা যেন ঋণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট মাল (যাকাত প্রদান করে) পবিত্র করে নেয়।[৪]

যদি সাহিবে নিসাব কাউকে ঋণ প্রদান করে থাকেন এবং সেই ঋণ চাহিবামাত্র আদায় করতে সক্ষম হন, এমতাবস্থায় সেই টাকারও যাকাত প্রদান করতে হবে। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—এরূপ ঋণেরও যাকাত প্রদান করতে হবে যে ঋণ তোমরা চাহিবামাত্র আদায় করতে সক্ষম। তদ্রূপ কোনো ধনী ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত থাকেন এবং তোমাদের লজ্জা বা ভদ্রতার কারণে তাদের কাছে না চাইতে পারো তাহলে সেই টাকারও যাকাত আদায় করতে হবে।[৫] কারণ এ অবস্থায় প্রাপ্য টাকা আমানত বলে বিবেচিত হবে।

[৩.২] মাল নিজ মালিকানায় পূর্ণ এক বছর থাকতে হবে ঃ কোনো মাল পূর্ণ এক বছর নিজ মালিকানাধীনে না থাকলে সেই মালের যাকাত প্রদান ফরয নয়।[৬]

অবশ্য জমিতে উৎপন্ন ফসলের ব্যাপারে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়।

৪. ঘোড়ার যাকাত

এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ার যাকাত আদায় করতেন না।[৭]

বরং তিনি বলেছেন—কোনো মুমিনের ওপর তার মালিকানাধীন দাস-দাসী ও ঘোড়ার যাকাত নেই।[৮]

এজন্য হযরত আবু বকর (রা)-ও ঘোড়ার যাকাত আদায় করতেন না। হযরত ওমর (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে এ মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে (সিরিয়ার) কিছু মুত্তাকী লোক হযরত ওমর (রা)-এর নিয়োগকৃত গভর্নর আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নিকট এসে আবেদন করলেন—আমাদের ঘোড়া ও দাস-দাসীর যাকাত গ্রহণ করুন। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং হযরত ওমর (রা)-এর নিকট দিক-নির্দেশনা চেয়ে লিখলেন। হযরত ওমর (রা)-ও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। সেসব লোক মদীনায় এসে হযরত ওমর (রা)-এর সাথে দেখা করলেন এবং বললেন—ঘোড়া ও গোলাম আমাদের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত কাজেই এগুলোর যাকাত গ্রহণ করা হোক। ওমর (রা) বললেন—আমি এরূপ সম্পদের যাকাত গ্রহণ করতে চাই না, যা আমার পূর্ববর্তী কেউ করেননি। তখন তিনি

www.amarboi.org

সাহাবা-ই-কিরামের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। হযরত আলী (রা) পরামর্শ দিলেন —যদি তাদের থেকে যাকাত গ্রহণ করলে তারা তাদের সম্পদ ও মনের পবিত্রতা অনুভব করে, তাহলে ভালো কথা ; তবে তা যেন ট্যাক্সের পর্যায়ে গিয়ে না দাঁড়ায় যা আপনার পরেও গ্রহণ অব্যাহত রাখা হবে। এ পরামর্শের পর হযরত ওমর (রা) প্রতিটি ঘোড়া এবং গোলামের জন্য দশ দিরহাম করে যাকাত গ্রহণ শুরু করে দিলেন। আর তার বিনিময়ে প্রতিটি ঘোড়ার খাদ্য বাবদ মাসিক দশ জারীব* এবং প্রতিটি গোলামের জন্য মাসিক দু জারীব করে আদায় করার অনুমোদন করলেন। তখন থেকে হযরত ওসমান (রা)-ও সেইভাবে তার ঘোড়ার যাকাত প্রদান করতে লাগলেন। তিনি তার যাকাত নিয়ে নিজেই হযরত ওমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হতেন।[৯]

পরবর্তীতে খিলাফতের রশি যখন হযরত ওসমান (রা)-এর হাতে আসে তখন তিনি কাউকে ঘোড়ার যাকাত প্রদানের নির্দেশও দেননি আবার কাউকে নিষেধও করেননি। যারা ঘোড়ার যাকাত প্রদান করতেন তাদেরকে ঘোড়ার খাদ্য বাবদ সেই পরিমাণ খাদ্য শস্য প্রদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন, যে পরিমাণ হযরত ওমর (রা) নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তী খলীফা হযরত আলী (রা)-এর সময়ও এভাবে চলতে থাকে। কিন্তু যখন খিলাফতের দায়িত্ব হযরত মুআবিয়া (রা)-এর কাছে চলে যায় তখন তিনি হিসেব করে দেখেন ঘোড়ার খাদ্য বাবদ যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা ঘোড়ার যাকাত বাবদ প্রাপ্ত অর্থের চেয়ে বেশী। তাই তিনি ঘোড়ার যাকাত গ্রহণ বন্ধ করে দেন। তখন থেকে তিনি ঘোড়ার যাকাতও উসূল করতেন না এবং তার খাদ্য বাবদও কিছু প্রদান করতেন না।[১০]

৫. যাকাত সংগ্রহ

যাকাত সংগ্রহ করা মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। আমওয়ালে বাতিনা বা নগদ অর্থ সাহিবে নিসাব নিজে হিসেব করে যাকাত আদায় করবেন। আর আমওয়ালে যাহিরা অর্থাৎ গবাদি পশু এবং খাদ্য শস্যের হিসেব স্বয়ং রাষ্ট্র করবে তারপর যাকাত উসুল করবে। ইমাম কাসানী বাদায়ি ওয়াস সানায়ি গ্রন্থে বলেন—

"যাকাত আদায় করার দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্রপতির। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং প্রথম তিন খলীফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) এর সময়ের প্রথমদিকে সরকারীভাবে হিসেব করে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফাতের শেষ দিকে লোকদের প্রাচুর্য বেড়ে গিয়েছিলো। তাই তিনি ধারণা করেছিলেন সরকারীভাবে হিসেব করে এত সম্পদের যাকাত আদায় করা লোকদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে, এজন্য তিনি যাকাত আদায়ের দায়িত্ব তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ছেড়ে দেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। যাদের নেতৃত্বে তা সংগ্রহ করা হতো তারা খলীফার প্রতিনিধি বা নায়েব হিসেবে পরিগণিত হতেন।"

হযরত আয়িশা বিনতু কুদামা ইবনু মাযউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন—আমি যখনই হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট বাইতুলমাল থেকে আমার ভাতা গ্রহণ

* ফিকহে ওসমান (রা)-এর উর্দু তরজমায় জারীব সম্পর্কে ভাষ্য দেয়া হয়েছে এভাবে-জারীব হচ্ছে ফসল পরিমাপের একটি একক। যার পরিমাণ পৌনে সাত মনের কাছাকাছি। কিন্তু এ ভাষ্য আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয় না কারণ মাসিক দু জারীব বা চৌদ্দ মন খাদ্য শস্য প্রতিটি গোলামের মাথা পিছু দেয়া এবং প্রতিটি ঘোড়ার মাথা পিছু সত্তর মন শস্য প্রদান অবাবস্তব বলেই মনে হয়।-অনুবাদক

www.amarboi.org

করতে যেতাম তখনই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে এমন কোনো সম্পদ আছে কি যার ওপর যাকাত ফরয ? যদি তার উত্তর হাঁ বাচক হতো তাহলে তিনি ভাতা থেকে যাকাতের অংশ কর্তন করে রাখতেন। আর যদি উত্তর না বাচক হতো তাহলে ভাতার পুরো অংশই দিয়ে দিতেন।[১১]

৬. যাকাতের সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া

খলীফা যাকাত বাবদ যেসব মাল সংগ্রহ করেন তা মূলত ফকীর, মিসকীন, মুসাফির প্রমুখের হক। তাই খলীফা যাকাতের মাল থেকে দুঃস্থদের উপকৃত হতে দিতে পারেন। এটি জায়েয আছে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) গরীবদেরকে যাকাতের উট সওয়ারী হিসেবে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনু আমর ইবনু সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-কে একদিন মক্কায় যেতে দেখলাম। তার সাথে যাকাতের উট ছিলো, যার ওপর লোকজন বসাছিলেন।[১২]

৭. যাকাত বণ্টনের খাত

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (التوبة : ٦٠)

"যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এটি হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সবকিছু জানেন, প্রজ্ঞাময়।"—(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফা-ই-রাশিদীন শুধু ওপরোক্ত খাতসমূহেই যাকাতের মাল বণ্টন করতেন। অবশ্য হযরত ওমর (রা) তার খিলাফতকালে মুয়াল্লিফাতুল কুলূব বা চিত্ত আকর্ষণের খাতে যাকাত বণ্টন বন্ধ করে দেন। তার যুক্তি ছিলো ইসলাম আর এখন এসবের মুখোপেক্ষি নয়।[১৩] পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-ও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। কেননা এ দুজনের কোনো একজন সম্পর্কে এ রকম কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে তিনি [হযরত ওমর (রা)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীত করেছেন বা] মুয়াল্লিফাতুল কুলূব-এর খাতে যাকাত দিয়েছেন।[১৪]

যাকাতুল ফিতর (زكوة الفطر)—সাদাকাতুল ফিতর/ফিত্‌রা

১. সংজ্ঞা

যাকাতুল ফিতর অর্থ সামর্থবান ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে রমযান মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ফিতরার নিয়তে গরীবদের মাঝে দান করে দেয়া।

২. ফিতরা প্রদান কাদের ওপর ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)

প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে তার নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে এবং স্ত্রী ও বাঁদীদের পক্ষ থেকে এবং তাদের গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করা বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব)।[১৫]

www.amarboi.org

এজন্য হযরত ওসমান (রা) তার স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকেও ফিতরা আদায় করে দিতেন।[১৬]

৩. ফিতরার পরিমাণ

প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তি তার এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে খেজুর এবং যব এক সা' আর গম হলে আধা সা' ফিতরা হিসেবে প্রদান করবেন।

যেমন হযরত ওসমান (রা) একবার খুতবায় বলেছিলেন ফিতরা হিসেবে খেজুর বা যব হলে এক সা'* এবং গম হলে আধা সা' প্রদান করতে হবে।[১৭]

যাবিল আরহাম (ذوى الارحام)–

যাবিল আরহামের ওয়ারিশী স্বত্ব।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

যামান (ضمان)–ক্ষতিপূরণ

১. সংজ্ঞা

যামান বলতে বুঝায় ক্ষতিগ্রস্ত কোনো জিনিসের জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ, যা ঐ জিনিসের বিনিময়ে দেয়া হয়, যদি তার বিনিময় সহজলভ্য হয় কিংবা তার মূল্য নির্ধারণ সম্ভবপর হয়।

২. ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্তাবলী

ক্ষতিগ্রস্ত কোনো মালের ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া প্রয়োজন ঃ

[২.১] ক্ষতিগ্রস্ত মালের অনুরূপ মাল ক্ষতিপূরণ হিসেবে মালিককে ফেরত দিতে হবে। যেমন হযরত ওসমান (রা) এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন—যার হাতে একটি উটের বাচ্চা মারা গিয়েছিলো। তিনি তাকে অনুরূপ আরেকটি বাচ্চা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার এক চুরির মামলায় (চোর তার চোরাই মাল ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছিলো) রায় দিয়েছিলেন—যদি অনুরূপ মাল ফেরত দেয়া সম্ভব হয় তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তা ফেরত দিতে হবে।[১৮]

যদি ক্ষতিগ্রস্ত মালের অনুরূপ মাল ফেরত দেয়া সম্ভব না হয় এবং তার মূল্য নির্ধারণ করে মূল্য পরিশোধ করা সহজতর হয় এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার মূল্য প্রদান করতে হবে। চোরাই মাল চোর নিজে ব্যবহার করছিলো, এমন এক মামলার রায়ে হযরত ওসমান (রা) বলেছিলেন—যদি অনুরূপ মাল প্রদান করা সম্ভব না হয় তাহলে তার মূল্য মালিককে প্রদান করতে হবে।[১৯]

তেমনিভাবে এমন এক ব্যক্তির মামলার—যার হাতে একটি শিকারী কুকুর মারা গিয়েছিলো এবং যার অনুরূপ কুকুর পাওয়া সম্ভব ছিলো না—রায়ে হযরত ওসমান (রা) বলেছিলেন—সেটির মূল্য বাবদ আটশ' দিরহাম ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।[২০]

–অনুরূপ আরেকটি মামলায় (এক ব্যক্তি ট্রেনিং দেয়া এক কুকুর মেরে ফেলেছিলো) কুকুরের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিশটি উটের মূল্য পরিশোধ করার রায় দিয়েছিলেন।[২১]

---

* এক সা' = ৩ কেজি ৭৩২ গ্রাম (প্রায়) এবং আধা সা' = ১ কেজি ৮৬৬ গ্রাম (প্রায়)।–অনুবাদক

www.amarboi.org

কুকুরের মূল্য বাবদ এতবেশী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কারণ ছিলো, ট্রেনিং প্রাপ্ত কুকুরের কোনো বিনিময় হয় না। না তার বিশেষত্বে না তার গুণে। তদ্রূপ এক ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন যিনি এক বাঁদীকে স্বাধীন মহিলা মনে করে বিয়ে করেছিলেন। তার গর্ভে সন্তানও পয়দা হয়েছিলো। এ মামলার রায়ে বলেছিলেন—বাঁদীর মালিককে প্রত্যেক সন্তানের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তানকে নিজের কাছে রাখতে পারবেন (অন্যথায় বাঁদীর সাথে সাথে সেই সন্তানের মালিকও বাঁদীর মনিব হয়ে যাবেন)। কারণ মানুষের কোনো বিনিময় হতে পারে না।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইসতিহকাক' শিরোনাম)।

এই সূত্রের ভিত্তিতে মানুষের কোনো শারীরিক ক্ষতি সাধন করলে যে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হয় তা স্বাধীন ব্যক্তি হলে তার দিয়াতের অনুপাতে এবং ক্রীতদাস হলে তার মূল্যের অনুপাতে।–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম)

–হেরেমের মধ্যে হারানো বস্তুর ক্ষতিপূরণ তার প্রকৃত মূল্যের অতিরিক্ত নির্ধারণ করা যায়।–('লুকতাহ' শিরোনাম দেখুন)

–হেরেমের মধ্যে সংঘটিত অপরাধের জরিমানাও পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়া যায়।
–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

[২.২] সংশ্লিষ্ট মাল যেন প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। এজন্য হযরত ওসমান (রা) ফায়সালা দিয়েছেন—কোনো বিক্রিত মাল যদি বিক্রেতার নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেজন্য ক্রেতাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[২২]

যারবুন (ضَرْبٌ)-আঘাত

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছেকৃত কাউকে আঘাত করে সে জন্য তার থেকে কিসাস নেয়া হবে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) থাপ্পড় বা বেত্রাঘাতের কিসাস গ্রহণ জরুরী মনে করতেন।[২৩]

মনে হয় হযরত ওসমান (রা) শুধু সেই আঘাতের কিসাস নেবার পক্ষপাতি ছিলেন, যে আঘাতের প্রতিক্রিয়া শরীরের অন্য কোথাও বিস্তৃত হয় না। আর যদি আঘাত এমন হয়, যার প্রতিক্রিয়া শরীরের অন্যত্র অনুভূত হয় সে জন্য শুধু কিসাস নেয়াই যথেষ্ট হবে না, সেই সাথে অন্য কোনো শাস্তিও প্রদান করতে হবে।

যেমন হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে—এরূপ এক ব্যক্তির মামলায় তিনি রায় দিয়েছিলেন যাকে পিটিয়ে মলদ্বার ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়া হয়েছিলো। তিনি ফায়সালা দিয়েছিলেন, আঘাতকারীর সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ তাকে দিয়াত স্বরূপ দিতে হবে।[২৪]

তদ্রূপ হযরত ওমর ইবনু আবদুল আযীয (রহ)-এর সময়ের ঘটনা। এক ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তিকে এমনভাবে মারধর করে, মারের চোটে সে পায়খানা করে দেয়। হযরত ওমর ইবনু আবদুল আযীয (রহ)-এর আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। তিনি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন এ ধরনের কোনো মামলার রায় সম্পর্কে তার জানা আছে কিনা। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ) বললেন—হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে এ ধরনের একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিলো। তিনি অপরাধীকে ৪০টি উট জরিমানা করেছিলেন।[২৫]–(আরো জানতে হলে দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

www.amarboi.org

যারূরাহ্ (ضرورة)—প্রয়োজন, জরুরত

–প্রয়োজনে দাঁত বাঁধানোর জন্য সোনার তার ব্যবহার।–('যাহাব' শিরোনাম দেখুন)

–যে ব্যক্তির সর্বদা পেশাব ঝরতে থাকে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন ওযু করে নেবেন।–('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

যাহাব (ذهب)—সোনা

একথার ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পুরুষের জন্য সোনা ব্যবহার করা হারাম। অবশ্য অপরিহার্য অবস্থার কথা ভিন্ন। যেমন কোনো ব্যক্তি তার দাঁত বাঁধানোর জন্য সোনার তার ব্যবহার করলো কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো প্রয়োজনীয়তা। হযরত ওসমান (রা) নিজেই দাঁত বাঁধানোর জন্য সোনার তার ব্যবহার করেছিলেন।[২৬]

–সোনার যাকাত।–(বিস্তারিত দেখুন 'যাকাত' শিরোনাম)

–সোনা দিয়ে যদি দিয়াত (রক্তপণ) পরিশোধ করা হয়, তার পরিমাণ।

–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

যিকরুল্লাহি তা'আলা (ذكر الله تعالى)—আল্লাহর স্মরণ/আল্লাহর যিকির

–হযরত ওসমান (রা)-এর মতে সত্যিকার যিকির তাই যা মনে বিনয় ও একাগ্রতার (খুশু খুজু) সৃষ্টি করে। তিনি মনে করতেন, যে ব্যক্তি নিয়ম মাফিক যিকির করবে এটি তার অন্তরের পরিচ্ছন্নতার দলিল। তিনি বলতেন—আমাদের অন্তর যদি পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহর যিকিরে কখনো বিরক্ত লাগতে পারে না।[২৭]

–খতমে কুরআন অর্থাৎ সূরা আন নাস তিলাওয়াতের পর তিনি সবসময় দু'আ করতেন।[২৮]

–নামাযের শুরুতে দু'আ পড়া।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

–দু'আ কুনূত।–(বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

যিনা (زنا)—ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্ভোগ

১. সংজ্ঞা

এমন ব্যক্তি যিনি মুকাল্লাফ,* স্বাধীন এবং যিনা হারাম হওয়ার ব্যাপারে জানেন এমন কোনো মহিলার যোনি দিয়ে যৌন সম্ভোগ করা, যে মহিলা তার জন্য হারাম এবং যে তার মালিকানাধীন বাঁদী নয় বা বাঁদী হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, তাকে যিনা বা ব্যভিচার বলে।

২. যিনা নিষিদ্ধ

আল্লাহ তা'আলা যিনাকে এবং তার এমন উপকরণ যা যিনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, হারাম (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلًا ۝ (بنى اسرائيل: ٣٢)

---

* বালিগ, বুদ্ধিমান, মুসলিম নারী পুরুষকে মুকাল্লাফ বলে।–(বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা–২ এর ভাষ্য–খ, পৃ–২২৪)।–অনুবাদক

www.amarboi.org

"তোমরা ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না, নিসন্দেহে তা অশ্লীল কাজ এবং খারাপ পথ।"–(সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৩২)

ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকে শুধু নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হয়নি সেই সাথে ব্যভিচারী মহিলাকে এ অনুভূতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়েছে যে, আর দশজন মহিলার চেয়ে তার মর্যাদা কম। এজন্য সে চায় পৃথিবীর সব মহিলা যেন তার মত অপকর্মে লিপ্ত হয়ে একই কাতারে এসে শামিল হয়। যাতে সে একাকী না থাকে। এজন্য অন্যান্য মহিলাকে তার কাতারে শামিল করার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। হযরত ওসমান (রা) একথার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন—ব্যভিচারী মহিলা চায় দুনিয়ার সব মহিলাই ব্যভিচারে লিপ্ত হোক।[২৯]

৩. ব্যভিচার কিভাবে প্রমাণিত হয়

সাক্ষ্যের দ্বারা যেমন ব্যভিচার প্রমাণিত হয় তেমনিভাবে ব্যভিচারীর স্বীকারোক্তির দ্বারাও ব্যভিচার প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে সমস্ত উম্মত ঐকমত্য। অবশ্য উভয় অবস্থায়ই প্রয়োজন স্পষ্ট ভাষায় ব্যভিচারের বর্ণনা দেয়া।

এ অপরাধের খোলাখুলি বর্ণনা করতে হবে, যেভাবে তা সংঘটিত হয়েছে। কারণ এমনও হতে পারে উভয়ে চুমো খেয়েছে কিংবা উভয় উভয়কে জড়িয়ে ধরেছে অথবা হাসি তামাশা করেছে, এটিকেই সে যিনা মনে করে বসেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মাইয আসলামীকে জিজ্ঞেস করেছেন—তুমি কি জানো যিনা কাকে বলে? তিনি জবাবে বলেছিলেন—হাঁ, আমি জানি যিনা কাকে বলে। তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যিনার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন।

তদ্রূপ যারা যিনার সাক্ষ্য দেবেন তাদের উচিত পুরো ঘটনা যা তারা দেখেছেন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা। যিনার অপরাধ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ সাক্ষীগণ এরূপ সাক্ষ্য না দেবেন যে, সুরমা শলাকা যেমন সুরমাদানীর ভেতর থাকে তেমনিভাবে অভিযুক্ত পুরুষের লিঙ্গ অভিযুক্ত মহিলার যোনির ভেতরে তারা দেখেছেন।

ইমাম ইবনু সীরীন বর্ণনা করেছেন—কিছু লোক হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ দায়ের করলেন। হযরত ওসমান (রা) তাদের দিকে ফিরে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা এভাবে কাজটি সংঘটিত হতে দেখেছো? উদ্দেশ্য ছিলো তোমরা সেই কাজকে এরূপ অবস্থায় দেখেছো কিনা? ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যভিচার অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ চারজন পুরুষ উল্লেখিত পদ্ধতিতে সাক্ষ্য না দেবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج -(النساء : ٥)

"কোনো মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪)

৪. যিনার শাস্তি

যখন স্বাধীন ও বিবাহিত কোনো পুরুষ কিংবা মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তাদের শাস্তি পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড।

www.amarboi.org

হযরত ওসমান (রা)-এর সময় এক বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। হযরত ওসমান (রা) তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। অবশ্য তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মুহূর্তে হযরত ওসমান (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।[৩১]

স্বাধীন বিবাহিত নারী পুরুষের যিনার শাস্তি প্রদানে বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দুটো এক সাথে প্রয়োগ করা যাবে না। শুধু পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।[৩২]

হাঁ যদি ব্যভিচারী স্বাধীন কিন্তু অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের শাস্তি প্রদান করা যাবে। চাই সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। হযরত ওসমান (রা) এক অবিবাহিত মহিলাকে যিনার অপরাধে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য মদীনা থেকে খায়বারে নির্বাসনের দণ্ড প্রদান করেছিলেন।[৩৩]

৫. ব্যভিচারী মহিলার গর্ভ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

যদি ব্যভিচারী মহিলা বিয়ে করতে চায় তাহলে তার জন্য ইসতিব্‌রা প্রয়োজন।

–(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'ইসতিবরা' শিরোনাম)

যিবদা' (ضبدع)—ব্যাঙ

যদি এমন প্রাণী মারা যায় যা উভচর (অর্থাৎ জলে স্থলে সমানভাবে বিচরণ করে) যেমন ব্যাঙ, কাছিম ইত্যাদি, তা খাওয়া জায়েয নেই।[৩৪]

যিম্মী (ذمى)—নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিক

–আহলে কিতাবদের যবাহকৃত প্রাণী খাওয়া এবং তাদের মহিলাদেরকে বিয়ে করা বৈধ।–(দেখুন, 'কিতাববিয়্যুন' শিরোনাম)

–যিম্মীদের ওপর জিযইয়া প্রদান বাধ্যতামূলক।–('জিযইয়া' শিরোনাম দেখুন)

–মুসলিম কর্তৃক যিম্মীদের ওপর অপরাধ সংঘটিত হওয়া।

–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

–যিম্মীদের দিয়াতের পরিমাণ।–('জিনাইয়া' শিরোনাম দেখুন)

যিহার (ظهار)—স্ত্রীকে মুহাররাম মহিলার সাথে তুলনা দেয়া

১. সংজ্ঞা

যিহার বলা হয় কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কিংবা স্ত্রীর শরীরের কোনো অংশের সাথে এমন কোনো মহিলার তুলনা করা যার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা তার জন্য হারাম।

২. যিহারের ভাষা

যিহারের ভাষা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বললেন—'তুমি আমার কাছে এমন হারাম যেমন আমার মায়ের পিঠ।' হযরত ওসমান (রা)-এর মতে 'তুমি আমার জন্য হারাম' একথার দ্বারাও যিহার হয়ে যায়। যদি সে তালাকের নিয়তে একথা না বলে থাকে।[৩৫]

www.amarboi.org

৩. যিহারের কাফ্‌ফরা

যিহারের দ্বারা স্ত্রী হারাম হয় না এবং তালাকও হয় না। তবে যিহারের কাফ্‌ফারা প্রদান না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে বিছানায় যাওয়া যাবে না। যিহারের কাফ্‌ফারা হিসেবে একজন ক্রীতদাস মুক্তি, সম্ভব না হলে একাধারে দু মাস রোযা রাখা, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে ষাটজন মিসকীনকে দুবেলা খাওয়াতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○(المجادلة : ٢-٤)

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীকে মা বলে যদিও তারা তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে পেটে ধরেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথা বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যারা তাদের স্ত্রীকে মা বলে, অতপর তাদের কথা প্রত্যাহার করে তাদের কাফ্‌ফারা—একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একজন দাসকে মুক্তি করে দেবে। এটি তোমাদের জন্য উপদেশ। তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ তা খবর রাখেন। যার সামর্থ নেই সে যেন স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দু মাস রোযা রাখে। তাও যদি না পারে তাহলে ষাটজন মিসকীনকে (দুবেলা) খাওয়াবে। যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"–(সূরা আল মুজাদালা ঃ ২-৪)

যুহর (ظهر)–যোহর নামায

হযরত ওসমান (রা) যোহর নামাযে কি কি সূরা পড়তেন।–('সালাত' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

'য' বর্ণের তথ্যসূত্র

১. ফিকহে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) 'যাকাত' শিরোনাম।
২. ঐ
৩. ফিকহে হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা) 'যাকাত' শিরোনাম।
৪. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, ঋণগ্রস্তের যাকাত, ১ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৮৪ ; আল মাজমু', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৬২ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬২৬, ৬৮৮ ; ৩য় খণ্ড, পৃ-৪১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৮ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯২ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৪৩৭ ; কিতাবুল খারাজ-ইয়াহইয়াহ ইবনু আদাম, পৃ-১৬৩।
৫. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৪৩০ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৪৯ ; আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৯৪ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৬।
৬. আল মাজমু, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩২৪।
৭. মুসনাদ-ইমাম আহমদ ইবনুল হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮।
৮. সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম (উভয় গ্রন্থে কিতাবুল যাকাত)।
৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৫ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৪ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২২৭, ২২৯ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৪৬৫ ; বাদায়ি' আস সানায়ি' ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৬২০।
১০. বাদায়ি' আস সানায়ি', ২য় খণ্ড, পৃ-৭।
১১. সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ, পৃ-১০৯ ; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ-৪১২।
১২. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৯।
১৩. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা), যাকাত শিরোনাম।
১৪. আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪২৭।
১৫. আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৩২।
১৬. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪০ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৮০।
১৭. আল মুহাল্লী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১২৯ ; আল মাজমু', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৭।
১৮. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭০।
১৯. ঐ
২০. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-৫৩৪।
২১. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭।
২২. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৮৪।
২৩. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৮।
২৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৪।
২৫. ঐ
২৬. তাবাকাত ইবনু সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৮।
২৭. কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ-২৮৭।
২৮. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭১।
২৯. আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৯৬।
৩০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩১।
৩১. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২২০।
৩২. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৬০।
৩৩. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৪ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৬৭।
৩৪. আল মাজমু', ৯ম খণ্ড, পৃ-৩১।
৩৫. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৫৪, ৩৪৩।

www.amarboi.org

র

রজম (رجم)—পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড

সংজ্ঞা

কোনো ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকে রজম বলে। এটি মুহ্সিন ব্যভিচারীর শাস্তি।-(বিস্তারিত দেখুন 'যিনা' শিরোনাম)

রদ (رد)*—পুনরাবৃত্তি/প্রত্যাবর্তিত হওয়া

-ওয়ারিশীস্বত্বে রদ এর গুরুত্ব।-(বিস্তারিত দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

-এমন বস্তু যা অন্যের হক, তা মালিকের নিকট হস্তান্তর করা বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব)।
-(বিস্তারিত দেখুন 'ইসতিহকাক' শিরোনাম)

রমল (رمل)—তাওয়াফের সময় কাঁধ উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলা

তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা।
-(বিস্তারিত জানতে হলে 'হাজ্জ' শিরোনাম দেখুন)

রাজা'আত (رجعت)—তালাক প্রত্যাহার করা

১. সংজ্ঞা

রাজায়াত বলতে বুঝায় যাকে তালাকে রিজঈ প্রদান করা হয়েছে, এমন মহিলার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরায় শুরু করা।

২. রাজা'আতের নিয়ম কানুন

যদি কেউ তার স্ত্রীকে রিজঈ তালাক দেয় তাহলে স্ত্রী তৃতীয় হায়েয থেকে পবিত্রতার গোসল করে নামায আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তাকে প্রত্যাহার করতে পারেন। যদি তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার সাথে সাথে নামাযের সময় শুরু হয়ে যায় এবং সে গোসল করতে বিলম্ব করে তাহলে সেই ওয়াক্তের নামায তার ওপর ফরয হিসেবে গণ্য হবে। আবু উবাইদা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন, হযরত ওসমান (রা) আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার স্বামী কোন্ সময় পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতে পারেন? তিনি বললেন—এ সুযোগ স্ত্রীর তৃতীয় হায়েয থেকে পবিত্রতার পর পুনরায় নামায ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আবু উবাইদা (রা) বলেন—আমার জানা মতে হযরত ওসমান (রা) এ মাসয়ালার ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[১]

---

* রদ শব্দের আভিধানিক অর্থ ফিরিয়ে দেয়া, প্রত্যাবর্তিত হওয়া, ইলমে ফারাইযের পরিভাষায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ আসহাবে ফুরূজদের মধ্যে বন্টন করার পর অবশিষ্ট যে সম্পদ থেকে যায় তা আসাবাদের কেউ না থাকলে পুনরায় আসহাবে ফুরূজদের মাঝে বন্টন করে দেয়াকে রদ বলে।-লেখক

www.amarboi.org

রাযা'আত (رضاعة)—স্তন্যদান, দুধ পান করানো

রাযা'আত সম্পর্কে আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর কোনো রিওয়ায়েত পাইনি। শুধু এতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে যে, তিনি রাযা'আত প্রমাণের জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। ইবনু জুরাইহ ইমাম শিহাব যুহুরী থেকে বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফাতকালে এক কালো মহিলা এমন তিন দম্পত্তির নিকট গেলেন যারা বিয়ে শাদীর পর দাম্পত্য জীবন যাপন করছিলেন। ঐ মহিলা দাবী করলেন তাদের সবাইকে তিনি দুধ পান করিয়েছেন। হযরত ওসমান (রা) তার একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।[২]

ইমাম আওযাঈ (রহ) বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) একজন মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চার দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন।[৩]

তেমনিভাবে একবার এক মহিলা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, আমি অমুক স্বামী স্ত্রীকে আমার দুধ পান করিয়েছি। হযরত ওসমান (রা) বললেন—'সেই মহিলা কা'বা শরীফের নিকট গিয়ে হলফ করে একথা বলবে।' যখন তাকে এরূপ করতে বাধ্য করা হলো তখন তিনি তার কথা প্রত্যাহার করে নিলেন।[৪]

রা'স (رأس)—মাথা

–ওযুর সময় মাথা মাসেহ করা।–('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

–ইহরাম বেঁধেছেন এমন ব্যক্তির মাথা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ।–('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

–মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কাফনের সময় তার মাথা ঢাকা যাবে না।

–(বিস্তারিত 'ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

রাহেম/রেহেম (رحم)—আত্মীয়তা

১. সংজ্ঞা

রাহেম বলতে বুঝায় আত্মীয় স্বজনকে।

২. আত্মীয়তার প্রকার

আত্মীয়তা দু প্রকারের। নিচে আলোচনা করা হলো।

[২.১] মুহাররাম আত্মীয় ঃ মুহাররাম আত্মীয় বলতে বুঝায় যাদের সাথে বিয়ে হারাম। এর মধ্যে কতিপয় এমন যারা মূল বা উর্ধতন, যেমন–পিতা, দাদা, পরদাদা, নানা প্রমুখ। আবার কতিপয় এমন যারা তার শাখা যেমন–ছেলে, নাতি, পুতি প্রমুখ। তৃতীয় এমন কতিপয় আত্মীয় যারা পিতার শাখা, যেমন–ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাতিজী প্রমুখ। চতুর্থ আরেকটি শাখা যা এসেছে দাদা ও নানার পক্ষ থেকে, যেমন–চাচা, ফুফু, মা, খালা প্রমুখ। এদের নিষেধাজ্ঞা শুধু এক পুরুষ পর্যন্ত।

[২.২] গাইর মুহাররম আত্মীয় ঃ অনুচ্ছেদে যাদের তালিকা দেয়া হয়েছে তারা ছাড়া আর সকলেই গাইর মুহাররাম শ্রেণীর আত্মীয় স্বজন। যেমন–ফুফাতো ভাই/বোন, চাচাতো ভাই/বোন, মামাতো ভাই/বোন, খালাতো ভাই/বোন প্রমুখ। এ সম্পর্কে আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর কোনো বর্ণনা পাইনি।

www.amarboi.org

৩. যাবিল আরহামের মীরাস

(বিস্তারিত জানার জন্য 'ইরছ' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

রিক্‌কুন (رق)—দাসত্ব

গোলামী সংক্রান্ত—হযরত ওসমান (রা)-এর মতামতকে আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামে আলোচনা করবো। ১. সংজ্ঞা, ২. গোলামীর প্রকার, ৩. গোলামীর প্রভাব ও ফলাফল। নিচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

১. সংজ্ঞা

গোলামী বলতে বুঝায়—রাষ্ট্র কর্তৃক কারো ক্ষমতা-ইখতিয়ারকে কেড়ে নেয়া, যা মূলত কাফির হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে প্রদত্ত সাজা।

২. দাসত্বের প্রকার

দাসত্ব চার প্রকার—১. কিন্নু, ২. মুদাব্বার ৩. মুকাতাব. ৪. উম্মু ওয়ালাদ।

[২.১] **কিন্নু** ঃ এমন গোলাম বা দাসদাসীকে কিন্নু বলা হয় যার মধ্যে দাসত্বের পুরো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যে মুকাতাব, মুদাব্বার ও উম্মু ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। গোলাম বা বাঁদী শব্দটি এদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

[২.২] **মুদাব্বার** ঃ এমন গোলাম বা বাঁদীকে মুদাব্বার বলা হয় যার মুক্তি মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়। যেমন, মনিব বললেন—'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।' এ ধরনের গোলাম বাঁদী মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে মুক্ত বলে গণ্য হয়।

যদি মুদাব্বার বিবাহিত বাঁদী হয় এবং তাকে মুদাব্বার ঘোষণার পূর্বে তার সন্তানাদি থাকে তারা মালিকের গোলাম বাঁদী হিসেবেই গণ্য হবে। তবে মুদাব্বার ঘোষণার পর যদি ঐ বাঁদীর সন্তানাদি হয় তারাও তার সাথে মুক্ত হয়ে যাবে। আবদুর রহমান ইবনু ইয়াকুব যিনি বানু যুহাইনা গোত্রের এক শাখা বানু হিরকার মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন—বর্ণনা করেন, আমার দাদীর মনিব তার এক গোলামের সাথে আমার দাদীকে বিয়ে দেন। অতপর তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করেন। মুদাব্বার ঘোষণার পর তার গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তার কিছুদিন পর আমার দাদীর মনিব ইন্তিকাল করেন। যার ফলে তিনি মুক্ত হয়ে যান। তিনি মুক্ত হয়ে তার সন্তানকে মুক্ত ঘোষণা করার দাবীতে হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে মামলা দায়ের করেন। এ মামলার রায়ে হযরত ওসমান (রা) ঘোষণা করেন—'যে সন্তান তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করার পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তারা গোলাম বাঁদী হিসেবেই পরিচিত হবে। আর মুদাব্বার ঘোষণার পর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে সে মায়ের সাথে সাথে মুক্ত হয়ে যাবে।'[৫]

[২.৩] **মুকাতাব** [ক] সংজ্ঞা—মুকাতাব বলতে বুঝায়, গোলাম কিংবা বাঁদী কোনো কিছুর বিনিময়ে (মালিক থেকে) নিজের মুক্তির পরওয়ানা অর্জন করা।

[খ] মুকাতাবের বিধান ঃ মুকাতাব সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—যদি গোলাম বা বাঁদী তার মনিবের কাছে মুকাতাব হতে চায়, তাহলে তাদের এ আবদার মনিবের পুরা করা উচিত। অবশ্য এ ব্যাপারে মালিকের বুঝা উচিত, সে মুক্তি পাওয়ার পর কারো জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কিনা। বর্ণিত আছে—হযরত ওসমান (রা)-এর এক গোলাম

www.amarboi.org

হযরত যুবাইর (রা)-এর নিকট গিয়ে আবেদন করলো, তিনি যেন তার সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে বিনিময় গ্রহণ করে মুক্তি দেবার জন্য বলেন। হযরত যুবাইর (রা) সেই গোলামকে সাথে নিয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গেলেন। বললেন—'আমীরুল মুমিনীন ! আপনি এর থেকে বিনিময় গ্রহণ করে একে মুক্ত করে দিন।' একথা শুনে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—'হাঁ, আমি এরূপ করবো কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ না পেলে যে আমি কিছুই করতে পারবো না।' তিনি একথা দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন—

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْاهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا صلے

"তোমাদের গোলাম বাদীর মধ্যে যদি কেউ মুকাতাব এর আবেদন করে তাহলে তার সাথে চুক্তি করে নাও। যদি তোমরা বুঝতে পারো যে, তার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে।"

–(সূরা আন নূর ঃ ৩৩)

[গ] চুক্তিকৃত টাকা কিস্তিতে পরিশোধ ঃ হযরত ওসমান (রা) সম্ভবত মনে করতেন—মুকাতাব গোলাম বা বাঁদীর চুক্তিকৃত টাকা মালিকের কিস্তিকে গ্রহণ করা উচিত। যেন তাদের জন্য ব্যাপারটি সহজ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন চুক্তিকৃত টাকা কমপক্ষে দু কিস্তিকে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়া উচিত। তার প্রমাণ আমরা নিম্নোক্ত ঘটনায় পাই। একবার হযরত ওসমান (রা) তার এক গোলামের ওপর বিরক্ত হয়ে বলছিলেন—আমি তোমাকে শাস্তি দেবো এবং চুক্তিকৃত টাকা দু কিস্তিতে আদায় করে তোমাকে মুক্তি দেবো।[৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, চুক্তিকৃত টাকা যদি সর্বনিম্ন দু কিস্তির কমে আদায় করা গুনাহ না হতো তাহলে তিনি গোলামকে আরও কম সময় নির্দিষ্ট করে তাকে শাস্তি দিতেন।

যদি মুকাতাব গোলাম ও বাঁদীর পক্ষে সম্ভব হয় এবং তারা তাদের কিস্তির টাকা দ্রুত পরিশোধ করতে চায়, এটি তো উত্তম কথা। মনিবের উচিত তাদের এ ধরনের আবেদনকে গ্রহণ করা। যেমন—হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ের একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি চার কিংবা পাঁচ হাজার দিরহাম পরিশোধের বিনিময়ে তার এক গোলামকে মুক্ত করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। গোলাম বললো সমস্ত দিরহাম এক সাথে গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুক্তি দিয়ে দিন। কিন্তু মনিব গো ধরলেন, প্রতি বছর এক হাজার দিরহাম করে পরিশোধ করতে হবে। তার ইচ্ছে ছিলো এভাবে কিস্তি পরিশোধ করতে করতে সে মরে যাবে এবং তিনি তার ওয়ারিশ হবেন। সেই গোলাম এসে হযরত ওসমান (রা)-এর দরবারে নালিশ করলো। তিনি মনিবকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তিনি যেন তার এ বিনিময় গ্রহণ করেন। মনিব তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। হযরত ওসমান (রা) গোলামকে লক্ষ্য করে বললেন—তোমার যে মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়েছে সেই দিরহামগুলো আমাকে দাও। সে সেগুলো তাঁর নিকট দিয়ে দিলো। তিনি সেগুলো বাইতুলমালে জমা করে নিলেন এবং তাকে মুক্তি সনদ লিখে দিলেন। তারপর তার মনিবকে বলে দিলেন আপনি প্রত্যেক বছর এসে আমার কাছ থেকে কিস্তির টাকা নিয়ে যাবেন। মনিব এ অবস্থা দেখে সবগুলো দিরহাম এক সাথে গ্রহণ করলেন এবং মুক্তি সনদ লিখে দিলেন।[৮]

মুকাতাব গোলামের চুক্তিকৃত টাকা থেকে মনিব কম নেবেন এটি তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবু যদি নির্ধারিত টাকা থেকে তিনি কম গ্রহণ করেন সেটি উত্তম কথা। হযরত ওসমান

www.amarboi.org

(রা)-এর এক মুকাতাব গোলাম বলেছেন—তিনি আমার থেকে চুক্তিকৃত টাকা গ্রহণ করে আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন কিন্তু নির্দিষ্ট টাকা থেকে তিনি একটুও কম করেননি।[৯]

[ঘ] মুকাতাব কখন মুক্ত হয় ঃ আমরা এ পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম তা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ওসমান (রা) মতে মুকাতাব তার চুক্তির শেষ কিস্তি পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত সে গোলাম হিসেবেই গণ্য হবে। কিস্তির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধের পর সে মুক্ত বলে পরিগণিত হবে। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—মুকাতাব যতক্ষণ তার চুক্তির শেষ কিস্তি পরিশোধ না করবে ততক্ষণ সে গোলামই থাকবে।[১০]

[ঙ] মুকাতাবের তালাকের বিধান ঃ মুকাতাব তার চুক্তির শেষ কিস্তি পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত গোলাম হিসেবেই গণ্য হবে। এজন্য তার তালাকের বিধান তাই হবে যা একজন গোলামের বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ সে কেবল দুটো তালাক দিতে পারবে। যেমন—হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে এক মুকাতাব গোলাম তার স্ত্রীকে (যে স্বাধীন মহিলা ছিলো) দু তালাক প্রদান করে। যখন হযরত ওসমান (রা) এ ঘটনা জানতে পারলেন তখন তাকে বললেন সেই স্ত্রী এখন ঐ গোলামের জন্য হালাল নয় যতক্ষণ সে অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে করে হালালা না করবে। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে তাকে তিনি গোলাম মনে করেই এ ফায়সালা দিয়েছিলেন।[১১]-(বিস্তারিত জানার জন্য 'তালাক' শিরোনাম দেখুন)

[২.৪] উম্মু ওয়ালাদ

[ক] সংজ্ঞা ঃ যে বাঁদীর গর্ভে তার মনিবের বীর্য থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়।

[খ] উম্মু ওয়ালাদের মুক্তি ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত ছিলো—মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসবের সাথে সাথে উম্মু ওয়ালাদ (বাঁদী) মুক্ত হয়ে যায়। হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি উম্মু ওয়ালাদকে সর্বদা মুক্ত ও স্বাধীন মনে করতেন।[১২]

হযরত উবাইদা আস সালমানী থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) একবার খুতবার সময় বললেন—হযরত ওমর (রা) তার খিলাফতকালে একদিন উম্মু ওয়ালাদ সম্পর্কে আমার সাথে পরামর্শ করেছিলেন। আমরা উভয়ে একমত হলাম যে, উম্মু ওয়ালাদ মুক্ত হিসেবে গণ্য হবে। তখন থেকে হযরত ওমর (রা) তাঁর শাসনামলে এর ভিত্তিতেই ফায়সালা দিতেন। অতপর হযরত ওসমান (রা) যখন খলীফা হন তিনিও এ মতের ভিত্তিতেই ফায়সালা করতেন। যখন আমার ওপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হলো তখন থেকে আমার অভিমতও পাল্টে গেছে। আমি মনে করি উম্মু ওয়ালাদ রীতিমত বাঁদী হিসেবেই গণ্য হবে। তখন উবাইদা আস সালমানী তাঁকে বললেন—এ ব্যাপারে আপনি হযরত ওমর (রা)-এর সাথে যে কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন আপনার পৃথক মতের চেয়ে সেই মতটিই আমার নিকট প্রিয় ও উত্তম মনে হয়।[১৩]

যেহেতু উম্মু ওয়ালাদ তার মনিবের সন্তান প্রসবের সাথে সাথে মুক্ত হয়ে যায় তাই তাকে ক্রয় বিক্রয় করা কিংবা হিবা করা জায়েয নেই। অবশ্য তার সাথে সহবাসের অধিকার মনিবের পুরোপুরি বলবত থাকে। যখন মনিব ইন্তিকাল করবেন তখন সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে।[১৪]

www.amarboi.org

[গ] মনিবের মৃত্যুতে উম্মু ওয়ালাদের ইদ্দত ঃ ইমাম বাইহাকী তার সুনানে বর্ণনা করেছেন—উম্মু ওয়ালাদ তার মনিবের মৃত্যুতে তিন হায়িয ইদ্দত পালন করবে। কারণ সে তখন একজন স্বাধীন মহিলার মর্যাদা নিয়ে তার গর্ভাশয়ের সংশয়মুক্ত হওয়ার (ইসতিব্‌রার) জন্য ইদ্দত পালন করবে। এজন্য একজন তালাক প্রাপ্তা স্বাধীন মহিলার মত উম্মু ওয়ালাদও ইস্তিবরার জন্য তিন হায়িযকাল বিলম্ব করবে।[১৫]

ইমাম ইবনু কুদামা (রহ) আল মুগনীতে হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি মনে করতেন উম্মু ওয়ালাদের মনিব ইন্তিকাল করলে গর্ভ সঞ্চয়ের সন্দেহ মুক্ত (ইসতিব্‌রা)-এর জন্য এক হায়িয ইদ্দত পালন করবে।[১৬]

কারণ এ 'ইসতিবরায়ে রেহেম' হচ্ছে দাসত্ব জীবনের পরিসমাপ্তির জন্য। এজন্য তার মেয়াদ সেটিই হবে যা বাঁদী বা মুক্ত হবে এমন বাঁদীর জন্য নির্দিষ্ট। তবে শর্ত হচ্ছে তার হায়িয আসতে হবে। তবেই তার ইদ্দত হবে এক হায়িয।

-(আরো জানতে হলে দেখুন 'ইসতিবরা' শিরোনাম)

৩. গোলামীর প্রভাব ও ফলাফল

গোলামীর প্রভাব ও ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

[৩.১] গোলাম-বাঁদীর সাথে ভালো আচরণ ঃ গোলাম-বাঁদীর সাথে যে আচরণ ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হযরত ওসমান (রা) সর্বদা তাদের সাথে ভালো আচরণের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। এমন কি তিনি রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠলে নিজেই ওযুর পানির ব্যবস্থা করতেন। এ ব্যাপারে তাঁকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিলো যে, আপনার গোলামদেরকে নির্দেশ দিলে আপনার কষ্ট করতে হতো না। তিনি বলেছিলেন না তা হতে পারে না। কারণ রাত শুধু তাদের আরাম আয়েশের জন্য।[১৭]

[৩.২] অকর্মণ্য বা অপটু গোলাম-বাঁদীকে উপার্জনের জন্য বাধ্য না করা ঃ উপার্জনে অক্ষম গোলাম বাঁদীকে উপার্জনের জন্য পীড়াপীড়ি করা জায়েয নয়। কারণ এটি তাদের জন্য কঠিন কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। হতে পারে উপার্জনের পীড়াপীড়ির কারণে তারা অবৈধ ও হারাম পথের দিকে পা বাড়াবে। হযরত ওসমান (রা) একদিন খুতবায় এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—অকর্মণ্য ও অপটু বাঁদীকে উপার্জনের জন্য বাধ্য কোরো না। কারণ তোমার বাড়াবাড়ির কারণে সে অবৈধ পথে উপার্জনে বাধ্য হবে। তদ্রূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে উপার্জনের জন্য চাপ প্রয়োগ কোরো না। কারণ উপার্জন করতে না পেরে হয়তো সে চুরি করবে। তোমরা অপরের প্রতি সদয় হও আল্লাহও তোমাদের প্রদি সদয় হবেন। তাদের উত্তম খাদ্য খাওয়াও।[১৮]

[৩.৩] গোলামের নেতৃত্ব ও নামাযে ইমামত ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে যদি কোনো গোলাম তার দক্ষতা ও যোগ্যতায় এবং নিঃস্বার্থতায় নেতৃত্বের উপযোগী প্রমাণিত হয় তাহলে শুধু গোলাম হওয়ার কারণে তাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব বা নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তদ্রূপ নামাযে ইমামতের বেলায়ও দাসত্ব কোনো অন্তরায় নয়। হযরত ওসমান (রা)-এর এক হাবশী গোলাম ছিলো। তাকে তিনি 'রাবযাহ' এলাকার গভর্ননের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। সেখানে হযরত

www.amarboi.org

আবু যর গিফারী (রা) সহ বেশ কজন সাহাবা জুম'আর নামায সহ অন্যান্য নামাযও তার ইমামতে আদায় করতেন।[১৯]–(আরো দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

[৩.৪] ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পিতামাতা ও সন্তানকে পৃথক না করা ঃ সন্তান পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। আবার পিতামাতাও সন্তানের প্রতি স্নেহ ও দরদ রাখেন। যদি তাদের কাউকে কোনো কাজে লাগানো হয় তাহলে অন্যজন তাকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে সেই কাজে লেগে যায়। (এটি স্নেহ ও ভালোবাসার কারণে হয়ে থাকে)। যেহেতু ইসলাম এসেছে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে। তাই ইসলাম এ শিক্ষা দিয়েছে যে, ক্রয়-বিক্রয় কিংবা দানের সময় যেন পিতামাতা ও সন্তানকে পৃথক করা না হয়। তাই খুলাফা-ই-রাশিদা [তার মধ্যে হযরত ওসমান (রা)-ও শামিল] এ নীতির ওপরই চলেছেন। হাকীম ইবনু উক্‌কাল থেকে বর্ণিত, হযরত ওসমান (রা) তাকে লিখেছিলেন––একশ' গোলাম-বাঁদী দম্পতি কিনে যেন তার কাছে পাঠানো হয়। সেই সাথে এ ব্যাপারটিও গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সন্তান থেকে পিতামাতা এবং পিতামাতা থেকে সন্তানকে যেন পৃথক করে খরিদ করা না হয়।[২০]

তিনি অন্য এক সময় বলেছিলেন—গোলাম-বাঁদীর দম্পতিকে যেন পৃথক করে বেচাকেনা করা না হয়।[২১] অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী উভয়কে একই সাথে বেচাকেনা করতে হবে। সন্তানকে তার পিতামাতার সাথেই রাখতে হবে।–(আরো দেখুন 'বায়' শিরোনাম)

[৩.৫] বাঁদী বেচাকেনার কারণে তালাক সংঘটিত হয় না ঃ এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নতর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) মনে করতেন বিবাহিত বাঁদী পৃথকভাবে বিক্রি করলে তাদের মধ্যে তালাক সংঘটিত হয়ে যায়।[২২] কিন্তু হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন এরূপ অবস্থায় তালাক সংঘটিত হয় না।[২৩]

[৩.৬] গোলামের তালাক ঃ হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন তালাকের ব্যাপারটি পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ইদ্দতের ব্যাপারটি মহিলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই শর্তের ভিত্তিতে একজন গোলাম তার স্ত্রীকে সর্বোচ্চ দুটো তালাক প্রদান করতে পারে। চাই তার স্ত্রী স্বাধীন হোক কিংবা বাঁদী। তাঁর সময়ে হযরত আয়িশা (রা)-এর এক গোলাম তার স্ত্রীকে—যে স্বাধীন মহিলা ছিলো—দু তালাক দেয়। হযরত ওসমান (রা) জানতে পেরে তাকে নির্দেশ দেন তারা আর স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবে না।[২৪] সেই সাথে তিনি এটিও বললেন যে, তালাকের সম্পর্ক পুরুষের সাথে এবং ইদ্দতের সম্পর্ক মহিলার সাথে।[২৫]

–(আরো দেখুন 'তালাক' শিরোনাম)

মুকাতাব ততক্ষণ পর্যন্ত গোলামই থাকে যতক্ষণ সে তার চুক্তির শেষ কিস্তি পরিশোধ না করে। এজন্য তালাক প্রদানের ব্যাপারে তার ক্ষমতা ততটুকু, যতটুকু ক্ষমতা একজন গোলামের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সে মাত্র দু'টো তালাক প্রদানের ক্ষমতা রাখে। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ) বলেন—এক মুকাতাব গোলাম তার স্বাধীন স্ত্রীকে দু তালাক দিয়েছিলো। হযরত ওসমান (রা) এ মামলার রায়ে বলেছিলেন—ঐ মহিলা তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল নয় যতক্ষণ সে অন্য স্বামীকে বিয়ে করে পুনরায় তালাকপ্রাপ্তা না হবে।[২৬]

www.amarboi.org

বর্ণিত আছে, উম্মু সালমা (রা)-এর এক মুকাতাব গোলাম ছিলো। নাম নাফী। সে তার স্ত্রীকে (সেই মহিলা স্বাধীন ছিলো) দু তালাক দেয়। অতপর তাকে প্রত্যাহার করার ইচ্ছে করে। সঠিক পদ্ধতি জানার জন্য সে হযরত ওসমান (রা) এবং যায়িদ ইবনু সাবিত (রা)-এর নিকট যায়। তারা উভয়ে বলে দেন—'স্ত্রী তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে।'[২৭]

অদ্রূপ মুকাতাবের স্ত্রী যদি বাঁদী হয় এবং তাকে দু তালাক দেয়া হয় এবং সে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাকে বাঁদী হিসেবে কিনে নেয় মালিকানার সুবাদে তবু তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয হবে না।[২৮]-(আরো দেখুন 'তাসরিউস' শিরোনাম)

[৩.৭] গোলাম বাঁদীর ওপর হদ প্রয়োগ ঃ হযরত ওসমান (রা) স্বাধীন পুরুষ ও মহিলার ওপর যে হদ প্রয়োগ করতেন গোলাম ও বাঁদীর ওপর তার অর্ধেক হদ কার্যকর করতেন। তাঁর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী—

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط -(النساء : ٢٥)

"স্বাধীন মহিলাদের জন্য যে শাস্তি নির্দিষ্ট আছে তাদেরকে তার অর্ধেক প্রদান করো।"-(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রবী'আহ বর্ণনা করেছেন—আমি হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) সহ অন্যান্য খলীফাদের শাসনামল দেখেছি। তারা কেউ অপবাদের শাস্তি প্রদান করতে গিয়ে গোলামকে ৪০ ঘা বেতের বেশী মারেননি।[২৯]

একবার হযরত ওসমান (রা)-এর এক গোলাম মাদকদ্রব্য সেবন করেছিলো, তাকে অর্ধেক হদ (শাস্তি) প্রদান করা হয়েছিলো।-(বিস্তারিত দেখুন 'আশরাবাহ' এবং 'কযফ' শিরোনাম)

এখন রইলো মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবার বর্ণনা। যেখানে হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে গোলামকেও ৮০ বেত্রাঘাত করেছেন।[৩০] তো এটি একটি শায (বিরল) রিওয়ায়েত। হতে পারে তিনি সেই গোলামকে ৪০ ঘা মেরেছেন মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে হদ স্বরূপ এবং অবশিষ্ট ৪০ ঘা মেরেছেন অন্য কোনো অপরাধে তা'যীর হিসেবে। এমনও হতে পারে সেই সময়টি ছিলো রমযান মাস কিংবা মাতাল অবস্থায় লড়াই ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিলো অথবা এ ধরনের অন্য কোনো অপরাধে সে জড়িয়ে পড়েছিলো।-(আরো দেখুন 'তা'যীর' শিরোনাম)

[৩.৮] বাঁদী এবং উম্মু ওয়ালাদের ইস্‌তিব্‌রা (ইদ্দত)
(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইস্‌তিব্‌রা' শিরোনাম)

[৩.৯] স্বাধীন মহিলা মনে করে বাঁদীকে বিয়ে করা ঃ যদি কোনো ব্যক্তি স্বাধীন মহিলা মনে করে বাঁদীকে বিয়ে করেন এবং তার গর্ভে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে। তারপর প্রমাণিত হয় যে, সেই মহিলা বাঁদী। এমতাবস্থায় তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী সকল সন্তান তার প্রকৃত মনিবের গোলাম বাঁদী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ সন্তান তার মায়ের অনুরূপ স্বাধীনতা কিংবা দাসত্ব ভোগ করে। কিন্তু ইসলাম চায় মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে। এজন্য এসব সন্তানের ব্যাপারে তার পিতাকে এ অধিকার দিয়েছে, তিনি চাইলে ফিদইয়া বা মুক্তিপণ দিয়ে নিজের সন্তানকে মুক্ত করে নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে ফিদইয়া (বা মুক্তিপণ) হচ্ছে এক

www.amarboi.org

ছেলের বিনিময়ে দুজন গোলাম এবং এক মেয়ের বিনিময়ে দুজন বাঁদী।–(আরো দেখুন 'ইসতিহকাক' শিরোনাম)

[৩.১০] স্ত্রীর গোলাম বা বাঁদী স্বামীর মালিকানাধীন নয় ঃ স্বামীর মালিকানার সাথে সাথে স্ত্রীর পৃথক মালিকানাও ইসলাম স্বীকার করে। এজন্য স্ত্রীর গোলাম কিংবা বাঁদী স্বামীর গোলাম বা বাঁদী হিসেবে গণ্য হয় না। এ সূত্রের ভিত্তিতে বাঁদী তার মনিবের পুরো শরীরের দিকে তাকাতে পারে কিন্তু কোনো মহিলার বাঁদী তার মনিবের স্বামীর সতরের দিকে তাকাতে পারবে না। জায়েয নেই। হযরত ওসমান (রা)-এর স্ত্রীর বাঁদী বানানাহ থেকে বর্ণিত, হযরত ওসমান (রা) যখন গোসল করতেন তখন আমি তার কাপড় নিয়ে আসতাম। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিতেন আমি যেন তার দিকে না তাকাই, কেননা এরূপ করা আমার জন্য জায়েয নেই।[৩১]

[৩.১১] বাঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ঃ বাঁদী যদি এককভাবে তার হয় তাহলে মনিব তার সাথে সহবাস করতে পারেন।

[৩.১২] এক নজরে গোলাম বাঁদীর বিধান

–মুক্ত ব্যক্তি এবং গোলাম একে অপরের ওয়ারিশ হয় না।–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

–যুদ্ধ বন্দীদেরকে খলীফা ইচ্ছে করলে গোলাম/বাঁদী হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন। –('আসির' শিরোনাম দেখুন)

–গোলাম ও বাঁদীর সাথে অপরাধ সংঘটিত হলে।–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

–গোলাম ও বাঁদীর সাথে অপরাধ সংঘটিত হলে তার দিয়াত। –('জিনাইয়াহ' শিরোনাম দেখুন)

–মনিবের জিনিস চুরির অপরাধে গোলাম ও বাঁদীর হাত কাটা যাবে না। –('সারিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–মালিক গোলাম ও বাঁদীর পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবেন না। –('যাকাতুল' ফিতর শিরোনাম দেখুন)

–ফাই থেকে গোলামকে কিছু প্রদান করা।–('আতা' শিরোনাম দেখুন)

–গোলামের সাক্ষ্য।–('শাহাদাত' শিরোনাম দেখুন)

–বাঁদীর ইদ্দত।–('ইদ্দত' শিরোনাম দেখুন)

–মনিবের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা।–('ইসতিযান' শিরোনাম দেখুন)

–গোলাম এক সাথে সর্বোচ্চ দুজন স্ত্রী রাখতে পারে।–('নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

–গোলাম সর্বমোট দুটো তালাকের ক্ষমতা রাখে।–(দেখুন 'তালাক' শিরোনাম)

–কাফ্‌ফারা হিসেবে গোলাম মুক্ত করা।–('কাফফ্‌রা' শিরোনাম দেখুন)

–যিনি গোলামকে মুক্ত করে দেবেন ওয়ালা তার।–('ওয়ালা' দেখুন)

–পলাতক গোলাম চুরি করলেও তার হাত কাটা যাবে না।–('ইবাক' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

রিজলু (رجل)—পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ/পা

—ওযুর সময় উভয় পা ধোয়া।—('ওযু' শিরোনাম দেখুন)

—চিৎ হয়ে শোয়ার সময় এক পায়ের নলা আরেক পায়ের নালার ওপর রাখার অনুমতি।

—(বিস্তারিত দেখুন 'ইসতিলকা' শিরোনাম)

রিদ্দাহ্ (ردة)—ফিরে যাওয়া, পরিত্যাগ করা, মুরতাদ হওয়া

১. সংজ্ঞা

ইরতিদাদ অর্থ কোনো মুসলমানের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের এমন বহিঃপ্রকাশ যাতে বুঝা যায় সে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে গেছে।

২. মুরতাদের শাস্তি

যদি কোনো মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তার ওপরই অবিচল থাকে, তাহলে এরূপ ব্যক্তির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। চাই সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুফরীর দিকে ফিরে যাবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।[৩২] আমরা দেখতে পাই এখানে হযরত ওসমান (রা) মুরতাদের শাস্তির ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি।

৩. মুরতাদকে তাওবার আহ্বান জানানো এবং তার ওপর হদ কায়েম করা

মুরতাদকে তিনবার তাওবার আহ্বান না জানানো পর্যন্ত তার ওপর হদ (নির্দিষ্ট শাস্তি) প্রয়োগ করা যাবে না। তিনবার তাওবার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যদি সে তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, তার ওপর হদ প্রয়োগ করা যাবে অর্থাৎ তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে। হযরত ওসমান (রা)-এর সময় এক ব্যক্তি ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিলো। হযরত ওসমান (রা) তাকে তাওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনবার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সে অস্বীকার করলো। অতপর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলো।[৩৩] এরূপ আরেকটি ঘটনা হচ্ছে—হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) কুফা থেকে এমন কতিপয় লোককে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন যারা ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে মুসাইলামা কাযযাব এর ধর্মের প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলো। এ মামলার রায় জানতে চেয়ে তিনি হযরত ওসমান (রা)-কে লিখলেন। হযরত ওসমান (রা) জবাবে লিখে জানালেন—তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত দেবে। কালিমা শাহাদাতের প্রতি পুনরায় ঈমান আনার আহ্বান জানাবে। যারা মুসাইলামা কাযযাবকে অস্বীকার করে ইসলাম কবুল করবে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না। আর যারা মুসাইলামার কথার ওপর অটল থাকবে তাদেরকে হত্যা করে ফেরবে। যা হোক তাদের মধ্যে কিছু লোক ইসলামের দাওয়াত কবুল করলো, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলো আর যারা মুসাইলামা কাযযাব এর ওপর অনড় রইলো তাদেরকে হত্যা করা হলো।[৩৪]

রিবা (ربا)—অতিরিক্ত, সুদ

১. সংজ্ঞা

রিবা বলতে বুঝায় আসল মালের অতিরিক্ত মাল যা কোনো বৈধ বিনিময় ছাড়া ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে শুধু চুক্তির সময় শর্ত লাগানোর কারণে উসুল করে।

২. রিবার প্রকার

রিবা (বা সূদ) দু প্রকার। আর এ উভয় প্রকারই হারাম। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

[২.১] রিবা আন নাসিয়াহ্ বা মেয়াদী সূদ ঃ রিবা আন নাসিয়াহ্ বলতে বুঝায় আসল মালের সাথে উসুলকৃত অতিরিক্ত মাল, যা ঋণের মেয়াদের সাথে শর্তযুক্ত হয়। যেমন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকা ঋণ প্রদান করলো এই শর্তে যে, এক বছর পর সে এগারো শ' টাকা ফেরত দেবে। এটি হারাম (অবৈধ)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٧٨-٢٧٩)

"মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সূদের যে বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। যদি তোমরা তা পরিহার না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কাউকে অত্যাচার কোরো না, তোমাদের প্রতিও কেউ অত্যাচার করবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯)

(আরো দেখুন 'কারয' শিরোনাম)

[২.২] রিবা আল ফাযল বা মালের সূদ ঃ আমওয়ালে রাবাবিয়্যাহ* এর মধ্যে একই জাতীয় কোনো মাল বেচা কেনার সময় কমবেশী করাকে রিবা আল ফাযল বলে। হযরত ওসমান (রা) সোনার বিনিময়ে সোনা এবং রূপার বিনিময়ে রূপা ক্রয় বিক্রয়কে নাজায়েয মনে করতেন।[৩৫] কারণ এতে লোকজন সমান ও নির্ভুল ওজনের মাধ্যমে লেনদেন করতে সক্ষম হবে না এবং অসম লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন—সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের পরিবর্তে গম, যবের পরিবর্তে যব, খেজুর দিয়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন কমবেশী করে লেনদেন জায়েয নেই। সেই লেনদেন নগদই হোক না কেন। এমনকি তা ধার দেয়া নেয়াও জায়েয নেই যদিও তা সমান সমান হয়। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে যেন সূদের লেনদেন করলো। তার বেচাকেনা বাতিল যোগ্য।[৩৬]

৩. রিবার নিষেধাজ্ঞা কঠোরতা

সাহাবা কিরাম [হযরত ওসমান (রা)-ও তাদের মধ্যে শামিল] সূদের লেনদেন সম্পর্কে কঠোর মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তারা বলতেন—সূদের সত্তর প্রকার পাপ আছে তার মধ্যে নগণ্য প্রকারের পাপ হচ্ছে নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

---

* ছয়টি জিনিসকে আমওয়ালে রাবাবিয়্যাহ বলে। যথা–সোনা, ২. রূপা, ৩. গম, ৪. যব, ৫. খেজুর এবং ৬. লবন।–লেখক

www.amarboi.org

রুইয়া (رؤيا)—স্বপ্ন

স্বপ্নকে আরবীতে রুইয়া বলা হয়। স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করা বৈধ। সাহাবা কিরাম [তাদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা) ও একজন] স্বপ্নের তা'বীর বা তাৎপর্য বর্ণনা করতেন। হযরত ওসমান (রা)-এর স্ত্রী মুহতারিমা উম্মু হিলাল বিনতু ওয়াকী (রা) বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) ঘুমিয়ে ছিলেন, জেগে ওঠার পর বললেন—লোকেরা আমাকে হত্যা করবে। আমি বললাম আমীরুল মুমিনীন ! একি বলেন ! এ হতে পারে না। তিনি বললেন—আমি স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) -কে দেখলাম। তারা বলছিলেন—আজতো আপনি রোযা আমাদের সাথে ইফতার করেন। অথবা বলছিলেন—আজ আপনি রোযা রেখেছেন আমাদের এখানে ইফতার করবেন।[৩৭]

www.amarboi.org

'র' বর্ণের তথ্যসূত্র

১. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–৩১৬ ; সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ–২৯০ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ–২৫৯ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ–৪৫৬ ; তাফসীর ইবনু কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ–৩৭০।

২. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪০৩ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ–১১১ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ–৪৮২ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ–২৭৬ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ–৫৫৯।

৩. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ–৫৫৯ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ–৩৩৪ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪০০।

৪. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ–২৪০।

৫. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩১৫ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ–৩৯।

৬. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ–২২৩।

৭. আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪১৮।

৮. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ–৪০৫ ; সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৩৫ ; কানযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৫১ ; আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ–৪২৭।

৯. আহকামুল কুরআন—আবু বকর আল জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, পৃ–৩২২।

১০. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ–৪০৮।

১১. সুনানু বাইহাকী, ১ম খণ্ড, পৃ–৩৩৫ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৬৭৭ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ–২৩৩।

১২. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৪৩।

১৩. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ–২৯১ ; আখবারুল কাযা-ওয়াকী ; ২য় খণ্ড, পৃ–৩৯৯ ; আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ–২১৭ ; কিতাবুল উম্ম–ইমাম শাফিঈ, ৭৮ম খণ্ড, পৃ–৭৫ ; আল আশরাফু ফী মাসায়িলুল খিলাফি ওয়াল ইজমা–ইবনু মানযার, ২য় খণ্ড, পৃ–১২৪।

১৪. আল মুগনী, ৯ম খণ্ড, পৃ–৫৩১।

১৫. সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ–৪৪৮।

১৬. আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ–৫০০।

১৭. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–১৯৭।

১৮. মুয়াত্তা–ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ–৯৮০ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ–৯ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ–২৬ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–১৯৭ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ–৪৮।

১৯. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ–৫২।

২০. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ–২৬৬ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ–৩০৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ–১২৬ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ–১৭৫।

২১. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৩১।

২২. ফিকহে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), তালাক শিরোনাম।

২৩. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ–১৩২।

২৪. কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৬৬৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ–৩৬০ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ–৯৯।

২৫. মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ–২৩৪ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৬৬৫।

২৬. আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ–২৩৩ ; মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ–২৩৪ ; সুনান বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ–৩৩৫ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ–৬৭৭।

২৭. মুয়াত্তা–ইমাম মালিক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ–৫৭৪ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা ১ম খণ্ড, পৃ–২৪২ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ–২৬৩।

২৮. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ–৩৪৮ ; আল মুহাল্লী ; ১০ম খণ্ড, পৃ–১৮০।

২৯. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ–৮২৮ ; মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ–১২৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ–২৫১ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ–৫৬২ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ–২১৮।

৩০. মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ–১২৭।

www.amarboi.org

৩১. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৬৮ ; তাবাকাত ইবনু সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৯।
৩২. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৪ ; কানযুল উম্মাল, পৃ-৩১৩ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১২৩।
৩৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৬৪ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৯০ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৬ ; কিতাবুল খারাজ, কাযী আবু ইউসুফ, পৃ-২১৪।
৩৪. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০১ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৯০।
৩৫. কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৯০।
৩৬. আল মাজমু', ১০ম খণ্ড, পৃ-৩৫।
৩৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬৯।

www.amarboi.org

ল

লাহ্‌ভুন (لهو)—খেলাধূলা

১. সংজ্ঞা

লাহ্‌ভুন অর্থ এমন খেলাধূলা এবং ক্রীড়া-কৌতুক যা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে উপকারী নয়।

২. লাহ্‌ভুনের বিধান

ওপরের সংজ্ঞা অনুযায়ী বুঝা যায় এ ধরনের ক্রীড়া-কৌতুক জায়েয নেই। কারণ এটি বিনা প্রয়োজনে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলিম নেতার দায়িত্ব তিনি লোকদেরকে এ ধরনের খেলাধূলার নিষিদ্ধতা ও অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকবেন এবং সেগুলোর উপকরণ ধ্বংস করে দেয়ার জন্য লোকদের আহ্বান করবেন। এতে তারা বিরত না হলে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে সেসব উপাদান নষ্ট করে ফেলবেন এবং লোকদেরকে তা'যীর স্বরূপ শাস্তি প্রদান করবেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে আতশবাজি করা ও কবুতর উড়ানো রিওয়াজে পরিণত হয়েছিলো। তিনি একজনকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন লোকদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন—সেসব কবুতর যেন যবেহ্ করে দেয়া হয় অথবা পালক কেটে ফেলা হয় যাতে উড়তে না পারে।[১] হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে পাশা খেলারও প্রচলন হয়েছিলো। তিনি পূর্ণ শক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করেন। তার উপকরণসমূহ নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেন। যাদের ঘরে সেগুলো থাকবে এবং যিনি নষ্ট না করবেন তাকে শাস্তি দানের হুমকিও প্রদান করেন। তিনি লোকদেরকে বক্তৃতায় বলেছিলেন—'লোক সকল ! পাশা খেলা পরিহার করো। আমি জানতে পেরেছি তোমাদের অনেকের ঘরে এ খেলার উপকরণ রয়েছে। আমি নির্দেশ দিচ্ছি সেগুলো নষ্ট করে ফেলার জন্য কিংবা তা জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য।'

আরেকবার তিনি বলেছিলেন—'হে লোক সকল ! আমি তোমাদেরকে পাশা খেলা সম্পর্কে কিছু বলেছিলাম কিন্তু তোমাদেরকে সেসব উপকরণ ফেলে দিতে দেখিনি। তাই আমি ইচ্ছে করেছি লাকড়ি জমা করে ঐসব লোকের ঘর তল্লাশীর জন্য লোক পাঠাবো, যাদের ঘরে সেগুলো পাওয়া যাবে তাদের সহ তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো'।[২]

লিওয়াতাত (لواطة)—সমকাম/পুংমৈথুন

১. সংজ্ঞা

পুরুষ পুরুষের পায়ুপথে যৌনকর্ম সম্পন্ন করাকে লিওয়াতাত বলে।

২. লিওয়াতাতের শাস্তি

মনে হয় হযরত ওসমান (রা)-এর প্রথমে ধারণা ছিলো লিওয়াতাতের শাস্তি যিনার শাস্তির অনুরূপ। অর্থাৎ বিবাহিত হলে তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড এবং অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত। বর্ণিত আছে—হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো, যে এক কুরাইশ বালকের সাথে যৌনকর্ম করেছিলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—ওকি বিবাহিত ? লোকেরা বললো—এক মহিলার সাথে তার বিয়ে হয়েছে কিন্তু এখনো তার সাথে বিছানায়

www.amarboi.org

যেতে পারেনি। হযরত আলী (রা) তাকে বললেন—স্ত্রীর সাথে বিছানায় গিয়ে থাকলে তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় নইলে তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হবে। তখন হযরত ওসমান (রা)-এর নির্দেশে তাকে বেত্রাঘাত করা হলো।[৩] কিন্তু এ কাজের ঘৃণ্যতার দিকে লক্ষ্য করে তিনি দ্রুত এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবায় বর্ণিত হয়েছে—যখন বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-এর বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিলো। তখন একদিন বাড়ির ছাদে এসে তিনি লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন-'তোমরা কি জানো না শুধুমাত্র চার কারণে একজন মুসলমানের খুন জায়েয।' তিনি সেই চারজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে এটিও বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তির খুন হালাল যে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাজ করে।'[৪] (অর্থাৎ সমকামে লিপ্ত হয়)। শাওকানী তার নাইলুল আওতারে লিখেছেন—হযরত ওসমান (রা) এ কাজের ঘৃণ্যতার দিক বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেছেন এভাবে, যে কোনো দেয়ালের পাশে দাঁড় করিয়ে তাকে দেয়াল চাপা দিয়ে মারতে হবে।[৫] ইবনু কুদামা (রহ) আল মুগনীতে লিখেছেন—এ কাজের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম একমত।[৬]

লিবাস (لباس)–পোশাক পরিচ্ছদ

–ইহরামের পোশাক।–(বিস্তারিত দেখুন, 'ইহরাম' শিরোনাম)

–পোশাক পরিচ্ছদে অপব্যয়।–('ইসরাফ' শিরোনাম দেখুন)

লিহ্য়াহ (لحية)–দাঁড়ি

যখন মুসলিম ব্যক্তি ওযু করবেন, তার উচিত মুখমণ্ডল ধুয়ার সাথে সাথে আঙ্গুল দিয়ে দাঁড়ি খেলাল করা। যদি সুন্নাত নিয়ম অনুযায়ী তিনবার মুখ ধুয়ে নেন তাহলে তিনবারই দাঁড়ি খেলাল করা উচিত। আবু ওয়াইল বলেছেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-কে ওযুর সময় দাঁড়ি খেলাল করতে দেখেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।[৭]

লুকতাহ (لقطة)–হারানো বস্তু প্রাপ্তি

১. সংজ্ঞা

লুকতাহ সেই বস্তুকে বলা হয়, যা কোথাও পড়ে থাকে এবং মালিক ছাড়া অন্য কেউ তা দেখে ওঠিয়ে নেয়।

২. লুকতার প্রকার

লুকতাহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

[২.১] এমন শক্তিশালী প্রাণী যে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকতে সক্ষম। যথা-উট, গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি।

[২.২] নগদ অর্থ, পোশাক ও ঐসব পশু এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যেসব পশু আত্মরক্ষা করে চলতে পারে না। যেমন-ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি।

[২.৩] হেরেমের সীমার মধ্যে প্রাপ্ত কোনো বস্তু তা যে কোনো প্রকারেরই হোক না কেন।

www.amarboi.org

৩. লুকতার বিধান

[৩.১] যদি দ্বিতীয় (২.২) প্রকারের কোনো জিনিস কেউ পান তাহলে এক বছর পর্যন্ত তার প্রাপ্তি ঘোষণা দিতে হবে। যদি মালিকের সন্ধান পেয়ে যান তাহলে তার মাল তাকে ফেরত দেবেন। আর যদি এক বছর ঘোষণা দেয়ার পরও মালিকের সন্ধান না পাওয়া যায় যিনি তা পেয়েছেন তিনিই তার মালিক হয়ে যাবেন। চাইলে সেগুলো নিজের সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন আবার সেগুলো সাদকাও করে দিতে পারেন। যদি দান করে দেয়ার পর মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে মালিক ইচ্ছে করলে সেই দানকে বহাল রেখে নিজে সওয়াবের অংশীদার হতে পারেন, আবার সেই মালের দামও আদায় করে নিতে পারেন। এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

[৩.২] প্রথম [২.১] প্রকারের লুকতাহ অর্থাৎ উট, গরু, মহিষ প্রভৃতির ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় হতে হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফাতকাল পর্যন্ত এগুলো লুকতাহ হিসেবে সংগ্রহে নেয়া জায়েয ছিলো না। হযরত ওমর (রা) এ ধরনের পশু নকী নামক স্থানে (রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে) রেখে দিতেন, যেন হারানো পশুর মালিক সেখান থেকে তার পশু সনাক্ত করে সহজেই নিয়ে যেতে পারেন। সেই জায়গায় রক্ষিত পশু নিজেদের বংশ বিস্তার করে সংখ্যায় অনেক হয়ে গিয়েছিলো।[৮]

হযরত ওসমান (রা)-এর সময় সেই সংখ্যা আরো বেড়ে গিয়েছিলো। অতপর তিনি অন্যান্য মালের মত এ ধরনের পশুও লুকতাহ হিসেবে সংগ্রহ করার এবং ঘোষণা দেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদি এক বছরের মধ্যে মালিকের সন্ধান পাওয়া না যেত তাহলে সেগুলো বিক্রি করে টাকা বাইতুলমালে জমা রাখা হতো। পরবর্তীতে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে বাইতুলমাল থেকে তাকে সেই পশুর মূল্য ফেরত দেয়া হতো। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ) বলেন—হযরত ওমর (রা) তাঁর গভর্নরদেরকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, হারানো পশু যেন নিজ করায়ত্বে না নেয়া হয়। এ নির্দেশের পর দেখা যেত হারানো পশু বাচ্চা দিত এবং সেই বাচ্চা ঝরণার কাছে গিয়ে পানি পান করতো কিন্তু কেউ কিছু বলতো না। যে পর্যন্ত মালিক এসে সনাক্ত করে তার পশু নিয়ে না যেতেন। যখন হযরত ওসমান (রা) খলীফা হলেন তখন তিনি গভর্নরদের লিখলেন—এ ধরনের পশু নিজ করায়ত্তে নেয়া যাবে তবে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। যদি ঘোষণা শুনে মালিক এসে পড়েন তাহলে তার পশু তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর মালিক না এলে তা বিক্রি করে টাকা বাইতুলমালে জমা করতে হবে। অতপর যদি মালিক এসে যায় তাহলে সেই টাকা তাকে বাইতুলমাল থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।[৯]

[৩.৩] তৃতীয় প্রকারের [২.৩ দ্রঃ] হারানো বস্তু যদি কেউ হেরেম শরীফের মধ্যে পায় তাহলে তা ওঠানো জায়েয নেই। শুধু সেই ব্যক্তি ওঠাতে পারেন যিনি ঘোষণা দিয়ে তা আসল মালিকের হাতে পৌঁছে দিতে চান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ

"হেরেমের মধ্যে পড়ে থাকা বস্তু উঠিয়ে নেয়া কারো জন্য জায়েয নেই। সেই ছাড়া যে তা মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে চায়।"[১০]

www.amarboi.org

যদি কেউ হেরেমে পড়ে থাকা বস্তু উঠিয়ে নিতেন এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে ফেলতেন কিংবা তা বিক্রি করে দিতেন এবং বিক্রীত টাকা নিজের কাছে রেখে দিতেন, হযরত ওসমান (রা) তার থেকে সেই বস্তুর মূল্য তো গ্রহণ করতেনই তার সাথে হেরেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জরিমানা স্বরূপ সেই মূল্যের আরো এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত আদায় করতেন।[১১]

www.amarboi.org

'ল' বর্ণের তথ্য সূত্র

১. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১০১, ২২২ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০০।
২. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২১৪ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-২২৩।
৩ কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৬৯।
৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৭।
৫. নাইলুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৮৭ (বৈরুত থেকে প্রকাশিত)।
৬. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৮৮।
৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪, মুসান্নাফ-আবুদর রাজ্জাক, ১ম খণ্ড, পৃ-৪১ ; আল মুহাল্লী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪৩৭।
৮. ফিকহে ওমর ইবনু খাত্তাব (রা), লুকতাহ শিরোনাম।
৯. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭১ ; আল মুয়াত্তা, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৫৬ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৯১।
১০. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ ; সুনানু নাসাঈ, কিতাবুল হাজ্জ।
১১. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-১৯০।

www.amarboi.org

শ

শাইবুন (شيب)—বার্ধক্য

খিযাব (বা হেয়ার ডাই)-এর মাধ্যমে বার্ধক্যের চিহ্নকে পরিবর্তন করা।

—(বিস্তারিত দেখুন 'খিযাব' শিরোনাম)

শাক্কুন (شك)—সন্দেহ/সন্দিহান হওয়া

মানুষ যখন দুটো কাজের মধ্যে কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায় এমন অবস্থাকে 'শাক্কুন' বলা হয়।

—সন্দেহের অবস্থায় রমযানের নিয়তে রোযা রাখা ঠিক নয়।—('সিয়াম' শিরোনাম দেখুন)

—যদি কোনো ইবাদাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহলে সেই পথ অবলম্বন করা উচিত যেটি অধিক সতর্কতামূলক।—('গুসল' শিরোনাম দেখুন)

শাতাম (شتم)—গালি দেয়া/মন্দ বলা

'শাতাম' অর্থ কাউকে গালিগালাজ করা। এজন্য তা'যীরের শাস্তি প্রযোজ্য।

শারত (شرط)—শর্ত

১. সংজ্ঞা

কোনো জিনিসের অস্তিত্ব অন্য কোনো জিনিসের অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট করাকে শার্‌ত বলে।

২. শার্‌তের কার্য সীমা

[২.১] **হাজ্জের জন্য শর্তারোপ করা** ঃ হযরত ওসমান (রা) হাজ্জের জন্য শর্তারোপ করা বৈধ মনে করতেন। তিনি ইহরাম বেঁধে এভাবে বলতেন—'হে আল্লাহ্‌ ! যদি আমি পথে কোথাও বাঁধার সম্মুখীন হই সেখানেই ইহরাম খুলে ফেলবো।'

অথবা তিনি এভাবে বলতেন—'হে আল্লাহ্‌ ! যদি আপনি আমাকে হাজ্জ করার তাওফিক দেন তাহলে হাজ্জ করবো, নইলে ওমরাহ।'—(বিস্তারিত দেখুন 'হাজ্জ' শিরোনাম)

[২.২] **চুক্তিপত্রে শর্তারোপ করা** ঃ মনে হয় হযরত ওসমান (রা) দু পক্ষের সম্মতিতে যত শর্তারোপ করাই হোক, জায়েয মনে করতেন। তবে সেসব চুক্তির মধ্যে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র যেন না থাকে। যদি এমন হতো তাহলে তিনি আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তকে অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

—হযরত ওসমান (রা) এ ধরনের শর্তারোপ গ্রহণযোগ্য মনে করতেন, কেউ না দেখে কোনো বস্তু এ শর্তে খরিদ করলেন, যদি বস্তুটি যথাযথভাবে থাকে তাহলে আমি নেবো। যেমন

www.amarboi.org

হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) হযরত ওসমান (রা) থেকে অন্য জায়গায় রাখা কিছু ঘোড়া চল্লিশ হাজার দিরহামে বা তার কাছাকাছি দামে কিনে নেন। শর্ত দেন ঘোড়াগুলো বুঝে নেয়ার সময় তা সুস্থ থাকতে হবে। একথা বলার পর তিনি কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে হযরত ওসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন—যদি আমার লোক সেখানে ঘোড়াগুলো ঠিক মত পায় তাহলে আপনাকে আরো ছ' হাজার দিরহাম বেশী দেবো। হযরত ওসমান (রা) এ শর্ত মেনে নিলেন। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-এর লোক সেখানে পৌঁছে দেখলেন, ঘোড়াগুলো মারা গেছে। তখন তিনি দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী কেনার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।[১]

—বিক্রি চুক্তির মধ্যে এমন শর্ত বেঁধে দেয়া যে, বিক্রির পরও সেই জিনিস থেকে বিক্রেতা উপকৃত হতে পারবেন। যেমন–হযরত সুহাইব (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে তাঁর বাড়ি বিক্রি করেছিলেন। শর্ত ছিলো, বিক্রির পরও তিনি সেই বাড়িতেই থাকবেন।[২]

—পরস্পর কৃত চুক্তিতে দ্ব্যর্থবোধক কোনো শর্তের প্রয়োগ। যেমন এক ব্যক্তি কোনো মহিলাকে এ শর্তে বিয়ে করলেন, তার অমুক স্ত্রীকে তালাক দেবেন। হযরত সামিত সাদূসী বলেন—আমি এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম। তার আত্মীয় স্বজনরা বললো, যতক্ষণ তুমি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক না দেবে ততক্ষণ আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দেবো না। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিচ্ছি। তখন তারা সেই মহিলাকে আমার সাথে বিয়ে দিলো। পরে যখন আমার সাথে অন্য স্ত্রীকে দেখলো তখন জিজ্ঞেস করলো–কী, তোমার স্ত্রীকে তুমি তালাক দাওনি ? বললাম—আমি আমার অমুক স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। তবে অমুক স্ত্রীকে তালাক দেইনি।

অতপর আমি শাকীক ইবনু মুজযায়াত ইবনু ছাওরের নিকট গেলাম। তিনি তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে যাচ্ছিলেন। বললাম, মেহেরবানী করে আমার মাসয়ালাটা একটু জিজ্ঞেস করে আসবেন। তিনি সেখানে গিয়ে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত ওসমান (রা) বললেন—এটি তার নিয়তের ওপর নির্ভর করে।[৩] অর্থাৎ সে যাকে তালাক দিতে চেয়েছে তার ওপরই তালাক কার্যকর হবে।

–বেচাকিনিতে এরূপ শর্তারোপ করা যে, পণ্যে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে।

–('খিয়ার' শিরোনাম দেখুন)

–ঋণ পরিশোধের জন্য একটি বিশেষ সময় নির্ধারণের পর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই (ঋণ গ্রহীতার) তা পরিশোধ করা।–('কারয' শিরোনাম দেখুন)

৩. শর্ত ব্যাখ্যা করার অধিকার

যদি কোনো চুক্তিতে উভয় পক্ষ কোনো শর্তে একমত হন, পরে সেই শর্তের ব্যাখ্যা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সেই পক্ষের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হবে যার ওপর শর্তারোপ করা হয়েছিলো। যদি উক্ত শর্তের শব্দাবলীর মধ্যে সেই ধরনের ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। যেমন–শর্তারোপ করেছিলেন—আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে ততক্ষণ বিয়ে দেবো না, যতক্ষণ তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক না দেবে। তারা একবচনের শব্দে শর্তটি দিয়েছিলেন। এজন্য সামিত (রা) এর অর্থ করেছেন যে কোনো একজন স্ত্রী তালাক দিলেই

www.amarboi.org

হয়ে যাবে। কারণ একবচনের শব্দ সর্বদা একজনের ওপরই প্রযোজ্য হয়। অথচ তারা মনে করেছিলেন সামিতের স্ত্রী মাত্র একজন। তাই তারা একজনকে তালাক প্রদানের শর্ত দিয়েছিলেন। যেন স্ত্রী হিসেবে তাদের মেয়েই থাকে। যখন পরে অন্য স্ত্রীর সংবাদ তারা পেলেন তখন তাকেও তালাক দেবার দাবী করলেন। এখানে তাদের দু পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। তারা ফায়সালার জন্য হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট মামলা দায়ের করলেন। এ ঘটনা শুনে যার ওপর শর্তারোপ করা হয়েছিলো হযরত ওসমান (রা) তার কথাকেই ধর্তব্য বলে রায় দিলেন। কারণ শর্তের শব্দাবলীর মধ্যেই এ ধরনের তাৎপর্য গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

শা'রুন (شعر)—চুল/লোম

১. মাথার চুল বড়ো রাখা জায়েয। হযরত ওসমান (রা)-এর মাথার চুল এতটুকু লম্বা ছিলো যে, দু পাশে ঝুটি করে বেঁধে রাখতেন।[8]

কেউ যদি চুল বড়ো রাখে এবং চুলে বার্ধক্যের ছাপ দেখা যায়, তাহলে সুন্নাত হচ্ছে চুলে রঙ লাগানো। হযরত ওসমান (রা) চুলে মেহেদীর খিযাব লাগাতেন।

—(বিস্তারিত দেখুন 'খিযাব' শিরোনাম)

২. নামাযের সময় মাথার পেছনে চুল বেঁধে রাখা

নামাযের সময় পেছনে চুল বেঁধে রাখা মাকরূহ। নামাযীর উচিত চুল খোলা রেখে নামায পড়া। যেন সিজদার সাথে সাথে চুলগুলোও জমিনে লুটিয়ে পড়ে। হযরত ওসমান (রা) একদিন এক ব্যক্তিকে চুল পেছনে বেঁধে নামায পড়তে দেখলেন। তাকে লক্ষ্য করে বললেন—'ভাতিজা! যে ব্যক্তি চুল বেঁধে নামায পড়ে তার উপমা ঐ ব্যক্তির মত যে দু হাত কাধের সাথে বেঁধে নামায পড়ে।—(আরো দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

৩. মুহরিমের জন্য চুল ছোট করা বা মাথা ন্যাড়া করা নিষেধ

যিনি হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন তার জন্য মাথা কামানো কিংবা চুল ছোট করা নিষিদ্ধ।—('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

তদ্রূপ যিনি কুরবানী দেয়ার জন্য পশু খরিদ করবেন, যিলহাজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে কুরবানী পর্যন্ত তার চুল নখ কাটা নিষিদ্ধ।—('আযহিয়া' শিরোনাম দেখুন)

৪. পুরুষ বা মহিলার লজ্জাস্থানে লোম গজানো বালেগ হওয়ার নিদর্শন।

—(বিস্তারিত দেখুন 'বুলূগ' শিরোনাম)

শাহাদাহ্ (شهادة)—সাক্ষ্য

১. সংজ্ঞা

শাহাদাত বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তি নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অপর কোনো ব্যক্তির অধিকারের ব্যাপারে বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্যের নির্দিষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করা।

২. শাহিদ (সাক্ষী)

সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া জরুরী ঃ-

www.amarboi.org

[২.১] সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া : সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষীকে অবশ্যই সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোনো লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য নাবালেগ ব্যক্তির নিকট যদি কোনো গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য থাকে এবং সে বালেগ হওয়ার পর সাক্ষ্য প্রদান করে, তা গ্রহণ করা হবে, কিন্তু যদি সে নাবালেগ অবস্থায় সাক্ষ্য প্রদান করে, তা নাকচ হয়ে যাবে। নাবালেগ হওয়ার কারণে একবার সাক্ষ্য নাকচ হয়ে গেলে, বালেগ হওয়ার পর সেই সাক্ষ্য পুনরায় দিতে চাইলে তা গ্রহণ করা হবে না। হাঁ যদি প্রথমবার নাকচ না হয় তাহলে পুনরায় তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।[৫]

[২.২] স্বাধীনতা (আযাদী) : সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সাক্ষীকে মুক্ত মানুষ হতে হবে। কারণ গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যদি গোলামের কাছে কোনো সাক্ষ্য থাকে এবং সে গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সাক্ষ্য দিতে চায়, তা গ্রহণ করা হবে। গোলাম অবস্থায় যদি সাক্ষ্য দিতে চায় আর সে সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যায়, তাহলে গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় সেই সাক্ষ্য দিতে চাইলে যেহেতু আগে তার সাক্ষ্য নাকচ করা হয়েছে, সেই কারণেই তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।[৬]

[২.৩] ন্যায়পরায়ণ (আদিল) হওয়া : সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্ত হচ্ছে সাক্ষীকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। ফাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ওসমান (রা) ফাসিকী কাজসমূহের মধ্যে পাশা খেলাকেও ফাসিকী কাজ মনে করতেন। এজন্য তিনি তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য জোর দিতেন। একবার খুতবা দানের সময় তিনি বলেছিলেন—

'তোমরা পাশা খেলা থেকে বিরত থাকো। আমি জানতে পারলাম অনেকের ঘরে এখনও খেলার উপকরণাদি রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যাদের ঘরে সেগুলো রয়েছে, তা ফেলে দেবে অথবা জ্বালিয়ে দেবে।'

তিনি আরেকদিন খুতবা দেয়ার সময় বললেন—

"শ্রোতামণ্ডলী ! আমি তোমাদেরকে পাশা খেলা সম্পর্কে (বিরত থাকতে) বলেছিলাম। আমার মনে হয় এখনও তোমরা সেগুলো ঘর থেকে ফেলে দাওনি। আমি ইচ্ছে করেছি লাকড়ি জমা করাবো, তারপর তাদের বাড়িতে পাঠাবো, যাদের বাড়িতে এখনও সেগুলো রয়েছে যেন সবকিছু সহ সেগুলো জ্বালিয়ে দেয়।"[৭]

–যখন হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট ফাসিকের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়, কাজেই কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

[২.৪] ঘটনা প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ সুস্থ অবস্থায় থাকা : সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরেকটি শর্ত হচ্ছে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার অঙ্গ সুস্থ অবস্থায় থাকা। এজন্য হযরত ওসমান (রা) চাঁদ দেখার ব্যাপারে হাশিম ইবনু ওকবার একক সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ তিনি এক চোখে দেখতেন।[৮]–(আরো দেখুন 'আওয়ার' এবং 'আ'মা' শিরোনাম)

[২.৫] সাক্ষী তার সাক্ষ্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া : কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরেকটি শর্ত হচ্ছে—সাক্ষী যে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন তিনি সেই ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়েই

www.amarboi.org

সাক্ষ্য প্রদান করবেন। বিশেষ করে যিনার সাক্ষ্যের জন্য এটি আবশ্যক যে, তিনি বিচারকের নিকট পুরো ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করবেন যেভাবে তা অবলোকন করেছিলেন। যেন তার সেই সাক্ষ্য বিচারকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন—ব্যভিচারে লিপ্ত পুরুষ ও মহিলাকে ভালোভাবে চেনা, যিনার জায়গা ও সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকা। হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট কতিপয় লোক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ দায়ের করলেন। তিনি যিনার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গিয়ে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো গোল করে তার ভেতর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন—তোমরা কি এরূপ অবস্থায় দেখেছো ?[৯]-(আরো বিস্তারিত দেখুন 'যিনা' শিরোনাম)

৩. সেই সমস্ত বস্তু যে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়

[৩.১] সম্পদ সংক্রান্ত সাক্ষ্য ঃ একথার ওপর সকলেই একমত যে, সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রমাণের জন্য দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى .(البقرة : ٢٨٢)

"দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানিয়ে নাও। যদি পুরুষ দুজন না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে সাক্ষী বানিয়ে নাও। যেন তাদের কোনো একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২)

[৩.২] চাঁদ দেখা সংক্রান্ত সাক্ষ্য ঃ চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। এজন্য হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—দুজন পুরুষ সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত চাঁদ দেখার ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য নয়।[১০]

[৩.৩] এমন ব্যাপারে সাক্ষ্য যে ব্যাপারটি শুধু মহিলারাই অবগত ঃ যেসব ব্যাপার মহিলাদের সাথে সম্পৃক্ত এবং শুধু মহিলারাই অবগত সেসব ব্যাপারে একজন মহিলার সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। যেমন—মহিলাদের শারীরিক ত্রুটি,[১১] দুধ পান করানো ইত্যাদি। এজন্য হযরত ওসমান (রা) শুধু একজন মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন।
-('রিযা' শিরোনাম দেখুন)

[৩.৪] যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য ঃ বিস্তারিত জানার জন্য 'যিনা' শিরোনাম দেখুন।

৪. শুধু একজনের সাক্ষ্য এবং শপথের ভিত্তিতে আদালতের রায় প্রদান।
-বিস্তারিত দেখুন 'কাযা' শিরোনাম)

-যিনার সাক্ষ্য পুরোপুরি উপস্থিত করতে না পারলে অন্যান্য সাক্ষীদের ওপর হাদ কার্যকরী করা।-(বিস্তারিত দেখুন 'কাযফ' শিরোনাম)

www.amarboi.org

শিরক (شرك)—বহু ঈশ্বরবাদ/Polytheism

–অনারব মুশরিক হলে পিতা পুত্র কেউ কারো ওয়ারিশ হবে না।

–(বিস্তারিত দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

–মুশরিক মহিলাকে মুসলমানের বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

–(বিস্তারিত জানার জন্য 'নিকাহ' শিরোনাম দেখুন)

শিরকা/শরিকা (شركة)—অংশীদারী কারবার

মুদারাবার ভিত্তিতে যৌথ কারবার, যাকে পরিভাষায় 'আল কারায' বলা হয়। দু' পক্ষ এই শর্তে কোনো ব্যবসা শুরু করা যে, এক পক্ষের মূলধন এবং অপর পক্ষের শ্রম। এ অবস্থায় চুক্তি মুতাবেক উভয়ের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন হবে, যে হার তারা আলোচনা করে নির্ধারণ করবেন সেই হারে। লোকসান পুঁজি বিনিয়োগকারীর। অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে মুদারাবা কারবার শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয। হযরত ওসমান (রা) এ শর্তে মুদারাবা কারবারে বিনিয়োগ করেছিলেন, লাভ উভয় পক্ষের সমান সমান।[১২] এবং লোকসান পুঁজি বিনিয়োগকারীর। অর্থাৎ তার নিজের।

শিবহুল আমাদ (شبه العمد)—

জিনাইয়াতু শিবহুল আমাদ বলতে এমন অপরাধকে বুঝায়—কেউ কাউকে এমন বস্তু দিয়ে আঘাত করলো, যে বস্তুটি সাধারণত হত্যা কাণ্ডের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু সেই বস্তুর আঘাতেই সে নিহত হলো।

জিনাইয়াতু শিবহুল আমাদ এর জন্য দিয়াত মুগাল্লাযা (পুরো রক্তপণ) প্রদান বাধ্যতামূলক।–(আরো বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম)

শুফ'আহ্ (شفعة)—ক্রয়ের অগ্রাধিকার

১. সংজ্ঞা

শুফ'আহ্ সেই অধিকারকে বলে যা যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পদে কোনো শরীকের অংশ বিক্রির সময় বিক্রেতার কাছ থেকে কিংবা যদি কেউ কিনে থাকে সেই ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য পরিশোধ করে জোরপূর্বক তা ক্রয় করা।

২. যেসব বস্তুতে শুফ'আহ্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়

শুধু এমন শরীকী বস্তুতে শুফ'আর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বণ্টনযোগ্য।[১৩] শুফ'আহ্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যৌথ মালিকানার জিনিসে। যে জিনিসের মালিকানায় অংশ নেই, প্রতিবেশী হওয়ার কারণে তাতে শুফ'আহ্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—যখন কোনো সম্পত্তি বণ্টনের পর মালিকানার সীমানা নির্দিষ্ট হয়, তখন শুফ'আহ্র অধিকার রহিত হয়ে যায়।[১৪]

www.amarboi.org

যেসব সম্পদ বন্টনযোগ্য নয় তার মধ্যে শুফ'আহর অধিকার প্রতিষ্ঠিতও হয় না। যেমন—কূপ, নর খেজুর গাছ ইত্যাদি। তাই হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—কূপ এবং নর খেজুর গাছে শুফ'আহ্ হয় না।[১৫]

শুরবুন (شرب)—পান করা

ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তায় বর্ণনা করেছেন—হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) দাঁড়িয়েও পানি পান করতেন।[১৬]

শূরা (شورى)—পরামর্শ/উপদেশ পরিষদ

১. সংজ্ঞা

বিশেষ কোনো বিষয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত বা পরামর্শ গ্রহণ করাকে শূরা বলা হয়।

২. শূরার গুরুত্ব

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান এবং বিচারকের জন্য অবশ্য কর্তব্য (ওয়াজিব) হচ্ছে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তদ্রূপ কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরও উচিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা সুস্পষ্ট নয় জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া। হযরত ওসমান (রা) অন্যান্য খুলাফাই রাশিদীনের মত খিলাফতের কাজে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী গুণী সাহাবা কিরাম (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আদাবুল কাযী নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে—হযরত ওসমান (রা)-এর অভ্যাস ছিলো—যখন দু পক্ষ কোনো মামলা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন, তখন তিনি এক পক্ষকে বলতেন—আলী (রা)-কে ডেকে নিয়ে আসুন। অন্য পক্ষকে বলতেন—তালহা (রা) এবং যুবাইর (রা)-কে ডেকে নিয়ে আসুন। যখন তারা সবাই এসে উপস্থিত হতেন, তখন তিনি বাদী-বিবাদীকে তাদের বক্তব্য পেশ করার নির্দেশ দিতেন। বাদী বিবাদীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি ঐসব মনীষীদের দিকে ফিরে বলতেন, এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কী? যদি তাদের মতামত তাঁর মতের অনুকূলে হতো, তখন সাথে সাথে রায় প্রদান করতেন। অন্যথায় তিনি চিন্তা-ভাবনা করার জন্য রায় প্রদানে বিলম্ব করতেন। এতে উভয় পক্ষ রায় শুনে খুশীমনে চলে যেতেন।[১৭] –(আরো বিস্তারিত দেখুন 'কাযা' শিরোনাম)

–যুদ্ধে অমুসলিম মহিলাদের সাথে গ্রেফতারকৃত সন্তানকে ওয়ারিশীস্বত্ব প্রদানের ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা) সাহাবা কিরাম (রা)-এর সাথে পরামর্শ করেছেন।

–('ইরছ' শিরোনাম দেখুন)

–খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে পরামর্শ।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইমারাত' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'শ' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৬৭ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪২০।
২. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৪২০ ; আল মাজমু', ১ম খণ্ড, পৃ-৫২৪।
৩. সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ-২৪৬ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭২৯, ৭ম খণ্ড, পৃ-১২৭ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৭।
৪. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৮৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১২১।
৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮০, ৮৭ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৮৩, ৮৪, ৯৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১০৫ ; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৮৫, ২৮৯।
৬. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪২১ ; আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃ-৫১১।
৭. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৪১২।
৮. সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২১৪।
৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৬৭।
১০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩১।
১১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৬৭।
১২. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৬৮৮ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৩ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-২২ ; ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনু আবী লাইলা, পৃ-৩২ ; তাবাকাত-ইবনু সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ-৬০।
১৩. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১১।
১৪. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৮৫।
১৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮০, ৮৭ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৮০, ৮৪, ৯৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১০৫ ; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৮৫, ২৮৯।
১৬. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯২৫।
১৭. আদাবুল কাযী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৫৫ ; সুনানু বাইহাকী, ১০ম খণ্ড, পৃ-১১২।

www.amarboi.org

স

সগীরুন (صغير)—শিশু কিশোর/নাবালেগ

১. অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েকে উপার্জনে বাধ্য করা

হারাম হালাল সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নয় এমন শিশুদের অভিভাবকের কর্তব্য, হারাম পথে নিয়ে যায় যেমন উপার্জনে বাধ্য করা বা কোথাও শিশু শ্রমে লাগিয়ে দেয়া। এমন সকল রাস্তা তার জন্য বন্ধ করে দেয়া। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে উপার্জনের জন্য বাধ্য কোরো না। যদি বাধ্য করো তাহলে সে কিছু করতে না পেরে চুরির পথ বেছে নেবে। তদ্রূপ কোনো কাজকর্ম জানে না এমন বাঁদীকেও উপার্জনের জন্য চাপ দিয়ো না। তাহলে সে দেহ বিক্রি শুরু করে দেবে।[১]

২. নাবালেগের ওপর 'হাদ' কার্যকর না করা

বিস্তারিত জানার জন্য 'হাদ' শিরোনাম দেখুন।

–নাবালেগের সাক্ষ্য গ্রহণ না করা।–(দেখুন 'শাহাদাত' শিরোনাম)

–বাইতুলমাল থেকে শিশুদের ভাতা প্রদান।–('আতা' শিরোনাম দেখুন)

–অপ্রাপ্ত বয়স্কের তালাক।–(বিস্তারিত দেখুন 'তালাক' শিরোনাম)

–নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে অভিভাবকের ফিতরা প্রদান করা।
–(দেখুন 'যাকাতুল ফিতর' শিরোনাম)

–নাবালেগের ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ।–('হিজর' শিরোনাম দেখুন)

–শিশু কিশোরের পক্ষ থেকে দান গ্রহণ।–('হিবা' শিরোনাম দেখুন)

–অপ্রাপ্ত বয়স্ককে কোনো কিছু দান করা।–(ঐ)

–যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে শিশু কিশোর গ্রেফতার হলে তাদেরকে হত্যা না করা।
–(বিস্তারিত দেখুন 'আসির' শিরোনাম)

সব্‌গুন (صبغ)—রং করা

–চুল রাঙানোর মাসয়ালা।–(বিস্তারিত দেখুন 'খিযাব' শিরোনাম)

সাবিয়্যুন (صبي)—শিশু

বিস্তারিত দেখুন 'সগীরুন' শিরোনাম।

সাইদ (صيد)—শিকার

–ইহরাম পরা অবস্থায় শিকার করা, হেরেম শরীফের ভেতর শিকার করা এবং তার কাফ্‌ফারা সম্পর্কে দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম।

–মুহরিমের জন্য শিকারকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া।–('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

www.amarboi.org

–ইমাম ইবনু কুদামা (রহ) হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—যদি শিকারকৃত প্রাণীর শরীর থেকে রক্ত বের হয় তা খাওয়া জায়েয নেই।[২]

সাঈ (سعی)–সাফা মারওয়া দৌড়ানো

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন–'হাজ্জ' শিরোনাম।

সদাকাহ্ (صدقة)–দান-সাদকা

১. সংজ্ঞা

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোনো জিনিস নিঃস্বার্থভাবে অভাবী ও নিঃস্বকে প্রদান করার নাম সাদাকাহ।

সাদাকাহ্ দু প্রকার ঃ

ক. ফরয সাদাকাহ্, যেমন যাকাত (ফিতরাও এর অন্তর্ভুক্ত)।

খ. নফল সাদাকাহ্, যাকে আমরা সাধারণত দান-খয়রাত বলে থাকি।

২. উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সাদকা প্রদান করা অন্য খাতে খরচের চেয়ে উত্তম। কেননা তারাই দান-সাদকা গ্রহণের বেশী মুখাপেক্ষী থাকেন। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—উদ্বাস্তুদেরকে সাদকা প্রদানে সাতশ' গুণ বেশী সওয়াব।[৩]

৩. অভাবী ব্যক্তির হস্তগত হওয়া সাদাকার অন্যতম শর্ত

সাদকা এমন একটি কাজ যেখানে এক ব্যক্তি সাহায্যের মানসিকতায় তার মাল সওয়াবের নিয়তে অন্যকে দিয়ে দেন। এজন্য অভাবী ব্যক্তির হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত সাদাকাহ্ কার্যকরী হয় না। অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ অভাবী ব্যক্তি সেই জিনিস নিজ মালিকানায় না নেবে ততক্ষণ সাদাকাহ্ দাতা তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে পারেন। অভাবী ব্যক্তির মালিকানায় চলে যাওয়ার পর সাদাকাহ্ দাতা তার সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন করতে পারেন না। এজন্য হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—সাদাকাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হয় না যতক্ষণ অভাবী ব্যক্তি তা নিজ করায়ত্তে না নেবে।[৪]

সদাকাতুল ফিতর (صدقة الفطر)–ফিতরা

বিস্তারিত দেখুন 'যাকাতুল ফিতর' শিরোনাম।

সাফার (سفر)–সফর/ভ্রমণ

১. ইদ্দত পালনরত মহিলার সফর

স্বামীর মৃত্যুর কারণে যে মহিলা ইদ্দত পালন করছেন, কোনো প্রকার সফর করা তার জন্য জায়েয নেই। চাই তা হাজ্জ এবং ওমরার জন্যই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে। ইদ্দত পালনরত অবস্থায় যেসব মহিলা হাজ্জ কিংবা ওমরার জন্য রওয়ানা হতেন হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে রাস্তা থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।[৫]–(আরো দেখুন 'ইদ্দাহ্' শিরোনাম)

www.amarboi.org

২. মুকাতাব* গোলামের সফর

যখন কোনো ব্যক্তি তার গোলামকে মুকাতাবের ভিত্তিতে মুক্ত করে দেয়ার চুক্তি করেন, তখন সে মালিকের অনুমতি ছাড়া স্বাধীন মানুষের মত সফর করতে পারে। এমতাবস্থায় তাকে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার মালিকের নেই। এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে—আব্‌দ ইবনু কায়িস আসলামী তাঁর এক গোলামের সাথে মুকাতাব এর ভিত্তিতে চুক্তি করেছিলেন। চুক্তির পর গোলাম বসরা সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। আব্‌দ ইবনু কায়িস তাকে বাধা দিলেন। তখন হযরত ওসমান (রা) তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন তাকে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার আপনার নেই। তাকে যেতে দিন।[৬]

৩. সফর থেকে ফেরার সুন্নাত

হযরত ওসমান (রা)-এর অভ্যাস ছিলো, যখনই তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন, দু রাকায়াত নফল নামায পড়তেন।[৭]

৪. সফরে নামায কসর করা

[৪.১] কসর নামাযের নির্দেশের ধরন ঃ একদল আলিমের অভিমত হচ্ছে—হযরত ওসমান (রা) সফরে নামায কসর পড়াকে বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) মনে করতেন না। শুধু জায়েয মনে করতেন। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন মুসাফির ইচ্ছে করলে নামায কসর করতে পারেন আবার পুরো নামাযও পড়তে পারেন। হয়তো এ কারণেই তিনি অনেক হাজ্জে মিনায় অবস্থানকালে নামায কসর পড়েছেন আবার অনেক হাজ্জে পুরো নামাযই আদায় করেছেন। আরেকদলের মতে—তিনি সফরে নামায কসর করা বাধ্যতামূলক মনে করতেন। সফরে নামায কসর না করা জায়েয মনে করতেন না। হাজ্জের সময় মিনায় অবস্থানকালে পুরো নামায পড়ার কারণ তিনি মক্কায় বিয়ে করেছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য আমরা হাজ্জ শিরোনামে বর্ণনা করেছি, এটি হিজরী ২৯ সনের ঘটনা।

[৪.২] নামায কসর করার জন্য সফরের দূরত্ব ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—সফর বলতে এমন ভ্রমণকে বুঝায়, নিজ শহর থেকে অন্য শহরের দিকে যাত্রা কিংবা দূরের কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেয়া। যেখানে যেতে হলে মানুষের রাস্তা খরচ ও পানাহারের প্রয়োজন হয়। কৃষক তার বাড়ি থেকে চাষাবাদের জন্য ক্ষেতে গেলে কিংবা ফেরিওয়ালা তার পণ্য বিক্রির জন্য বেরিয়ে পড়লে, তারা মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন না। কৃষক তার কাজ শেষ করে এবং ফেরিওয়ালা তার পণ্য বিক্রি করে বাড়িতে ফিরে আসেন। কাজেই তাদের নামায কসর করা জায়েয নেই। এমন কি এ ধরনের সফরে তাদের পথ খরচ ও পানাহারের প্রয়োজন হয় না। এজন্য হযরত ওসমান (রা) গর্ভনরদেরকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, কোনো মুকীম, কৃষক এবং ব্যবসায়ী যেন নামায কসর না করেন। কসর শুধু তিনিই করতে পারবেন যার সফরে পাথেয় প্রয়োজন হয়।[৮] তিনি বসরাবাসীর উদ্দেশ্যে লিখে পাঠিয়েছিলেন—

* এমন গোলামকে মুকাতাব বলা হয় যে কিছু টাকা কিংবা সম্পদের বিনিময়ে মনিবের সাথে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।—অনুবাদক

www.amarboi.org

আমি জানতে পারলাম তোমরা পশু চরাতে গেলে, কৃষি কাজ করতে গেলে অথবা (হাট বাজারে) বেচাকেনা করতে গেলেও নাকি পুরো নামাযের পরিবর্তে কসর পড়ে থাকো। ভবিষ্যতে এরূপ করবে না। কসর শুধু সেই ব্যক্তি পড়বে যিনি নিজ শহর থেকে দূরে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন কিংবা শত্রু পক্ষের মুকাবেলায় কাতারবন্ধী হয়ে দাঁড়িয়ে যান।[৯]

৫. সফরে দু ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া

যোহরের সাথে আসর এবং মাগরিবের সাথে ঈশার নামায একত্রিত করে পড়া মুসাফিরের জন্য জায়েয। হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি সফরে রওয়ানা হলে এবং তাড়া থাকলে যোহর ও আসর নামায একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব ও ইশার নামাযও একত্র করে পড়ে নিতেন।[১০]

৬. সফরে নফল নামায

আল্লাহ তা'আলা ফরয নামাযই যখন মুসাফিরের জন্য সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন তখন নফল নামায আরো হাল্কা হয়ে যাবে এটিই স্বাভাবিক। এজন্য হযরত ওসমান (রা) সফরে কোনো সুন্নাত ও নফল নামায পড়তেন না। শুধু ফরয নামায আদায় করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—তিনি সফরে থাকা কালিন সময়ে ফরয নামাযের আগে কিংবা পরে কোনো নামায পড়তেন না।[১১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত ওমর (রা)-এর সাথে ফরয হাজ্জ আদায় করেছি। তিনি হাজ্জের সফরে কোনো নফল নামায পড়তেন না। আমি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথেও হাজ্জ আদায় করেছি। তিনিও হাজ্জের সময় দিনে কোনো নফল নামায পড়তেন না।[১২] হযরত ইবনু ওমর দিনের কথা বলেছেন, নফল নামায সাধারণত দিনেই পড়া হয়। রাতের ব্যাপারে তিনি কিছু বলেননি, কারণ হযরত ওসমান (রা)-এর রাতের আমল সম্পর্কে তিনি কিছু জানতেন না।

৭. সফরের সুযোগ সুবিধার পরিসমাপ্তি

মুসাফির যতক্ষণ বাড়িতে ফিরে না আসবেন কিংবা কোথাও চৌদ্দ দিন বা তারচে' বেশী সময় অবস্থান করার সিদ্ধান্ত না নেবেন ততক্ষণ সে মুসাফিরের সুযোগ সুবিধা পুরোপুরিই পাবেন। যেদিন সেখানে পৌঁছুবেন এবং যেদিন সেখান থেকে রওয়ানা করবেন এ দু'দিন বাদ দিয়ে চৌদ্দ দিন হিসেব করতে হবে। ইমাম নববী (রহ) হযরত ওসমান (রা)-এর এ অভিমত বর্ণনা করেছেন।[১৩]

আমরা হাজ্জ শিরোনামে বলেছি, হযরত ওসমান (রা) মক্কায় বিয়ে করে সেখানে অবস্থান করার সুবাদে নামায কসর না পড়ে পুরো নামায-ই পড়েছেন। না জানার কারণে যারা তাঁর এ কাজের আপত্তি করেছিলেন তাদেরকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন—

লোকেরা শোনো ! আমি মক্কায় এসেই বিয়ে করেছি। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—যে ব্যক্তি কোথাও বিয়ে করবে সে মুকীমের মত। তাকে পুরো নামায-ই পড়তে হবে।[১৪]

www.amarboi.org

সাফাহ্ (سفه)-বোকামী/নিবুর্দ্ধিতা

–এমন ব্যক্তিকে বোকা বা নির্বোধ বলা হয় যে তার মাল-সম্পদ সুষ্ঠভাবে ব্যয় করতে পারে না।

–নির্বোধ লোকের সম্পদ ব্যয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ।–(বিস্তারিত দেখুন 'হাজর' শিরোনাম)

সাব্বুন (سب)–গালি-গালাজ

গালিগালাজ করাকে সাব্বুন বলে। এজন্য তাযীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করা উচিত।–(আরো দেখুন 'হিজা' শিরোনাম)

সাবিয়্যুন (سبى)–কয়েদী/বন্দী

১. সংজ্ঞা

অমুসলিম যেসব মহিলা ও শিশু যুদ্ধবন্দী হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয় তাদেরকে সাবিয়্যুন বলা হয়।

২. যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে বিধান

–খলীফা ইচ্ছে করলে অনুগ্রহ পূর্বক তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারেন। অথবা তাদেরকে গোলাম-বাঁদী বানাতে পারেন কিংবা চাইলে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারেন আবার তাদেরকে হত্যাও করতে পারেন।–(আরো দেখুন 'আসির' শিরোনাম)

–যুদ্ধবন্দী মহিলাদেরকে বাঁদী হিসেবে মালিকানাধীনে নেয়ার পর তাদের সাথে বিছানায় যাবার পূর্বে তাদের ইসতিবরা (গর্ভমুক্ত কিনা তা নিশ্চিত হওয়া) আবশ্যক।

সামহাক (سمحاق)–মাথার এমন ক্ষত যাতে হাড়ের কাছের ঝিল্লি দৃষ্টিগোচর হয়

মাথার চামড়া এবং হাড়ের মাঝামাঝি পর্দা দৃষ্টিগোচর হয় এমন ক্ষতের কিসাস।
–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়াহ্' শিরোনাম)

সারিকাহ্/সিরকাহ্ (سرقة)–চুরি

১. সংজ্ঞা

মুকাল্লাফ* ব্যক্তি সংরক্ষিত কোনো জায়গা থেকে এমন জিনিস হস্তগত করা, যে জিনিসের ওপর তার কোনো অধিকার নেই।

২. চোরকে হাত কাটার শাস্তি দেয়ার শর্ত

যতক্ষণ নির্দিষ্ট কতিপয় শর্ত না পাওয়া যাবে ততক্ষণ চুরির অপরাধে কারো হাত কাটা যাবে না। কিছু শর্ত চোরের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কিছু শর্ত চোরাই মালের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কিছু শর্ত হচ্ছে চুরি প্রমাণিত করার জন্য। আমরা এখন এ তিনটি দিকের শর্তাবলী নিয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

* বালেগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম নারী পুরুষকে মুকাল্লাফ বলা হয়।–(অনুবাদক)

www.amarboi.org

[২.১] চোরের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী [ক] ঃ চোরের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত হাদ প্রয়োগ করা যাবে না যতক্ষণ সে বালেগ, বুদ্ধিমান, স্বাধীন এবং চুরি করা অন্যায় একথা অবহিত না হবে। আমরা হাদ শিরোনামে আলোচনা করেছি, এক বালক চুরি করেছিলো, হযরত ওসমান (রা) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার নাভির নিচে লোম গজিয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। যখন দেখা গেলো লোম গজায়নি। তখন আর তাকে হাত কাটার শাস্তি দেননি।[১৫]

[খ] পলাতক গোলাম যদি চুরি করে ঃ পলাতক গোলাম যদি চুরি করতো তাহলে হযরত ওসমান (রা) তাকে হাত কাটার শাস্তি দিতেন না।[১৬] কারণ গোলাম ফেরারী হওয়ার পর সে সত্যিকার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) এক মজার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—একবার আমি হযরত ওমর ইবনু আবদুল আযীযের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পলাতক গোলাম চুরি করলে তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে কি ? নাকি যাবে না ? বললাম—আমিতো এ সম্পর্কে কোনো হাদীস শুনিনি। তখন ওমর ইবনুল আবদুল আযীয বললেন, হযরত ওসমান (রা) এবং মারওয়ান ইবনু হাকাম পলাতক গোলামকে চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি দিতেন না।

ইমাম যুহ্‌রী (রহ) আরো বলেন—তারপরে যখন ইয়াযীদ ইবনু আবদুল মালিক খলীফা হলেন তখন তার কাছে এ ধরনের একটি মামলা দায়ের করা হলো। তিনি আমার কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাই বললাম, যা হযরত ওমর ইবনু আবদুল আযীয হযরত ওসমান (রা) এবং মারওয়ান ইবনু হাকাম এর কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন। তিনি বললেন—তুমি এর চেয়ে বেশী কিছু শুনেছো কি ? আমি বললাম, শুধু এতটুকুই শুনেছি। তখন ইয়াযীদ ইবনু আবদুল মালিক বললেন—আল্লাহর কসম ! আমি এ গোলামকে যেভাবেই হোক হাত কাটার শাস্তি দেবো।

যুহ্‌রী বলেন—সেই বছর আমি বাইতুল্লায় হাজ্জ করতে যাই। সেখানে হযরত সালিম ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বললেন —হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর এক পলাতক গোলাম চুরি করে। তো হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) তাকে মদীনার গভর্নর সাঈদ ইবনু আস (রা)-এর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি বললেন—একে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। কারণ আমরা কোনো পলাতক গোলামকে চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি দেই না। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) গিয়ে তার ওপর হাদ কায়েম করলেন। কিংবা তার সামনেই তাঁর হাত কেটে ফেললেন।[১৭]

[গ] গোলাম তার মনিবের মাল চুরি করলে ঃ গোলাম তার মনিবের মাল চুরি করলে সে জন্য তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) উভয়ে এ নীতির ভিত্তিতেই বিচার ফায়সালা করেছেন। আর এ দুজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো সাহাবাই দ্বিমত পোষণ করেননি।[১৮]

[২.২] চোরাই মাল সম্পর্কিত শর্তাবলী [ক] চোরকে চুরির অপরাধে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত কাটা যাবে না যতক্ষণ চোরাই মাল সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পাওয়া না যাবে।

www.amarboi.org

[ক.১] চোরাই মালের মূল্য কমপক্ষে এক দীনারের চার ভাগের এক ভাগ হবে।[১৯] হযরত ওসমান (রা)-এর সামনে এমন এক চোরকে হাজির করা হলো, যে একটি বড়ো আকারের লেবু চুরি করেছিলো। তিনি লেবুর মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন। তার মূল্য ধরা হলো তিন দিরহাম। তখন এক দীনার সমান ছিলো বারো দিরহাম। অতপর তিনি চোরের হাত কাটার শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।[২০]

ইবনু আবী শাইবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওসমান (রা) চুরির কথা জানতে পেরে চোরকে আচ্ছামত ধমকে দিতেন। বলতেন—তুমি পুনরায় এ কাজ করলে তোমার হাত কেটে দেবো।[২১]

আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা মতে—হযরত ওসমান (রা) বলেছিলেন, আমি তোমাদের থেকে শপথ নিয়ে বলছি, তোমরা এ কাজ ছেড়ে দাও নইলে এ অপরাধে যাকে আমার সামনে নিয়ে আসা হবে, তা যদি একটি চাবুক চুরির অপরাধও হয় আমি তার সাথে খুব শক্ত আচরণ করবো।

একথা তিনি সতর্কতার জন্য বলেছিলেন। যদি চাবুক চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান থাকতো তাহলে তিনি সেই আইন কার্যকরী না করে এমনিই ছেড়ে দিতেন, তা হতে পারে না। তবু যদি তিনি চাবুক চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি দিতেন তাহলে বলা যেত তিনি সেই শাস্তি 'হাদ' স্বরূপ দেননি, দিয়েছেন 'তাযীর' স্বরূপ।

[ক.২] দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—চোরাই মালের সাথে চোরের কোনো অধিকার জড়িত না থাকা। যদি চোরাই মালের সাথে তার অধিকার জড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। যেমন বাইতুলমাল থেকে কেউ চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং হযরত আলী (রা) নিজ নিজ খিলাফত কালে এ নীতির ভিত্তিতেই ফায়সালা করেছেন কিন্তু সাহাবা কিরামের মধ্যে কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত করেছেন বলে কোনো বর্ণনা আমরা পাইনি।[২২]

[ক.৩] চোরাই মাল সংরক্ষিত জায়গায় থাকতে হবে। চুরি করেছে কিন্তু সংরক্ষিত জায়গা থেকে সেই মাল অন্যত্র সরিয়ে নেয়নি। এমতাবস্থায় সেই মাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা যাবে না। হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—সংরক্ষিত কোনো জায়গা থেকে চুরির নিয়তে মালামাল জমা করার পর বাইরে সরিয়ে নিজ আয়ত্তে নেয়ার আগেই যদি চোর ধরা পড়ে যায় তাহলে তার ওপর 'হাদ' কার্যকর করা যাবে না।[২৩]

[ক.৪] পাখী চুরির অপরাধে হযরত ওসমান (রা) হাত কাটার শাস্তি দিতেন না। তিনি বলতেন—পাখী চুরির জন্য চোরের হাত কাটা যাবে না।[২৪]

<u>[খ] চোরাইমাল ফেরত প্রদান ঃ</u> চোরাই মাল অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেলে মালিক তা ফেরত নেবেন। আর যদি সেই মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অনুরূপ মাল চোর তার মালিককে ফেরত দেবে। যদি অনুরূপ মাল না পাওয়া যায়, তার মূল্য মালিককে ফেরত দিতে হবে। চোর সচ্ছল হোক বা না হোক।[২৫]

যদি চোরাই মাল এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয় যাকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। যিনি সদাচারী বলে পরিচিত। এমতাবস্থায় যার মাল চুরি গেছে তিনি

www.amarboi.org

দুটো পদ্ধতির যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারেন। ঐ ব্যক্তিকে মালের মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে সেই মাল কিনে নেবেন কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য চোরের পেছনে লেগে যাবেন। মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাকে বলা হয়েছে—হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা)-এর সময় তিনি চোরাই মাল বিক্রি হয়ে গেলে যিনি কিনেছেন তাকে চোর সাব্যস্ত করা না গেলে মালিককে মালের দাম পরিশোধ করে কিনে নেয়ার জন্য বলতেন অথবা তাকে চোরের কাছ থেকে আদায় করার নির্দেশ দিতেন।[২৬]

৩. চুরি প্রমাণিত হওয়া

যেহেতু চুরির শাস্তি 'হাদ' এর অন্তর্ভুক্ত তাই চুরি প্রমাণ করার জন্য সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, যে পদ্ধতিতে সাধারণত 'হাদ' প্রমাণিত হয়। কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় চুরির কথা স্বীকার করে তাহলে বিচারকের উচিত তার কথা প্রত্যাহার করার জন্য ইঙ্গিত দেয়া। 'হাদ' এর ব্যাপারে যেরূপ হয়ে থাকে।-(বিস্তারিত দেখুন 'হাদ' শিরোনাম)

৪. চুরির শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনেই চুরির শাস্তি সম্পর্কে বলে দিয়েছেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً ۢبِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ ط ـ

"চোর পুরুষ হোক কিংবা মহিলা তাদের হাত কেটে দাও, এটি তাদের কৃতকর্মের শাস্তি, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা।"-(সূরা আল মায়িদা ঃ ৩৮)

আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক প্রথমে চোরের ডান হাত কাটতে হবে। যদি দ্বিতীয়বার সে চুরি করে তাহলে তার বাম পা কাটতে হবে। যদি তৃতীয়বার চুরি করে তবে বাম হাত কাটা যাবে। তারপর চতুর্থবারও যদি সে চুরি করে তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।[২৭]

সালাত (صلوة)-নামায

নামায সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমতগুলো আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামে আলোচনা করবো।

১. নামায পরিত্যাগের গুনাহ। ২. নামাযের জন্য পবিত্রতা। ৩. নামাযের মাকরূহ সমূহ। ৪. নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া। ৫. যেসব কাজে নামায নষ্ট হয়ে যায়। ৬. নামাযের সময়। ৭. নামাযে করণীয়। ৮. বিতর নামায। ৯. নামাযীকে লুকমা (ভুল সংশোধন করে) দেয়া। ১০. মুসাফির এবং শত্রু বেষ্টিত অবস্থায় নামায। ১১. জামায়াতে নামায। ১২. জুম'আর নামায। ১৩. ঈদের নামায। ১৪. ইসতিসকার নামায। ১৫. সূর্যগ্রহণের নামায। ১৬. সফর থেকে ফিরে নামায। ১৭. তাহাজ্জুদ নামায। ১৮. মাগরিবের পূর্বে দু রাকায়াত নামায। ১৯. জানাযার নামায।

এবার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

১. নামায পরিত্যাগের গুনাহ

নামায ফরয। ইসলামে নামাযের মর্যাদা ঠিক তেমন, যেমন শরীরের সাথে মাথার সম্পর্ক। এজন্য খুলাফা-ই-রাশিদীন রাদিয়াল্লাহু আনহুম নামায ছাড়া অন্য কোনো ফরয পরিত্যাগ করাকে কুফরীর সমপর্যায়ে মনে করতেন না।[২৮]

www.amarboi.org

২. নামাযের জন্য পবিত্রতা

নাপাকী, পেশাব, পায়খানা এবং শারীরিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য। যদি কেউ ওপরোক্ত শর্ত পূরণ না করেই নামায আদায় করে, তার নামায শুদ্ধ হবে না। পুনরায় সেই নামায আদায় করা ওয়াজিব। হযরত ওসমান (রা) একবার লোকদের ফজরের নামায পড়িয়েছিলেন। তখন বুঝতে পারেননি যে, তিনি অপবিত্র তাঁর ওপর গোসল ফরয। ফর্সা হওয়ার পর দেখতে পেলেন তার কাপড়ে স্বপ্নদোষের আলামত। তখন বলতে লাগলেন—আল্লাহর কসম ! আমার দ্বারা শক্ত গুনাহ হয়ে গেছে। আমি একথা জানতেই পারিনি, আমার শরীর নাপাক। অতপর তিনি সেই নামায পুনরায় পড়লেন।[২৯]

শুধু এজন্য তিনি নামায পুনরায় পড়েছিলেন যে, নামাযের শর্ত অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন না করেই তা পড়া হয়েছিলো। জুতা পায়ে নামায পড়ার ব্যাপারে মাসয়ালা হচ্ছে—জুতার তলায় কোনো নাপাকী না থাকলে, সেই জুতা পায়ে নামায পড়া জায়েয। হযরত ওসমান (রা) জুতা পায়ে নামায পড়তেন।[৩০]

৩. নামাযের মাকরূহসমূহ

[৩.১] চুলের ঝুটি বেঁধে নামায পড়া ঃ নামাযের সময় চুলের ঝুটি বেঁধে রাখা মাকরূহ। চুল খোলা রেখে নামায পড়া মুস্তাহাব। যেন সিজদার সাথে সাথে সব চুলও সিজদায় লুটিয়ে পড়তে পারে। হযরত ওসমান (রা) এক ব্যক্তিকে চুলের খোপা বেঁধে নামায পড়তে দেখে বললেন—ভাতিজা ! নামাযে যে চুল বেঁধে রাখে তার উপমা ঐ ব্যক্তির মত, যে নামাযের সময় দুহাত কাধের সাথে বেঁধে রাখে।[৩১]

[৩.২] এমন জিনিস সামনে রেখে নামায পড়া কাফিররা যেগুলোর পূজা করে ঃ এমন সব বস্তু সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহ, কাফিররা যেগুলোর পূজা করে। যদিও সেগুলোর পূজা করার খেয়াল তার না থাকে। যেমন, মূর্তি, ছবি, আগুন কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো বস্তুর দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহ। কারণ মুশরিকরা এগুলোর পূজা করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে—ইবাদাতে যেন মুশরিকদের সাদৃশ্য হয়ে না যায়। একবার হযরত ওসমান (রা) এমন একটি সিন্দুকের দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন যার গায়ে ছবি খুদাই করা ছিলো। তিনি সেই ছবিকে ঘষে ওঠিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩২]

[৩.৩] মনযোগ বিনষ্টকারী বস্তুর উপস্থিতি ঃ নামাযীর মনযোগ বিনষ্ট হয় এমন বস্তুর উপস্থিতিতে নামায পড়া মাকরূহ। কারণ এতে নামাযে একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটে। যেমন কেউ—নামাযীর সামনে কথাবার্তা বলছে কিংবা এমন কোনো বোর্ড বা কিছু তার সামনে আছে—যা বারবার তার দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে এবং নামাযে মনযোগ নষ্ট করছে। হযরত আতা খোরাসানী বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা)-এর সময় মসজিদে নববীর সংস্কার করা হয়। তখন মসজিদের সিলিংয়ে ঝাড়বাতি লাগানো হয়, যা কমলার মত ঝুলেছিলো। যখন কেউ নামাযের জন্য সেখানে প্রবেশ করতেন, আশ্চর্য হয়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। হযরত ওসমান (রা) এ সংবাদ পেয়ে সেগুলো সেখান থেকে নামিয়ে ফেলেন।[৩৩]

www.amarboi.org

৪. নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া

[৪.১] নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ গেলে তাতে নামাযে কোনো প্রভাব পড়ে না। নামায নষ্টও হয় না। কিন্তু নামাযীর উচিত, কেউ যেন নামাযের সামনে দিয়ে যেতে না পারে সেজন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা। নামাযীর সামনে দিয়ে যেন লোকজন চলাচল না করে সেজন্য সুন্নাত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো নামাযীর সামনে সুতরা পুতে রাখা, যাতে প্রতিবন্ধকতার ধারণা সৃষ্টি হয়। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—কোনো কিছুই নামাযকে নষ্ট করতে পারে না। তবু সামনে দিয়ে যাতায়াতের যথাসম্ভব বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।[৩৪]

সেই সাথে তিনি এও বলেছেন—কেবল ওযু নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা কথাবার্তা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়।[৩৫]

[৪.২] নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারীকে কর্কশ ভাষায় কিংবা মারধর করে বাধা দেয়ার পরিবর্তে তাকে নরম ভাষায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। ইমাম মালিক (রহ) বর্ণনা করেছেন—এমন এক ব্যক্তিকে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট হাজির করা হলো যিনি অন্য এক ব্যক্তির নাক ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন—সে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন আমি নামায পড়ছিলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদীস বলেছেন তা আমার নিকট পৌঁছেছে। এজন্যই আমি এরূপ করেছি। সব শুনে হযরত ওসমান (রা) বললেন, ভাতিজা ! তুমি ভালো কোনো কাজ করোনি। তোমার নামাযটাও গেছে আর তুমি এর নাকটাও ভেঙ্গে দিয়েছো।[৩৬]

এরূপ আরেকটি ঘটনা হচ্ছে হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আওফ নামায পড়ছিলেন। এক ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। তিনি ফেরানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু তাকে ফেরানো যাচ্ছিলো না। তখন হযরত ওসমান (রা)-এর সামনে তাকে হাজির করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—সে বিরত রাখতে চেয়েছে, বিরত থাকলে তোমার কী ক্ষতি হতো ? আবার হুমাইদ ইবনু আবদুর রহমানের দিকে লক্ষ্য করে বললেন—এ ব্যক্তি যদি তোমার নামাযের সামনে দিয়ে চলেই যেত তাহলে তোমারই বা এমন কী ক্ষতি হতো ? কারণ ওযু নষ্ট না হলে কিংবা কোনো কথাবার্তা না বললে আর কিছুতেই নামায নষ্ট হয় না।[৩৭]

[৪.৩] নামাযীর সামনে দিয়ে গমনকারী মানুষ হোক কিংবা অন্য কোনো প্রাণী, সবাইকে ফেরানোর চেষ্টা করা উচিত। মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাকে সনদসহ হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একবার নামাযের সময় সামনে দিয়ে ভেড়া যেতে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।[৩৮]

৫. যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়

যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়ে যা, তা নিম্নরূপ—

[৫.১] নামাযের শর্তাবলীর কোনো একটি পুরো না হলে ঃ নামাযের শর্তাবলীর মধ্যে কোনো একটি পুরো না হলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। যেমন কেউ পবিত্রতা অর্জন ছাড়াই নামায পড়লো, তার নামায হবে না। একথার ওপর সকলেই একমত। যেমন হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—কথাবার্তা না বললে কিংবা ওযু নষ্ট না হলে আর কিছুতেই নামায নষ্ট হয় না।[৩৯]

www.amarboi.org

[৫.২] নামাযে কথাবার্তা বলা ঃ নামাযের মধ্যে কথাবার্তা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়। ইতোপূর্বে আমরা কয়েকবার হযরত ওসমান (রা)-এর এ অভিমতটি বর্ণনা করেছি যে, 'ওযু নষ্ট হওয়া কিংবা কথাবার্তা বলা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই নামায নষ্ট হয় না।' আমরা কথাবার্তার ওপর কিয়াস করে বলতে পারি পানাহার বা এ ধরনের কাজেও নামায নষ্ট হয়ে যায়। কারণ এগুলো মানবিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে নামাযের মধ্যে মানবিক কোনো কাজকর্ম করা জায়েয নেই।

[৫.৩] ইমামের নামাযে ত্রুটি প্রকাশ পেলে সে জন্য মুকতাদীদের নামায নষ্ট হয় না[৪০] **ঃ** আমরা এর আগেও বলেছি একবার হযরত ওসমান (রা) ফজরের নামাযে ইমামত করেছিলেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি কাপড়ে নাপাকীর চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলেন তার ওপর গোসল ফরয। তখন তিনি বলে ওঠলেন, 'আল্লাহর কসম ! আমার মস্তবড়ো গুনাহ হয়ে গেছে।' অতপর তিনি পবিত্রতা অর্জন করে পুনরায় নামায পড়লেন কিন্তু লোকদেরকে পুনরায় নামায পড়তে বললেন না।[৪১]

[৫.৪] মাথার পেছনে চুলের ঝুটি বেঁধে নামায পড়া মাকরূহ ঃ বিস্তারিত দেখুন–'শারুন' শিরোনাম।

৬. নামাযের সময়

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় সম্পর্কে সকলেই অবগত। এজন্য নামাযের ওয়াক্ত নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো আমরা পেয়েছি ঃ

[৬.১] চারদিক ফর্সা হওয়ার পূর্বে ফজর নামায পড়া ঃ হযরত ওসমান (রা) চারদিক অন্ধকার থাকতেই ফজর নামায পড়তেন।[৪২] ইমাম ইবনু আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন—এক বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর পেছনে ফজরের নামায আদায় করে বের হতাম, তখন (অন্ধকার থাকার দরুন) কেউ কাউকে চিনতাম না।[৪৩]

কিন্তু যেদিন হযরত ওমর (রা) শাহাদাত বরণ করেছিলেন সেদিন লোকদের ব্যস্ততার কারণে হযরত ওসমান (রা) ফজর নামায বিলম্বে পড়েছিলেন।[৪৪]

[৬.২] জুম'আর নামাযের সময় ঃ হযরত ওসমান (রা) আওয়াল ওয়াক্তে জুম'আর নামায আদায় করতেন। অনেক বর্ণনায় এমনও এসেছে তিনি দুপুরের আগেই জুম'আর নামায পড়ে ফেলতেন। ইবনু আবী সুলাইত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে জুম'আর নামায পড়ে বের হতাম, তখন দেয়ালের ছায়া দেখা যেত না।[৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু সাইয়িদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রা)-এর সাথে জুম'আর নামায আদায় করতাম। তিনি নামায এবং খুত্‌বা দুপুরের আগেই শেষ করে দিতেন। অতপর আমি হযরত ওমর (রা)-এর সাথে জুম'আর নামায পড়েছি, তিনি নামায ও খুত্‌বা দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত রাখতেন। তাদের পর আমি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথেও জুম'আর নামায পড়তাম। তাঁর নামায ও খুত্‌বা শেষ হতে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তো। কিন্তু একে কেউ দূষনীয় মনে করতেন না এবং কেউ সমালোচনাও করেননি।[৪৬]

www.amarboi.org

হযরত আব্বান ইবনু ওসমান (রা) বলেন—আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে জুম'আর নামায আদায় করে এসে কাইলুলা (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।[৪৭]

[৬.৩] মাগরিব নামায ঃ সূর্য ডুবার পর মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। হযরত ওসমান (রা) আওয়াল ওয়াক্তে মাগরিব নামায পড়া পছন্দ করতেন। এমনকি তিনি রোযার মাসে ইফতারের আগেই মাগরিবের নামায আদায় করে নিতেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-তিনি রমযানুল মুবারকে ইফতারের আগেই মাগরিব নামায পড়ে ফেলতেন।[৪৮]

অবশ্য ইমাম ইবনু আবী শাইবা হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে এককভাবে বর্ণনা করেছেন—তিনি ইফতারের পর মাগরিবের নামায আদায় করতেন। তাঁর বর্ণনায় ভাষা হচ্ছে—তিনি মাগরিব নামায তখন আদায় করতেন যখন রাতের আলামত প্রকাশ হয়ে পড়তো, তার আগে তিনি ইফতার করে নিতেন।[৪৯]

সম্ভবত ইমাম ইবনু আবী শাইবা এ বর্ণনা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন তিনি পানি অথবা খেজুর দিয়ে প্রথমে ইফতার করে নিতেন তারপর মাগরিব নামায পড়তেন। পরে খানা খেতেন। এভাবেই উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

[৬.৪] ফজর নামাযের পর অন্য কোনো নামায পড়া ঃ ফজর নামাযের পর সূর্য এক বল্লম পরিমাণ ওপরে না ওঠা পর্যন্ত (অর্থাৎ তাপ বিকিরণ করার পূর্ব পর্যন্ত) অন্য কোনো নামায পড়া মাকরূহ। এ পুরো সময়টা সূর্যোদয়ের পূর্ব সময় বলে গণ্য হয়। এ সময় সূর্য পূজারীরা সূর্য পূজায় লিপ্ত হয়। (এজন্য এ সময় নামায পড়া মাকরূহ।) এ অভিমতের সাথে খুলাফা-ই-রাশিদীনের তিনজন খলীফাই অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) একমত।[৫০]

এর ভিত্তি হচ্ছে—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্ব স্ব গ্রন্থে আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে—ফজর নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনো নামায পড়া জায়েয নয়। তদ্রূপ আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্তও কোনো নামায পড়া জায়েয নয়।[৫১]

৭. নামাযে করণীয়

[৭.১] তাকবীরে তাহ্‌রীমা ঃ 'আল্লাহু আকবার' বাক্য দিয়ে নামায শুরু হয়। এ বাক্যটিকে ইসলামী পরিভাষায় 'তাকবীরে তাহরীমা' বলে। তাকবীরে তাহরীমা পরিভাষাটি এজন্য ব্যবহার করা হয়, একজন নামাযী মুখে এ বাক্যটি উচ্চারণের সাথে সাথে সেই সমস্ত কাজ তার জন্য হারাম হয়ে যায়, যা নামাযের আগে হালাল ছিলো। যেমন—খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা বলা প্রভৃতি। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় নামাযী তার দু হাত দু কাধের ববাবর নিয়ে যাবেন। অর্থাৎ দু হাতের আঙ্গুল কানের লতির পেছনে নিয়ে যাবেন। এজন্য হযরত ওসমান (রা) তাকবীরে তাহরীমার সময় দু হাত কানের পেছন পর্যন্ত ওঠাতেন।[৫২]

একথার ওপর সকলেই একমত যে, তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলতে হবে।

[৭.২] সানা পড়া ঃ তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর নামাযী সানা পড়বেন। যাকে নামায শুরুর দু'আ বলা হয়। হযরত ওসমান (রা) সানা হিসেবে নিচের বাক্যগুলো পড়তেন–

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

www.amarboi.org

"হে আল্লাহ আপনি পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার। বরকতময় আপনার নাম। আপনার মর্যাদা অনেক উচ্চে। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

[৭.৩] আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া ঃ সানা পড়া শেষ হলে নামাযী চুপি চুপি আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বেন।-(বিস্তারিত দেখুন 'ইসতি'আযাহ' ও 'বাসমালাহ' শিরোনাম)

[৭.৪] কিরায়াত পড়া ঃ তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য যে কোনো একটি সূরা পড়বেন। এ ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা)-এর আমল ছিলো নিম্নরূপ—

[ক] তিনি নামাযে সূরা পড়ার সময় সূরার তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখতেন। যেমন প্রথম রাকায়াতে যে সূরা পড়তেন পরের রাকায়াতে তার পরের সিরিয়ালের সূরা পড়তেন।[৫৩]

[খ] কোনো রাকায়াতে এক বা একাধিক সূরা পড়াও জায়েয। ইমাম যুহুরী বলেন—হযরত ওসমান (রা) এক রাকায়াতে একাধিক সূরা পড়েছেন। তদ্রূপ সায়িব ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, হযরত ওসমান (রা) একবার এক রাকায়াতে আল কুরআনের বড়ো বড়ো সাতটি সূরা পড়েছিলেন।[৫৪]

[গ] হযরত ওসমান (রা) বেশীর ভাগ সময় ফজর নামাযে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করতেন।[৫৫] ফারাফসা ইবনু উমাইর আল হানফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট শুনে শুনে সূরা ইউসুফ মুখস্থ করে ফেলেছি। কারণ তিনি অধিকাংশ সময় ফজর নামাযে সূরা ইউসুফ পড়তেন।[৫৬]

হযরত ওসমান (রা) যোহরের প্রথম দু রাকায়াতেও কিরায়াত দীর্ঘ করতেন। প্রথম দু রাকায়াতে তিনি সূরা আল বাকারা পড়তেন।[৫৭]

একবার তিনি ইশার নামাযে প্রথম রাকায়াতে সূরা আন নাজম পড়ে সিজদা করে তারপর দাঁড়িয়ে সূরা আত্ তীন পড়েছিলেন।[৫৮]

[ঘ] নামাযে সিজদার আয়াত পড়ার নিয়ম।

(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'সুজূদ' শিরোনাম)

[৭.৫] নামাযে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যাওয়ার জন্য তাকবীর (তাকবীরে ইনতিকাল) ঃ অতপর নামাযী ব্যক্তি রুকূতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলবেন। এক অবস্থা পরিবর্তন করে অন্য অবস্থায় যাওয়ার জন্যও তাকবীর বলবেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফা-ই-সালাসা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) নামাযে ওঠার সময়, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং সিজদার সময় তাকবীর বলতে কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। অন্য বর্ণনায় আছে-এসব জায়গায় ভালোভাবে তাকবীর বলতেন।[৫৯]

[৭.৬] ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়া [ক] হযরত ওসমান (রা) ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়েছেন কিনা সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। এক বর্ণনায় আছে—তিনি ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়তেন না। যেমন—সুলাইমান তাইমী (রহ) থেকে বর্ণিত, এক মহান ব্যক্তি

www.amarboi.org

হযরত ওসমান (রা)-এর পেছনে নামায পড়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত ওসমান (রা) দু'আ কুনূত পড়তেন না।[৬০]

ইমাম আবু মালিক আশজাঈ (রহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফা-ই-রাশিদীন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর পেছনে এমনকি কুফায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত নামায আদায় করেছেন, এরা সকলেই কি ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়তেন ? তিনি বললেন—না বেটা ! এ জিনিস তো পরে শুরু হয়েছে।[৬১]

মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে—হযরত ওসমান (রা) মৃত্যু অবধি কখনো ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়েননি।[৬২]

অন্য এক বর্ণনা মতে (সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে) হযরত ওসমান (রা) ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়তেন।[৬৩]

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় তিনি ফজর নামাযে সাধারণত দু'আ কুনূত পড়তেন না। তবে দু'আ কুনূত পড়ার কোনো নির্দিষ্ট কারণ থাকলে তিনি পড়তেন।

[খ] প্রথম দিকে হযরত ওসমান (রা) ফজর নামাযের দ্বিতীয় রাকায়াতে রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে দু'আ কুনূত পড়তেন।[৬৪] কিন্তু কিছুদিন পর তিনি পদ্ধতি পরিবর্তন করে রুকূ'তে যাওয়ার আগে দু'আ কুনূত পড়া শুরু করে দেন।[৬৫] এ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিলো, বিলম্বে যারা আসবেন তারাও যেন সেই রাকায়াতে শরীক হতে পারেন।

হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর (রা) রুকূ'র পর দু'আ কুনূত পড়তেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা) খলীফা হওয়ার পরে রুকূ'তে যাওয়ার আগেই দু'আ কুনূত পড়া শুরু করে দেন। যেন বিলম্বে আসা লোকজন সেই রাকায়াতে শামিল হতে পারেন।[৬৬]

[গ] নামাযী ব্যক্তির উচিত মাসুরা টাইপের কোনো দু'আকে কুনূত হিসেবে পড়া। হযরত হুসাইন (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-একদিন আমি ফজর নামাযে দু'আ কুনূত পড়ি। সেদিন ওসমান ইবনু যিয়াদ আমার পেছনে নামায পড়েন। নামায শেষ করার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুনূতে আপনি কোন্ দু'আ পড়েন ? বললাম—নিচের দু'আটি পড়ি—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرِ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتِكَ وَنَخْشٰى عَذَابِكَ اِنَّ عَذَابِكَ الجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

"হে আল্লাহ আমি আপনার সাহায্য চাই এবং আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থী। আমি আপনার গুণগান করছি আপনার অকৃতজ্ঞ হবো না, যারা আপনার নাফরমানী করে তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। হে আল্লাহ ! আমি আপনারই ইবাদাত করি, আপনার জন্যই নামায পড়ি এবং সিজদা দেই। আপনার কাছেই আমি প্রত্যাবর্তনের আশা রাখি। আমি

www.amarboi.org

আপনার রহমতের প্রত্যাশী। আপনার শাস্তিকে ভয় করি। নিসন্দেহে আপনার কঠিন শাস্তি কাফিরদের ঘিরেই আবর্তিত হবে।"

ওসমান ইবনু যিয়াদ বললেন—হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) কুনূতে এ দু'আ-ই পড়তেন।[৬৭]

[৭.৭] সালাম ফেরানো ঃ অতপর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন। ডান দিকে একবার সালাম ফেরানোই যথেষ্ট। মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে—হযরত ওসমান (রা) শুধু ডান দিকে একবার সালাম ফেরাতেন।[৬৮]

৮. বিতর নামায

[৮.১] রাতের প্রথম দিকে বিতর নামায আদায় করাকে হযরত ওসমান (রা) মুস্তাহাব মনে করতেন।[৬৯]

রাতের প্রথম দিকে বিতর আদায়ের পর তাহাজ্জুদের জন্য ওঠলে তিনি তাহাজ্জুদের পর অতিরিক্ত এক রাকায়াত আদায় করে প্রথম রাতের বিতরকে জোড় করে নিতেন। যেন তা নফল হয়ে যায়। অতপর তিনি বিতর নামায আদায় করতেন।[৭০]

হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—আমি বিতর নামায রাতের প্রথম দিকেই আদায় করে নেই। রাতের শেষ ভাগে দ্বিতীয়বার ওঠলে অতিরিক্ত এক রাকায়াত পড়ি, আগের বিতরের সাথে মিলে যেন তা জোড় হয়ে যায়। এটি আমার নিকট এমন—যেমন পরিণত বয়সের উটনী উটের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়।[৭১]

[৮.২] বিতর নামায এক রাকায়াত সম্বলিত। হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে —তিনি সবসময় এক রাকায়াত বিতর পড়েছেন। সম্ভবত তিনি প্রথমে বিতরের দু রাকায়াত পড়তেন তারপর আলাদাভাবে এক রাকায়াত পড়তেন।[৭২]

[৮.৩] বিতর নামাযে দু'আ কুনূত পড়তে হবে। শেষ রাকায়াতে রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তা পড়া হয়।[৭৩]

হযরত ওসমান (রা) বিতর নামাযে দু'আ কুনূত রুকূ'র পর এবং ফজর নামাযে দু'আ কুনূত রুকূ'র আগে পড়ার মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। তার নিকট ফজর নামাযে রুকূ'র আগে দু'আ কুনূত পড়ার যুক্তি ছিলো, যারা পরে আসবেন তারাও যেন—সেই রাকায়াতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। যাতে জামায়াতের সওয়াব পেয়ে যান।

৯. নামাযীকে লোকমা (ভুল সংশোধন করে) দেয়া

নামাযী যদি কিরায়াতে ভুল করেন কিংবা সন্দেহে পড়ে যান আর নামাযের বাইরের কোনো ব্যক্তি সেই ভুল সংশোধন কিংবা সন্দেহ দূর করে দেন, সেই আলোকে নামাযী ব্যক্তি তার নামায সংশোধন করে নেন, তা জায়েয আছে।[৭৪]

হযরত ওবাইদা ইবনু রবী'আহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি একবার মাসজিদুল হারামে গেলাম। দেখলাম, চারদিক সুগন্ধিতে ভরপুর। এক ব্যক্তি উত্তম কাপড় চোপড় পরে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে নামাযরত। তিনি কিরায়াত পড়ার সময় আটকে যাচ্ছিলেন। তাঁর

www.amarboi.org

পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি তাকে লোকমা দিচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—তিনি কে? লোকেরা বললো–তিনি হযরত ওসমান (রা)।[৭৫]

১০. মুসাফির এবং শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় নামায

বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'সাফার' এবং 'জিহাদ' শিরোনাম।

১১. জামায়াতে নামায

[১১.১] অপরাগতায় জামায়াত পরিত্যাগের অবকাশ ঃ জামায়াতে নামায পড়া সুন্নাত। বরং সুন্নাতের চেয়েও কিছুটা বেশী। অবশ্য অপরাগতায় যেমন—সফর, মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে জামায়াত পরিত্যাগের অবকাশ আছে। বর্ণিত আছে, একদিন জুম'আর নামাযের সময় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিলো। হযরত ওসমান (রা) মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিলেন—যখন তুমি আযানে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলবে তখন একথাও বলে দেবে যে, যার যার ঘরে যেন নামায পড়ে নেয়। পরে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন—আপনি এরূপ করেছেন কিসের ভিত্তিতে? তিনি জবাব দিলেন—স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন তিনি এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৭৬]

অপারগ অবস্থায় জুম'আর নামায থেকেই যেহেতু হযরত ওসমান (রা)-এর দৃষ্টিতে অব্যাহতি আছে তাহলে এরূপ অপারগতায় জামায়াতে নামায থেকে অব্যাহতি পাওয়া তো আরও স্বাভাবিক ব্যাপার।

[১১.২] জামায়াতে হাজির হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ঃ মুসুল্লীরা যাতে জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন সে জন্য তাদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা ইমামের জন্য মুস্তাহাব। যদি মুসল্লির সংখ্যা কম হয় তাহলে একটু বিলম্ব করে জামায়াত পড়া উচিত। একদিন হযরত ওসমান (রা) ইশার নামাযের জন্য মসজিদে এসে দেখেন মুসল্লি অনেক কম। তিনি মসজিদের এক পাশে শুয়ে পড়লেন এবং মুসল্লীদের অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন মুসল্লীদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন তিনি নামায পড়ালেন। ঐ সময় ইবনু আবী আমর (রা) আনসারী তাঁর নিকট এসে বসলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন আল কুরআনের কতটুকু তার মুখস্থ আছে। তিনি সে সম্পর্কে জানালেন। তখন হযরত ওসমান (রা) বললেন —যে ব্যক্তি জামায়াতে ইশার নামায আদায় করে, সে যেন অর্ধেক রাত জেগে ইবাদাত বন্দেগী করলো।[৭৭]

[১১.৩] আবার মুসল্লীরা যখন নামাযের জন্য মসজিদে এসে হাজির হন তখন ইমামের বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি নামায পড়ানো মুস্তাহাব। একবার হযরত ওসমান (রা) শরীর থেকে ঘাম ময়লা দূর করার জন্য গোসল করছিলেন। তাকে নামাযের জন্য ডাকা হলো। তিনি গোসল অসমাপ্ত রেখেই দ্রুত নামাযের জন্য চলে এলেন। ইমাম ইবনু আবী শাইবা তার নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন—তিনি এমন অবস্থায় নামাযে শামিল হওয়ার জন্য এলেন, শবেমাত্র মাথার এক অংশ পরিষ্কার করেছেন। তিনি একথাও বললেন—নামাযের জন্য আহ্বানকারী আমাকে খুব দ্রুত আহ্বান করেছেন। তাই আমি তাকে বিরত রাখাটা সমুচীন মনে করিনি।[৭৮]

[১১.৪] বিদ্রোহী দলপতির ইমামত ঃ বিদ্রোহীদের দলপতির ইমামত, হযরত ওসমান (রা)-এর মতে জায়েয। তিনি মনে করতেন—নামায উত্তম একটি কাজ। (কাজেই এ উত্তম কাজটি যার নেতৃত্বেই হোক, তাকে বাধা দেয়া ঠিক নয়।) সহীহ আল বুখারী সহ অন্যান্য

www.amarboi.org

হাদীসগ্রন্থে ওবাইদুল্লাহ ইবনু আদী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে—হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষ দিকে যখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন তখন তার কাছে গিয়ে বলা হলো আপনি তো বর্তমান অবস্থায় বাড়িতেই অবস্থান করছেন এদিকে বিদ্রোহীদের নেতা ইমামত করছে। নামায সম্পর্কে আমাদেরতো যন্ত্রণার শেষ নেই। তখন তিনি বললেন*—'নামায মানুষের ভালো কাজসমূহের অন্যতম, কাজেই ভালো কাজে তার সাথে সঙ্গ দাও আর মন্দ কাজ করলে তার থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো।'[৭৯]

[১১.৫] আমীরের ইমামত ঃ আমীর তার মর্যাদা ও অবস্থান বিচারে ইমামতের সবচেয়ে বেশী হকদার। হযরত ওসমান (রা)-এর এক হাবশী (কালো কুৎসিত) গোলাম রাবযা প্রদেশের শাসনকর্তা মনোনীত হয়েছিলেন। হযরত আবু যর গিফারী (রা) সহ অন্যান্য সাহাবা কিরাম তাঁর ইমামতে জুম'আর নামায সহ অন্যান্য নামায আদায় করতেন।[৮০]

[১১.৬] গোলামের ইমামত ঃ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে গোলামের ইমামত জায়েয। এতে কোনো প্রকার অসুবিধা নেই। আমরা এই মাত্র বর্ণনা করেছি যে, হযরত ওসমান (রা)-এর এক গোলাম রাবযায় জুম'আসহ অন্যান্য নামাযের ইমামত করতেন। সহীহ্ আল বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করেন, তার কিছুদিন আগে মুহাজিরগণ মক্কা থেকে হিজরত করে কুবার নিকটবর্তী আসাবা নামক পল্লীতে অবস্থান করছিলেন। তখন সালিম মাওলা আবু হুজাইফা (রা) তাদের ইমামত করতেন। তিনিই তাদের মধ্যে বেশী কুরআন জানতেন।[৮১]

বুখারী শরীফেরই অন্য রিওয়ায়াতে আছে—যাকওয়ান নামে হযরত আয়িশা (রা)-এর এক গোলাম ছিলেন। তিনি নামাযে হযরত আয়িশা (রা)-এর ইমামত করতেন এবং কুরআন মজীদ পড়ে শুনাতেন।[৮২]

[১১.৭] কাতার সোজা করা ঃ হযরত ওসমান (রা) নামাযের কাতার সোজা রাখার ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন। শুধু কাতার সোজা রাখার জন্য কিছু লোককে তিনি নিয়োগ করে রেখেছিলেন। যতক্ষণ তারা কাতার সোজা হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে অবহিত না করতেন ততক্ষণ তিনি নামায শুরুই করতেন না। হাদীসের ইমামগণ হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন—তিনি একবার খুতবায় বলেছিলেন, 'যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন কাধে কাধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে নেবে। নিসন্দেহে কাতার সোজা রেখে নামায পড়া, পূর্ণাঙ্গ নামাযের একটি অংশ।' এজন্যই তিনি তাঁর নিয়োগকৃত লোকদের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করতেন না।[৮৩]

আবু সাহল ইবনু মালিক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট হাজির ছিলাম এবং আমি আমার অংশের জন্য পীড়াপীড়ি করছিলাম। এমতাবস্থায় নামাযের ইকামাত বলা হলো। তবু আমি আমার অংশের জন্য জিদ বহাল রাখলাম। তখন তিনি জুতা ঠিক করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর নিয়োজিত লোকেরা ঘোষণা দিলেন, নামাযের কাতার সোজা হয়ে গেছে। তিনি আমাকে বললেন, আমিও যেন কাতারে দাঁড়িয়ে যাই। তারপর তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করলেন।[৮৪]

* এ বক্তব্য থেকেই হযরত ওসমান (রা)-এর জ্ঞান, প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য বিদ্রোহীদের সম্পর্কে অধিকাংশ মনীষীর রায় বড়ো কঠোর।—লেখক

www.amarboi.org

[১১.৮] মুক্‌তাদীর কিরায়াত পড়া ঃ ইমাম আবদুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন—হযরত ওসমান (রা) মুকতাদীকে ইমামের পেছনে কিরায়াত পড়তে নিষেধ করতেন।[৮৫]

এটি একটি সাধারণ বর্ণনামূলক হাদীস। এ থেকে বুঝা যায় না, তিনি ইমামের পেছনে কিরায়াত না পড়ার প্রবক্তা ছিলেন, নাকি যখন ইমামের কিরায়াত মুকতাদীগণ শুনতে পেতেন তখন কিরায়াত পড়াকে নাজায়েয মনে করতেন। মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাকে ইমামের পেছনে কিরায়াত শিরোনামে হযরত ওসমান (রা) থেকে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে, 'শ্রবণকারী যে সাওয়াব পাবেন যিনি শুনতে পান না তিনিও যদি চুপ থাকেন তাহলে সেই সাওয়াবই পাবেন।'

ইমামের পেছনে কিরায়াত পড়া সংক্রান্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি। সেই সূত্র ধরে বলা যায়, যদি এ বক্তব্য শুধু জুম'আর খুত্‌বা চুপচাপ শোনার ব্যাপারে না হয়ে থাকে।-(খুত্‌বা শিরোনাম দ্রষ্টব্য) হতে পারে তিনি একথাটি চুপচাপ জুম'আর খুত্‌বা শোনা সম্পর্কে বলেছেন, কিংবা ইমামের পেছনে মনযোগ দিয়ে কিরায়াত শোনা প্রসঙ্গে বলেছেন।

[১১.৯] ইমামের নামাযে ত্রুটি হয়ে গেলে ঃ হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন ইমামের নামাযে ত্রুটি হয়ে গেলে তার প্রভাব মুকতাদীর নামাযে পড়ে না। ইমাম নামায পড়ানোর পর যদি বুঝতে পারেন তার শরীর পবিত্র ছিলো না কিংবা অন্য কোনো কারণে তার নামায নষ্ট হয়ে গেছে, তো নামাযে সংঘটিত বিপর্যয় শুধু তার নামায পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। তার প্রভাব মুকতাদীর নামাযে পড়বে না। এমতাবস্থায় ইমাম তার নামায পুনরায় পড়ে নেবেন, মুকতাদীর নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।[৮৬]

একবার হযরত ওসমান (রা) তার অজান্তে অপবিত্রতাবস্থায়ই নামায পড়িয়েছিলেন। চারদিকে ফর্সা হওয়ার পর তিনি তাঁর কাপড়ে স্বপ্নদোষের চিহ্ন দেখতে পেলেন। তিনি বললেন—আল্লাহর কসম ! সাংঘাতিক অপরাধ হয়ে গেছে। আমার শরীর যে অপবিত্র সে সম্পর্কে আমার খবরই ছিলো না। একথা বলে তিনি (পবিত্রতা অর্জন করে) নিজের নামায পুনরায় পড়ে নিলেন কিন্তু যারা তার সাথে নামায পড়েছিলেন তাদেরকে পুনরায় নামায পড়তে বললেন না।[৮৭]

[১১.১০] কারো নামায কাযা হয়ে গেলে, কাযা নামায আদায়ের জন্য আযানের প্রয়োজন নেই।-('আযান' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

১২. জুম'আর নামায

[১২.১] জুম'আর নামায ফরয।

নিচের আয়াতে কারীমা তার প্রমাণ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ (الجمعة : ٩)

www.amarboi.org

"হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো ! তোমাদেরকে যখন জুম'আর নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন বেচাকিনি বাদ দিয়ে আল্লাহর যিকিরের জন্য দৌড়াও। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ।"-(সূরা আল জুম'আ ঃ ৯)

সংগত কারণ, যে কারণে জামায়াতে নামায থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই একই কারণে জুম'আর নামায থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। যেমন—মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় জুম'আর নামাযের পরিবর্তে যোহর নামায আদায় করতে হবে। হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন বৃষ্টির সময় মুয়াযযিনকে বললেন—যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলবে তখন বলে দেবে তোমরা যার যার ঘরে নামায আদায় করো। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন—'আমার চেয়ে যিনি উত্তম ব্যক্তিত্ব (অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনিই এরূপ করেছেন।'[৮৮]

[১২.২] জুম'আর নামাযের সময় ঃ ('সালাত' শিরোনাম ৬.২ অনুচ্ছেদ দেখুন)

–জুম'আর নামাযের জন্য অতিরিক্ত 'আযান' সংক্রান্ত আলোচনা।
(বিস্তারিত দেখুন 'আযান' শিরোনাম)

[১২.৩] জুম'আর নামাযের খুতবা ঃ জুম'আর নামাযের আগে ইমাম মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা (বক্তৃতা) দেবেন।–(বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'খুত্‌বা' শিরোনাম)

[১২.৪] একই দিনে জুম'আ এবং ঈদ হলে ঃ একই দিনে ঈদ এবং জুম'আ হলে, যারা ঈদের নামায আদায় করবেন তারা চাইলে জুম'আর নামাযও আদায় করবেন। এটি উত্তম। আর যারা জুম'আ না পড়বেন তারা নিজেদের মহল্লার মসজিদে কিংবা বাড়িতে যোহর নামায পড়ে নেবেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে একবার ঈদুল ফিতর ও জুম'আ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেদিন আমিও ছিলাম। হযরত ওসমান (রা) ঈদের নামাযের পর উপস্থিতিকে লক্ষ্য করে বললেন—আজকে দুটো ঈদ একত্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যারা শহরের উপকণ্ঠে বা শহরতলীতে বসবাস করেন তারা ইচ্ছে করলে থেকে যেতে পারেন, একবারে জুম'আর নামায পড়ে যাবেন। আর যারা চলে যেতে চান যেতে পারেন, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে চলে যাবার অনুমতি দেয়া হলো।[৮৯]

১৩. ঈদের নামায

[১৩.১] ঈদের নামাযের জায়গা ঃ ঈদের নামাযের জায়গা মূলত শহর বা মহল্লার বাইরে কোনো ঈদগায়। যদি সংগত কারণে ঈদগাহে নামায পড়া সম্ভব না হয় তাহলে মসজিদে ঈদের নামায পড়া যাবে। হযরত ওসমান (রা) একবার প্রবল বর্ষণের কারণে ঈদের নামায মসজিদে আদায় করেছিলেন।[৯০]

[১৩.২] ঈদের নামাযে আযান ইকামাত ঃ ঈদের নামায ফরয নয় (ওয়াজিব), এজন্য ঈদের নামাযে আযান ইকামাত নেই। হযরত ওসমান (রা) সর্বদা আযান ইকামাত ছাড়া ঈদের নামায পড়তেন।[৯১]

www.amarboi.org

[১৩.৩] ঈদের নামাযের খুতবা ঃ ঈদের নামাযে খুত্‌বা পরে দেয়া হয়, আগে নামায পড়া হয়। হযরত ওসমান (রা)-ও আগে নামায পড়াতেন তারপর খুত্‌বা দিতেন।[৯২]

[১৩.৪] ঈদের নামাযের নিয়ম ঃ ঈদের নামায ও অন্যান্য নামাযে পার্থক্য হচ্ছে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা হয়। যেমন প্রথম রাকায়াতে তাকবীরে তাহরীমার পর অতিরিক্ত সাতটি তাকবীর বলা হয়। তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য একটি সূরা পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকায়াতে প্রথমে পাঁচবার তাকবীর বলে তারপর সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়া হয়।

হযরত ওসমান (রা) ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং ইসতিসকার নামাযে প্রথম রাকায়াতে অতিরিক্ত সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে পাঁচ তাকবীর বলতেন। তাছাড়া তিনি নামায আগে পড়িয়ে পরে খুত্‌বা দিতেন এবং এসব নামাযে উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়তেন।[৯৩]

১৪. ইসতিসকার নামায

ইসতিসকার নামায ঈদের নামাযের অনুরূপ। যে সম্পর্কে ওপরে (১৩.৪ অনুচ্ছেদে) আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. সূর্যগ্রহণের নামায

ইমাম নববী হযরত ওসমান (রা)-এর রেফারেন্সে বর্ণনা করেছেন—সূর্যগ্রহণের নামায দু' রাকায়াত। প্রতি রাকায়াতে দু'টো রুকূ' ও দু'টো কিয়াম ও দু'টো সিজদা।[৯৪]

১৬. সফর থেকে ফিরে নামায

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'সাফার' শিরোনাম।

১৭. তাহাজ্জুদ নামায

হযরত ওসমান (রা)-এর অভ্যেস ছিলো রাতের প্রথম দিকে একটু ঘুমিয়ে নিতেন তারপর ওঠে সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটাতেন।[৯৫]

হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন তাহাজ্জুদ নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো এবং কিরায়াত পড়া বেশী বেশী সিজদা দেয়ার চেয়ে উত্তম। তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রচলিত তা হচ্ছে তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে এক রাকায়াতে পুরো কুরআন শরীফ খতম করতেন।[৯৬]

যারা হযরত ওসমান (রা)-কে শহীদ করার জন্য তাঁর ঘরে হামলা করেছিলেন সেইসব বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে তাঁর স্ত্রী মুহতারিমা নায়িলা বিনতু ফারাফ্‌সা কালবিয়া বলেছিলেন—আপনারা তাকে ইচ্ছে করলে শহীদ করতে পারেন আবার চাইলে ছেড়েও দিতে পারেন। তবে একটি কথা এ লোকটির ব্যাপারে সত্য, তিনি অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ নামাযে এক রাকায়াতে পুরো কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন।[৯৭]

হযরত আবদুর রহমান ইবনু ওসমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—এক রাতে আমি মাসজিদুল হারামে মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়ানো ছিলাম। ইচ্ছে ছিলো আজকের রাতে আর কাউকে এ জায়গা দখলে প্রাধান্য দেবো না। এমন সময় মনে হলো কে যেন আমার পিঠে টোকা দিচ্ছে। আমি সেদিকে মুখ ফেরালাম না। দ্বিতীয়বার আবার সেই টোকা। মুখ

www.amarboi.org

ফেরালাম। দেখলাম হযরত ওসমান (রা) আমার পেছনে দাঁড়ানো। আমি সরে দাঁড়ালাম। তিনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং এক রাকায়াতে পুরো কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করলেন।৮৫-(আরো বিস্তারিত দেখুন 'ইহ্‌ইয়াউল লাইল' শিরোনাম)

১৮. মাগরিবের পূর্বে দু' রাকায়াত নামায

হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মাগরিব নামাযের আগে দু' রাকায়াত (নফল) নামায পড়তেন না।[৯৯]

১৯. জানাযা নামায

[১৯.১] জানাযা নামাযের জন্য পবিত্রতা ঃ জানাযা নামায ও অন্যান্য নামাযের মত একটি নামায। এজন্য অন্য নামাযে যেসব শর্ত আছে, জানাযা নামাযের জন্যও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। যেমন—পবিত্রতা অর্জন করা, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি। হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—যে জানাযা নামায পড়তে চায় তার ওযু করে নেয়া উচিত। কারণ জানাযা নামাযও অন্যান্য নামাযের মত একটি নামায।[১০০]

[১৯.২] জানাযা (কফিন)-এর শ্রেণী বিন্যাস ঃ যদি কখনো পুরুষ ও মহিলাদের জানাযা নামায এক সাথে পড়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে পুরুষদের কফিন ইমামের কাছাকাছি রাখতে হবে এবং মহিলাদের কফিন পুরুষদের কফিনের মাথা বরাবর ইমাম থেকে একটু দূরে রাখতে হবে। মূসা (রা) ইবনু তালহা বর্ণনা করেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-কে পুরুষ ও মহিলাদের জানাযা একত্রে পড়াতে দেখেছি। তিনি পুরুষের কফিন তাঁর কাছাকাছি রাখতেন এবং মহিলার কফিন পুরুষের পর কিবলার দিকে রাখতেন তারপর চার তাকবীরের সাথে জানাযা নামায আদায় করতেন।[১০১]

[১৯.৩] জানাযা নামাযের বর্ণনা ঃ আযান ও ইকামাত ছাড়া-ই জানাযা নামায পড়া হয়।-(বিস্তারিত দেখুন 'ইকামাত' শিরোনাম)

আমরা ফিকহী বিশ্বকোষ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (সালাত শিরোনাম দ্রষ্টব্য) এ বর্ণনা করেছি। হযরত ওমর (রা)-এর সময় চার তাকবীরে জানাযা নামায পড়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি তাকবীর এক রাকায়াতের স্থলাভিষিক্ত। পুরুষ ও মহিলা সকলের জানাযার ব্যাপারে একই নির্দেশ। হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত ওসমান (রা) সেই মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ সম্পর্কে সকল সাহাবা কিরাম একমত ছিলেন। কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি।[১০২]

[১৯.৪] মসজিদে জানাযা নামায পড়া ঃ মসজিদে নববীর ভেতর হযরত ওসমান (রা) সহ অন্যান্য সকল সাহাবা কিরামের উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা)-এর জানাযা নামায পড়ানো হয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করেননি।[১০৩]

সালাম (سلام)—সম্ভাষণ

১. সংজ্ঞা

'আসসালামু আলাইকুম' বলাকে সালাম বলে।

২. খতীব মিম্বারে বসার সময় সালাম দেয়া

www.amarboi.org

হযরত ওসমান (রা) খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বারের ওপর বসার সময় শ্রোতাদেরকে লক্ষ্য করে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতেন।[১০৪]–(আরো দেখুন 'খুতবা' শিরোনাম)

৩. নামাযে সালাম ফিরানো

হযরত ওসমান (রা) যখন নামায শেষ করতেন তখন ডানদিকে মুখ করে শুধু একবার সালাম বলতেন।[১০৫]–(বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম ৭.৭ অনুচ্ছেদ)

৪. সালামের জবাব দেয়া

সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব, এ সম্পর্কে সকল উলামা কিরাম একমত। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী ঃ

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ط -(النساء : ٨٦)

"যখন তোমাকে কেউ সালাম দেয়, তুমি তার চেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে সেই সালামের জবাব দাও, না হয় তার মত করে হলেও দাও।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৮৬)

কিন্তু যিনি ইবাদাতে ব্যস্ত, সালামের জবাব দেয়ার ব্যাপারে বিলম্ব করার অবকাশ তার আছে। হযরত ওসমান (রা) ওযু করার সময় কেউ তাকে সালাম দিলে তিনি ওযু শেষ করে তার জবাব দিতেন এবং বলতেন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।[১০৬]–(আরো দেখুন 'ওযু' শিরোনাম)

সায়িল (صائل)–আক্রমণকারী

আক্রমণকারীকে হত্যা করা জায়েয। এ কারণে হত্যাকারী থেকে কোনো বদলা গ্রহণ করা হবে না।–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

সিওয়াক (سواك)–মিসওয়াক

বিস্তারিত দেখুন 'ইসতিয়াক' শিরোনাম।

সিদাক/সাদাক (صداق)–মোহর/মোহরানা/দেনমোহর

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'নিকাহ' শিরোনাম।

সিয়াম (صيام)–রোযা

১. সংজ্ঞা

নির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ত করে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে সিয়াম বলা হয়।

২. সন্দেহের দিনের রোযা

শাবানের ২৯ তারিখের পরবর্তী দিন অর্থাৎ ৩০শে শাবানকে সন্দেহের দিন বলা হয়। যদি শাবানের ২৯ তারিখে দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া অথবা আকাশে মেঘের কারণে রমযানের চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে তার পরের দিনকে সন্দেহের দিন বলা হয়।[১০৭] [ধরে নেয়া হয় সেদিন শাবানের ৩০ তারিখ।]

www.amarboi.org

সন্দেহের দিন রমযানের রোযা রাখা জায়েয নেই।[১০৮] কেননা চাঁদ দেখার প্রেক্ষিতে কিংবা শাবানের ৩০ তারিখ পূর্ণ হলে রমযান মাস শুরু হয়।

৩. চাঁদ দেখা

হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট রমযান কিংবা শাওয়ালের চাঁদ দেখার জন্য কমপক্ষে দুজনের সাক্ষ্যের প্রয়োজন।[১০৯]

তাঁর মতে শাওয়ালের চাঁদ রাতের মধ্যেই দেখার প্রমাণ পেতে হবে, যেন পরদিন লোকজন রোযা থেকে বিরত থাকতে পারে।[১১০]

যদি দিনে শাওয়ালের চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে হযরত ওসমান (রা)-এর মতে, উত্তম হচ্ছে সেদিনের রোযা পুরা করা। মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবার বর্ণনা—হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে একবার দিনের বেলা শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়া গেলো। খবর শোনে কিছু লোক ইফতার করে ফেললেন। হযরত ওসমান (রা) একথা জানতে পেরে মসজিদে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন—'আমি রাত পর্যন্ত আমার রোযাকে পূর্ণ করবো।'[১১১]

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি রাতের আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর মাগরিব নামায আদায় করতেন। তার পূর্বে তিনি ইফতার করে নিতেন।[১১২]

৪. রোযাদারকে তার স্ত্রী চুমো দিলে

রোযা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর চুমো নেয়াকে হযরত ওসমান (রা) মাকরূহ মনে করতেন।[১১৩]

৫. তাড়াতাড়ি ইফতার করা

হযরত ওসমান (রা) রমযানে মাগরিব নামায আদায়ের পর ইফতার করতেন। মাগরিব নামাযের কারণে ইফতার করতে বিলম্ব হলে তিনি এটিকে সুন্নাতের খেলাপ মনে করতেন না।

অবশ্য হাদীসের কতিপয় ইমাম হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বলেছেন—তিনি রাতের আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় করতেন। তার আগে তিনি ইফতার করে নিতেন।[১১৪]–(আরো দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

৬. সিয়ামুত্ দাহর (সারা বছর রোযা রাখা)

সারা বছর রোযা রাখার সামর্থ ও শক্তি আছে—এরূপ ব্যক্তির সারা বছর রোযা রাখা হযরত ওসমান (রা) অন্যায় মনে করতেন না। সেই সামর্থ ও শক্তি বলতে বুঝায় সারা বছর রোযা রাখার ফলে এতটুকু দুর্বল হয়ে না যাওয়া যাতে কর্তব্য কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তবে বছরে যে কদিন রোযা রাখা হারাম সে কদিন বাদে অবশিষ্ট সারা বছর রোযা রাখা যাবে। তদ্রূপ তিনি রাতের প্রথম অংশে সামান্য ঘুমিয়ে নিয়ে বাকী রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকাকে গুরুত্ব দিতেন।[১১৫]

www.amarboi.org

৭. আরাফাতের দিন রোযা

আমরা হযরত ওসমান (রা)-এর এরূপ কোনো বর্ণনা পাইনি, যাতে বুঝা যায় তিনি আরাফাতের দিন হাজীদের জন্য রোযা রাখা জায়েয মনে করতেন না। এর কারণ, তিনি জানতেন আরাফাতের দিন রোযা রাখা যেমন হাজীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় তেমনি তাদেরকে এদিন রোযা রাখা নিষেধও করা হয়নি। তাই আমরা দেখতে পাই, তিনি নিজেও মাঝে মাঝে আরাফাতের দিন রোযা রাখতেন আবার রোযা ছেড়েও দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়—তিনি আরাফাতের দিন রোযা রাখেননি। ইবনু ওমর (রা) বলেন—আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাজ্জ করেছি। তিনি আরাফাতের (হাজ্জের) দিন রোযা রাখেননি। অতপর আবু বকর (রা)-এর সাথে হাজ্জ করেছি, তিনিও এদিন রোযা রাখতেন না। তারপর হযরত ওমর (রা)-এর সাথে হাজ্জ করেছি তিনিও এদিন রোযা রাখেননি। এমনিভাবে আমি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি, তিনিও আরাফাতের দিন রোযা রাখতেন না। এজন্য আমিও আরাফাতের দিন রোযা রাখি না। তাছাড়া আমি কাউকে রোযা রাখতে বলিও না আবার কাউকে বারণও করি না।[১১৬]

ইমাম হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত, হযরত ওসমান (রা) একবার আরাফাতের দিন রোযা রেখেছিলেন। সেদিন প্রচণ্ড গরম ছিলো। লোকজন তাকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।[১১৭]

–(আরো দেখুন 'হাজ্জ' শিরোনাম)

৮. দাওয়াতে রোযাদারদের অংশগ্রহণ

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'দাওয়াত' শিরোনাম।

সিয়াল (صِيَالٌ)—যুদ্ধের হুমকী দেয়া/আক্রমণ করা

১. সংজ্ঞা

কারো ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আক্রমণ করা কিংবা যুদ্ধের হুমকী দেয়াকে সিয়াল বলা হয়।

২. সিয়াল সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিকোণ

[২.১] হযরত ওসমান (রা) মনে করতেন আক্রমণকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করা জায়েয, তবে অপরিহার্য (ওয়াজিব) নয়। যেমন আমরা দেখতে পাই, যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য তার বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিলো তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত তিনি এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

كُنْ عَبْدَ اللّٰهِ الْمَقْتُوْلَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللّٰهِ الْقَاتِلِ .

'তোমরা আল্লাহর হত্যাকারী বান্দা না হয়ে বরং নিহত বান্দা হও।'

[২.২] আক্রমণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হলে।

–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম)

www.amarboi.org

সিরাইয়াহ (سراية)—অনুপ্রবেশ/বিস্তৃতি লাভ করা

যে ক্ষত বিস্তৃতি লাভ করে কিংবা অন্যত্র সংক্রমিত হয় এমন অপরাধের জরিমানা।

—(বিস্তারিত দেখুন 'যারব' শিরোনাম)

সিহর (سحر)—যাদুটোনা

১. সংজ্ঞা

এমন আমলকে যাদু বলে যার মাধ্যমে মানুষ জ্বিন প্রমুখকে মন্ত্রমুগ্ধ করে আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

২. যাদুকরের শাস্তি

যাদুটোনা হারাম। কাজেই যাদু বিদ্যা চর্চা জায়েয নেই। প্রথমত যাদু টোনার মাধ্যমে অপরকে কষ্ট দেয়া হয়। দ্বিতীয় যাদু টোনার মন্ত্র এমন সব শব্দ সমষ্টি, যা মুখে উচ্চারণ করলে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। এজন্য যাদুকরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।[১১৮]

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ের ঘটনা। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর এক বাঁদী তাঁকে যাদু করে এবং সে এ অপরাধের কথা স্বীকারও করে। তখন হাফসা (রা) আবদুর রহমান ইবনু যায়িদকে নির্দেশ দিলেন, সেই বাঁদীকে হত্যা করার জন্য। নির্দেশ পেয়ে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। হযরত ওসমান (রা) এ ঘটনা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—আপনি এমন এক মহিলা সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীনের কাজকে অপছন্দ করবেন না, যে তাঁকে যাদু করেছে এবং তার অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক জবাববন্দি দিয়েছে। একথা শোনে হযরত ওসমান (রা) চুপ হয়ে গেলেন।[১১৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত ওসমান (রা)-এর অসন্তুষ্টি যাদুকর মহিলাকে হত্যা করার জন্য নয় আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়ায় তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। যা একান্তই খলীফার অধিকার। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-এর কথা—'এমন এক মহিলা সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীনের কাজকে অপছন্দ করবেন না যে তাঁকে যাদু করেছে এবং তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে।' একথা শুনে চুপ করে যাওয়া থেকে বুঝা যায় এ অপরাধের জন্য যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিলো, সেই মহিলা যে সেই শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। একথাটি মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবার বর্ণনা থেকেও প্রমাণিত হয়। যেখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, হযরত ওসমান (রা) এ কাজকে এজন্য অপছন্দ করেছিলেন, কারণ তাঁর অনুমোদন ছাড়াই সেই মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিলো।[১২০]

সুকরুন (سكر)—নেশা/মাতলামী

১. সংজ্ঞা

মাদকদ্রব্য সেবনের পর মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ এবং কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যাওয়াকে সুকরুন বা মাতলামী বলে।

www.amarboi.org

২. মাতলামীর প্রভাব ও পরিণতি

মাদক দ্রব্যের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জানার পরও যে ব্যক্তি তা স্বেচ্ছায় সেবন করবে, নিম্নোক্ত বিধানগুলো তার ওপর কার্যকরী হবে।

[২.১] হাদ কার্যকরী করা ঃ ভুলে [বা কারো প্রভাবে পড়ে] কেউ মাদক দ্রব্য সেবন করলে তাকে ৪০ ঘা চাবুক মারতে হবে। আর যদি সে মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার শাস্তি ৮০ ঘা বেত।-(আরো দেখুন আশরাবাহ্ শিরোনাম)

মাদক সেবনকারী যদি গোলাম হয় তার শাস্তি স্বাধীন ব্যক্তির শাস্তির অর্ধেক।
-(বিস্তারিত দেখুন 'হাদ' শিরোনাম)

[২.২] মাতালের কোনো কথা বা কাজ কার্যকরী না করা ঃ নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কোনো কথা গ্রহণযোগ্য নয়, তা তার অধিকারের ব্যাপারেই হোক কিংবা অন্য কারো ব্যাপারে। এ কারণেই মাতালের দেয়া তালাক কার্যকর হয় না।[১২১]

হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—নেশাগ্রস্ত মাতাল আর পাগল ছাড়া অন্য সকলের তালাকই কার্যকর হয়ে যায়।[১২২] কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক ও গোলাম-বাঁদী মুক্ত করলে তা কার্যকরী হবে না।'[১২৩]
-(আরো বিস্তারিত দেখুন 'আশরাবাহ্' এবং 'হাজর' শিরোনাম)

সুজূদ (سجود)—সিজদা

১. সংজ্ঞা

নিম্নোক্ত ৭টি অঙ্গ মাটিতে রাখাকে সিজদা বলা হয়। ক. কপাল খ. দু হাতের তালু গ. দু হাটু এবং ঘ. দু পায়ের আঙ্গুল।

২. কি কি কারণে সিজদা করা হয়

[দুই কারণে সিজদা করা হয়, নামাযে এবং কুরআনুল কারীমের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে,। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।-অনুবাদক]

[২.১] নামাযে সিজদা ঃ বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম।

[২.২] তিলাওয়াতের সিজদা [ক] কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সিজদার স্থানসমূহ ঃ একথা সত্যি যে, সাহাবা কিরাম (রা)-এর সমস্ত কথা ও কাজ আমাদের পর্যন্ত পৌছেনি এবং তাঁরাও সব কথা ও আমলের ব্যাপার প্রকাশ করা সমুচীন মনে করেননি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারটি তা থেকে ভিন্ন। তাঁর কোনো কথা কিংবা কাজ আমাদের থেকে গোপন নেই। কিছু কাজ ছিলো গোপনীয় ও একান্তই ব্যক্তিগত কিন্তু তাও সুকৌশলে আমাদের কাছে পৌছে গেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানের জন্য তাকে আদর্শ বানিয়েছেন। এজন্যই তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজ মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিলো।

সাহাবা কিরাম (রা) কোনো কাজ গোপনে করতেন আবার অনেক কাজ প্রকাশ্যে করতেন। সেজন্য আমরা তাদের অনেক কাজ সম্পর্কে জানতে পেরেছি আবার অনেক কাজের বিবরণ

www.amarboi.org

আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি। যাহোক আমাদের নিকট যেসব বর্ণনা পৌঁছেছে তার আলোকে বলা যায় হযরত ওসমান (রা) সূরা সাদ এর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠে সিজদা করেছেন ঃ[১২৪]

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ -(ص : ٢٤)

"দাউদ ভাবলো, আমি তাকে পরীক্ষা করছি, তখন সে তাঁর রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো, রুকূ'তে ঝুঁকে পড়লো এবং তাওবা করলো।"-(সূরা সাদ ঃ ২৪)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু শিহাব যুহ্‌রী এমনও বলেছেন—আমি এ আয়াত পড়ে সিজদা করতাম না। যেদিন থেকে আমার কাছে হযরত ওসমান (রা)-এর এ বর্ণনা পৌঁছুলো, তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন, সেদিন থেকে আমিও সিজদা করা শুরু করলাম।[১২৫]

অন্য এক বর্ণনা মতে হযরত ওসমান (রা) সূরা আন নাজমের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেও সিজদা করতেন ঃ

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا-(النجم : ٦٢)

"অতএব, আল্লাহর জন্য সিজদা করো এবং ইবাদাত করো।"-(সূরা আন নাজম ঃ ৬২)

মাসরূক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ওসমান (রা)-এর পিছনে ফযর নামায পড়েছি। তিনি সূরা আন নাজম তিলাওয়াত করে সিজদার আয়াতের জন্য সিজদা দিলেন তারপর ওঠে দাঁড়িয়ে অন্য সূরা তিলাওয়াত করলেন।[১২৬]

হযরত ওসমান (রা) একবার ইশার নামাযে সূরা আন নাজম পড়েছেন এবং সিজদার আয়াতের জন্য সিজদাও করেছেন।[১২৭] কিন্তু আমাদের কাছে এ দুটো সূরার তিলাওয়াতের সিজদার কথা পৌঁছার অর্থ এই নয় যে, তিনি অন্যান্য সিজদার আয়াত পাঠে সিজদা করতেন না। বরং তিনি সিজদা করতেন ঠিকই কিন্তু সেসব বর্ণনা আমাদের কাছে পৌঁছেনি।

[খ] কার ওপর তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব ঃ এ প্রসঙ্গে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—বালেগ ও বুদ্ধিমান এমন প্রতিটি ব্যক্তির ওপর সিজদা ওয়াজিব, যারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন অথবা যারা কুরআন শরীফ শুনার জন্য বিশেষভাবে বসে থাকেন। তবে যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে সিজদার আয়াতের তিলাওয়াত শুনে থাকেন তাদের জন্য সিজদা করা ওয়াজিব নয়। বর্ণিত আছে—হযরত ওসমান (রা) একবার কিচ্ছা বর্ণনাকারীদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছিলো যেন হযরত ওসমান (রা)-ও তাদের সাথে সিজদা করেন। হযরত ওসমান (রা) ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন—তিলাওয়াতের সিজদা শুধু তাদের ওপর ওয়াজিব যারা গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত শুনছেন। অতপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন কিন্তু সিজদা করলেন না।[১২৮]

হযরত ওসমান (রা)-এর কথা 'যে ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে তিলাওয়াত শুনছেন' এর অর্থ যিনি বা যারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুনার জন্য বসে আছেন। এজন্যই তিনি বলেছেন—তিলাওয়াতের সিজদা শুধু তাদের ওপর ওয়াজিব যারা তা শোনার জন্য বসে থাকেন।[১২৯] তিনি আরো বলেছেন, মহিলারা যদি মাসিকের সময় সিজদার আয়াতের তিলাওয়াত শোনে, তারা যেন ইঙ্গিতে সিজদা করে নেয়।[১৩০] অর্থাৎ তারা যেন সিজদা বাদ না দেয়, আবার নামাযের সিজদার মত সিজদাও না করে।

www.amarboi.org

[গ] মাকরূহ সময়ে তিলাওয়াতের সিজদা ঃ যতদূর জানা যায়, হযরত ওসমান (রা) মাকরূহ সময়ে তিলাওয়াতের সিজদা জায়েয মনে করতেন না। কারণ তাঁর থেকে এমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না যাতে বুঝা যায়—ফজর নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি তিলাওয়াতের সিজদা করেছেন।[১৩১]

কারণ এ সময় সূর্য পূজারীরা সূর্যের পূজা করে থাকে। কাজেই এ সময় সিজদা দিলে সূর্য পূজারীদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়।

[ঘ] তিলাওয়াতের সিজদা কখন আদায় করতে হবে ঃ যদি কেউ নামাযে দাঁড়িয়ে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাহলে তিলাওয়াত বন্ধ রেখে আগে সিজদা দিতে হবে। তারপর দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট কিরায়াত পূর্ণ করবেন। একবার হযরত ওসমান (রা) ফজর নামাযে সূরা সাদ পড়ছিলেন। সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা আদায় করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট সূরা পড়ে রুকূ' করলেন। কতিপয় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন—আমীরুল মুমিনীন ! তিলাওয়াতের সিজদার জন্য এটি কি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ? তিনি বললেন—এ জায়গায় স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আল-াইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করতেন।[১৩২]

তদ্রূপ একদিন তিনি ফজর নামাযে সূরা আন নাজম তিলাওয়াত করলেন এবং সিজদার আয়াতে সিজদা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে অন্য একটি সূরা পড়লেন।[১৩৩]

তেমনিভাবে ইশার নামাযেও তিনি সূরা আন নাজম পড়ে সিজদার আয়াতে সিজদা দিয়েছেন।[১৩৪]

প্রথমে খুতবা শেষ করে তারপর মিম্বার থেকে নেমে তিলাওয়াতের সিজদা করাও জায়েয আছে।[১৩৫]

সুত্‌রা (سترة)—আড়াল

এমন বস্তুকে সুত্‌রা বলা হয় যা পর্দা বা আড়াল সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইসলামী পরিভাষায় সুতরা বলতে এমন লাঠি বা লাঠি জাতীয় বস্তুকে বুঝায় যা নামাযী তার সামনে পুতে রাখেন। যেন কোনো ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে (সিজদার জায়গার পর্যন্ত) অতিক্রম করতে না পারেন।–(বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

সুব্‌হ (صبح)—সকাল/প্রভাত

বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'ফজর' শিরোনাম।

সুলহ (صلح)-সন্ধি/আপোষ চুক্তি

১. সংজ্ঞা

এমন অঙ্গীকার পত্র বা চুক্তিপত্রকে সুলহ বলে যার প্রেক্ষিতে বিবদমান দুপক্ষের মধ্যে বিবাদের অবসান ঘটে যায়।

২. সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধের অবসান

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'জিহাদ' শিরোনাম)

www.amarboi.org

৩. সন্ধির শর্তাবলী

বিবদমান দুপক্ষের মধ্যে যেসব শর্তানুযায়ী সন্ধি স্থাপিত হয় সেসব শর্তাবলী মেনে চলা উভয় পক্ষের কর্তব্য।

কোনো পক্ষ কল্যাণকর মনে করলে যেসব শর্তে সন্ধি হয়েছে তার কোনো একটি শর্ত বা একাধিক শর্তকে প্রত্যাহার করতে পারেন।

একবার আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আল হাসান আশ শাইবানীকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত ওমর (রা) বনী তাগলুবের সাথে এ শর্তে সন্ধি করেছিলেন যে, তাদের সন্তানদেরকে খৃষ্টান বানাতে পারবে না। কিন্তু তারা এ শর্তের বিপরীত কাজ করছিলো অর্থাৎ নিজেদের সন্তানদেরকে খৃষ্টীয় কায়দায় শিক্ষাদীক্ষা প্রদান শুরু করে দিয়েছিলো। আপনি কি মনে করেন এরূপ অবস্থায় শর্ত ভঙ্গের কারণে তাদেরকে হত্যা করা যাবে? ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আল হাসান আশ শাইবানী বলেন—আমি হারুনুর রশীদকে বললাম, একথা ঠিক হযরত ওমর (রা) বনী তাগলুবকে তাদের সন্তানকে খৃষ্টান না বানানো সংক্রান্ত যে শর্ত দিয়েছিলেন, হযরত ওমর (রা)-এর শাহাদাতের পর তারা সেই শর্ত লংঘন করা শুরু করে দেয়। কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত হযরত ওসমান (রা) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই হযরত আলী (রা) নিজেদের জ্ঞান ও মর্যাদার কারণে তাদের শর্ত ভঙ্গের দিকটি উপেক্ষা করেন। পরে তাদের এ কর্মনীতি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সন্ধি সম্পর্কে হযরত ওমর (রা)-এর উত্তরসূরীদের এ আমল আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করে না। আমি যা বললাম—সেটিই হচ্ছে এ মাসয়ালার ব্যবহারিক দিক। এখন আপনি যা ভালো মনে করেন করতে পারেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমিও তাদের কর্মপদ্ধতিই গ্রহণ করবো, ইনশাআল্লাহ।[১৩৬]

সূরাহ্ (صورة)—ছবি/চিত্র/প্রতিকৃতি

নামাযের সময় কোনো ছবি বা প্রতিকৃতির দিকে মনযোগ না দেয়া।

–(বিস্তারিত দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'স' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৯৮০ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৯৭ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-২৬ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৬৩১।
২. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫৫৯।
৩. কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬৬৬।
৪. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭০।
৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, ২৫০ এবং ১৮৭ পৃষ্ঠা ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-২৮২ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৮৬ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৫৩১ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১০৯।
৬. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭৪।
৭. ঐ পৃ-৭৩।
৮. ঐ, পৃ-৫২১।
৯. সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১২ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫২১।
১০. সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৬৫ ; আল মাজমু', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৫৪।
১১. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৮।
১২. মুসান্নাফ-আবুদর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৫৭ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯৪।
১৩. আল মাজমু', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৪৮।
১৪. মুসনাদ-ইমাম আহমদ, ফতহুল বারী, হাফিয ইবনু হাজার ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯০ ; ৩য় খণ্ড, পৃ-৪০৮ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৬৯ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৩।
১৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-২৬ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৪৬ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৫৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৭।
১৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৪০।
১৭. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭৫।
১৮. তাফসীর আল কুরতবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৬০ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৪২।
১৯. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৮৩২ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৪ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৩৭।
২০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৪।
২১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২৩৭।
২২. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩২৮।
২৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৯৬ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩২০ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩৬৫।
২৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩০ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক ১০ম খণ্ড, পৃ-২২০ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬৩ ; আল মুহাল্লী ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৩৩ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৭।
২৫. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭০।
২৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-২০১।
২৭. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬৪।
২৮. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৯।
২৯. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪০০ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৬৭ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১০০।
৩০. নাইলুল আওতার, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৫।
৩১. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১১।
৩২. ঐ, পৃ-৬৯।

www.amarboi.org

৩৩. আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-২৩২।
৩৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৯।
৩৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৩ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৭৮ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৬ ; আল ই'তিবার, পৃ-৭৮।
৩৬. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৬।
৩৭. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৪ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৬।
৩৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯।
৩৯. ঐ, পৃ-২৩।
৪০. ঐ, পৃ-২৯ এবং কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২০৬।
৪১. আল মাজমু', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৫৯ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৯।
৪২. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪০০ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৬৭ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১০০।
৪৩. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯৪ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৪ ; আল ই'তিবার, পৃ-১০৪।
৪৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯।
৪৫. আল ইসতিযকার, ১ম খণ্ড, পৃ-৫২।
৪৬. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৩।
৪৭. আল মাজমু', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৮২ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৫৭ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৭৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪২।
৪৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৭৫।
৪৯. ঐ, এবং সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৩৮ ; ১ম খণ্ড, পৃ-৪৪৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২০১।
৫০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩০।
৫১. ঐ, পৃ-১০৩ এবং তরহুত্ তাছরীব, ২য় খণ্ড, পৃ-১৮৫।
৫২. মুসান্নাফ-আদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৭০ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৯৫ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯২।
৫৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৬ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯৭, ৯৯।
৫৪. আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৭৪।
৫৫. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৪৮।
৫৬. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৮৯ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১০৮।
৫৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১০৮।
৫৮. ঐ, পৃ-৫৫ এবং আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১০৮।
৫৯. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৯১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৭।
৬০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১০০।
৬১. সুনানু তিরমিযি, হাদীস নং ৪৯৩, কিতাবুল সালাত বাবে তারকুল কুনূত ; সুনানু নাসাঈ, ২য় খণ্ড, পৃ-২০৩ ; শরহু মা'আনিল আছার, ১ম খণ্ড, পৃ-২৪৯ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫৫।
৬২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১০৭।
৬৩. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-২০২।
৬৪. আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৪১ ; আল ই'তিবার, পৃ-১২ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৮৩ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৮৫।
৬৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১০০ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৮৬।
৬৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-১০৯।
৬৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১০০।
৬৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-২২৩।
৬৯. আল মাজমু, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫১৮।
৭০. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৫২১ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬২।

www.amarboi.org

৭১. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৭ ; আল মাজমূ', ৩য় খণ্ড, পৃ-৫২১ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৬২।

৭২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৪ ; শরহুল মা'আনিল আছার, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৪ ; আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৮ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫০ ; আল মাজমূ', ৩য় খণ্ড, পৃ-৫১৯।

৭৩. আল মাজমূ', ৩য় খণ্ড, পৃ-৫২০ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৫২ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৭৩।

৭৪. আল মাজমূ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৩২ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৫৫।

৭৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭২ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৯।

৭৬. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৮।

৭৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫১ ; আল মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-১৩২।

৭৮. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৩।

৭৯. সহীহ আল বুখারী, সালাতুল জুম'আ অধ্যায় ; সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১২৪ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২১৩ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৩০।

৮০. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫২।

৮১. সহীহ আল বুখারী, সালাতুল জুম'আ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-ক্রীতদাসের ইমামত।

৮২. ইমাম বুখারী এ হাদীসটি সালাতু জুম'আ অধ্যায় ক্রীতদাসের ইমামত অনুচ্ছেদে সনদ বিহীন (তা'লীকান) বর্ণনা করেছেন।

৮৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৫৪ ; সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২২০ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫৯ এবং ১১৫ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৯৭ ; ৮ম খণ্ড, পৃ-২৭২।

৮৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪০ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৯ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-২২ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৯৭।

৮৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৯।

৮৬. সুনানু-বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪০০ ; কানযুল উম্মাল, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৬৭ ; আল মাজমূ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৫৯ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১০০ ; আল ইসতিযকার, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৬১।

৮৭. ঐ।

৮৮. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৩০৮।

৮৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩০৫ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৭ ; আল মাজমূ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৬০ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৫৮, ৩৬০ ; আল মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৯।

৯০. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৭ ; আল মাজমূ', ৫ম খণ্ড, পৃ-৫।

৯১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭৮।

৯২. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৫ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭৯, ২৮২ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৮৫ ; আল মাজমূ, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৭।

৯৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৯২ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৩, ৯৪ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৬৩৮।

৯৪. আল মাজমূ', ৫ম খণ্ড, পৃ-৬৪।

৯৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১২৮।

৯৬. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৫৪ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৬ ; আল মুহাল্লী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৩ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯৪ ; ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৪ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১০২, ১১৪ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৯৯।

৯৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৫৬, ৯৮।

৯৮. সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৫।

৯৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৩৫ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-৫০।

১০০. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৬৯ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৭১১।

১০১. শরহু মা'আনিল আছার, ১ম খণ্ড, পৃ-২৮৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭০ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম

www.amarboi.org

খণ্ড, পৃ-১৪৯ ; কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭১১ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৪৬৪ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩০।

১০২. কানযুল উম্মাল, ১৫শ খণ্ড, পৃ-৭১১ ; শরহু মা'আনিল আছার, ১ম খণ্ড, পৃ-২৮৮।

১০৩. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৬৩ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৯৪।

১০৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৭৮।

১০৫. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-২২৩।

১০৬. কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-৪৯।

১০৭. আল মাজমু', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৬২।

১০৮. ঐ।

১০৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-১৬৭ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৫৭।

১১০. আল মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৩০০।

১১১. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১২৭।

১১২. আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৮৭।

১১৩. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১২৯।

১১৪. ঐ, পৃ-১৩০ এবং মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২২৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৩৮, ৪৪৮ ; আল মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৮৭ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২০১।

১১৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১২৮।

১১৬. ঐ, পৃ-১৬৯ এবং আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৮ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৬ ; আল মাজমু, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৩৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৮।

১১৭. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৯।

১১৮. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৫৩।

১১৯. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮০ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৬৪, পৃ-৩৯৪ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭৫০।

১২০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৭৮।

১২১. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃ-২৩৭ ; উমদাতুল কারী, ২০শ খণ্ড, পৃ-২৫১ ; আল মুগনী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১৫।

১২২. সুনানু-সাঈদ ইবনু মানসুর ১ম খণ্ড, ৩য় খণ্ড, ভাগ, পৃ-২৬৮ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৫৯ ; আল মুহাল্লী, ১০ম খণ্ড, পৃ-২০৯ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-৯৯ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৬।

১২৩. সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩১৯৩, সুনানু ইবনু মাজা, হাদীস নং-২০৪৬।

১২৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৪ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৩৬ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬১৮।

১২৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৪।

১২৬. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৪৫।

১২৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৪।

১২৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৪৪ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬২৪।

১২৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৩ ; আল মাজমু', ৩য় খণ্ড, পৃ-৫৫১।

১৩০. ঐ, পৃ-৬৫ এবং আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬২০ ; আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১১১।

১৩১. সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৩২৬ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬২৩।

১৩২. কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৪৪।

১৩৩. ঐ, পৃ-১৪৫।

১৩৪. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৪।

১৩৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬ ; কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৪৪।

১৩৬. আহকামুল কুরআন-আল জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, পৃ-৯৫।

www.amarboi.org

হ

হাইওয়ান (حيوان)—প্রাণী/জীব

১. এমন প্রাণী যেগুলো মারা বৈধ

[১.১] কুকুর এবং কুকুর সদৃশ প্রাণী মারা ঃ শূকরের মত কুকুরও নাপাক। কুকুর বাড়ি ও রাস্তায় ঘোরা-ফেরার সময় তা অপবিত্র করে ফেলে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) কুকুর নিধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] হতে পারে সে নির্দেশ শুধু বিপজ্জনক কুকুর কিংবা গাঢ় কালো রঙের কুকুরের বেলায় প্রযোজ্য ছিলো।

একথাটি হযরত ওসমান (রা)-এর নিম্নোক্ত কথার ওপর নির্ভর করে বলা যায়। তিনি বলেছেন—'শূকর নিধন শুধু বৈধই নয় বরং উত্তম কাজ।'

[১.২] খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত প্রাণী হত্যা ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে মদীনা মুনাওয়ারায় কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতার হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো। মহামারী আকারে তা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো, আল্লাহর স্মরণ এবং মানুষের প্রয়োজনীয় কাজকর্মেও তা রীতিমতো বাধার সৃষ্টি করছিলো। যার প্রেক্ষিতে হযরত ওসমান (রা) সেসব কবুতর যবেহ্ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য পরে সেই লক্ষ্যে পৌঁছার এক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেসব কবুতরের পাখার পালক কেটে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।-(আরো দেখুন 'হামাম' শিরোনাম)

[১.৩] ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা ঃ কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা জায়েয, এ সম্পর্কে সকল উম্মাহ একমত।

২.

–প্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ ও তার ক্ষতিপূরণ।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন–'জিনাইয়াহ' শিরোনাম)

–হেরেম শরীফের ভেতর প্রাণী সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটন ও তার ক্ষতিপূরণ অতিরিক্ত প্রদান।–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়াহ' শিরোনাম)

–প্রাণী সম্পর্কিত অপরাধের জরিমানা গোলাম বাঁদী সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষতিপূরণের মতই যা তার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হয়।-(আরো জানতে হলে দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

–হেরেমের ভেতর শিকার এবং তার ক্ষতিপূরণ।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

–যেসব প্রাণী খাওয়া বৈধ।–('ইহরাম' শিরোনাম দেখুন)

–হারানো পশু প্রাপ্তি।–(বিস্তারিত দেখুন 'লুকতাহ' শিরোনাম)

–নামাযীর সামনে দিয়ে কোনো প্রাণীর যাতায়াতে বাধা প্রদান।

–(দেখুন 'সালাত' শিরোনাম)

www.amarboi.org

হাওয়ালা (حوالہ)—দায় সমর্পণ

১. সংজ্ঞা

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের দায়কে অন্য কারো যিম্মায় সমর্পণ করাকে হাওয়ালা (দায় সমর্পণ) বলে।

২. হাওয়ালা গ্রহণকারী দেউলিয়া হয়ে গেলে

এক ব্যক্তির ঋণের দায় অন্য ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পিত হওয়ার পর যদি দায় পরিশোধের পূর্বেই তিনি দেউলিয়া হয়ে যান তাহলে ঋণদাতা তার ঋণ আদায়ের জন্য প্রকৃত ঋণ গ্রহীতাকে চাপ দিতে পারেন। কেননা এমতাবস্থায় তা এমন এক চুক্তির মত হয়ে যায়, যে চুক্তির কোনো এক পক্ষের ব্যর্থতায় অন্য পক্ষ তা বাতিল করার অধিকার লাভ করে। যেমন একটি কাপড় বেচাকিনি হলো। একপক্ষ কাপড়ের দাম মিটিয়ে দিলেন কিন্তু অন্যপক্ষ কাপড় বুঝিয়ে দিলেন না। তদ্রূপ ঋণের দায় একজন থেকে অন্যজনের কাছে অর্পণের ব্যাপারে হযরত ওসমান (রা) বলেছেন—'কোনো মুসলমানের সম্পদকে নষ্ট করা উচিত নয়।'[২]

হাজব (حجب)—উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া

১. সংজ্ঞা

কোনো কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াকে 'হাজব' বলা হয়।

২. 'হাজব' এর প্রকার

'হাজব' দু প্রকার। যেমন–

[২.১] হাজবে হিরমান ঃ উত্তরাধিকার (ওয়ারিশীস্বত্ব) থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়াকে 'হাজবে হিরমান' বলে। অবশ্য আমরা এ সম্পর্কে আগে আলোচনা করেছি।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

[২.২] হাজবে নুকসান ঃ কোনো ওয়ারিশের নির্দিষ্ট অংশ সংগত কোনো কারণে কমে যাওয়াকে হাজবে নুকসান বলে। যেমন–স্ত্রী নিঃসন্তান হলে স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক পান কিন্তু স্ত্রীর সন্তান থাকলে স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেকের পরিবর্তে এক-চতুর্থাংশ পাবেন। তদ্রূপ স্বামী নিঃসন্তান হলে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পান কিন্তু স্বামীর সন্তান থাকলে তিনি এক-চতুর্থাংশের পরিবর্তে এক-অষ্টমাংশ পাবেন।

মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান থাকে এবং তার ভাই বোনও থাকে তাহলে মা এক-তৃতীয়াংশের পরিবর্তে এক-ষষ্টাংশ পাবেন।–(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

হাজর (حجر)—বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

১. সংজ্ঞা

শরঈ কোনো কারণে কারো বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকে 'হাজর' বলা হয়।

www.amarboi.org

২. বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কারণ

[২.১] বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়া ঃ নাবালেগ, অবুঝ শিশু, পাগল এবং মাতালের কথাবার্তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তা কল্যাণকর হয়। যেমন কারো দান বা উপহার গ্রহণ করা। আবার তা অকল্যাণকরও হতে পারে। যেমন কাউকে কোনো জিনিস স্বেচ্ছায় দান করা। কিংবা উভয় ধরনের মাঝামাঝি কোনো কাজ যেখানে লাভ লোকসান দুটোই থাকতে পারে। যেমন—কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ বেচাকিনি করা কিংবা কোনো কিছুর ভাড়া বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ইত্যাদি।-(আরো বিস্তারিত দেখুন-'আশরাবাহ' এবং 'জুনুন' শিরোনাম)

[২.২] বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ঃ বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা বলতে বুঝায়, যে তার মাল-সম্পদের অপব্যবহার (Miss Use) করে। হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—এ ধরনের লোকদের সম্পদ লেনদেনের ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে—হযরত আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা) ষাট হাজার দিনারে একটি জমি খরিদ করেন। হযরত আলী (রা) একথা জানতে পেরে বাধা দিয়ে বললেন—এ জমি এতবেশী দাম হতে পারে না। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু জাফরকে স্পষ্ট ধোঁকা দেয়া হয়েছে। তার এ কাজে সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এমনও বললেন—আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা)-কে এ ব্যাপারটি জানাতে হবে, যেন আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা)-এর বোকামীর কারণে তার সম্পদ খরচের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেন। যখন আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা) একথা জানতে পারলেন তখন দ্রুত হযরত যুবাইরের নিকট গেলেন। যিনি প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। বললেন—আমি অমুকদিন এত টাকায় একটি জমি কিনেছি। এখন আলী (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে আবেদন করতে চাইছেন সম্পদ খরচের ব্যাপারে আমাকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য। হযরত যুবাইর (রা) তাকে বললেন—আমি তোমার সেই সম্পদে অংশীদার হলাম। ওদিকে হযরত আলী (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন—আমার ভাতিজা ষাট হাজার দিনারে এক অনুর্বর জমি কিনেছে। অথচ আমি আমার জুতোর বিনিময়েও তা কিনতে রাজী নই। তখন হযরত যুবাইর (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন—এ জমিতে আমিও আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা)-এর সাথে একজন অংশীদার। তখন হযরত ওসমান (রা) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন—যে জমি কেনার ব্যাপারে যুবাইর (রা)-এর মত লোক অংশীদার সেই জমি কেনার কারণে আমি কিভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবো?[৩]

একথা বলে হযরত ওসমান (রা) বুঝাতে চেয়েছেন—আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের খরচের ব্যাপারে নির্বোধ চিহ্নিত করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারি না যেহেতু তার অংশীদার হিসেবে হযরত যুবাইর (রা)-এর মত লোক আছেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী যুবাইর (রা) এমন কোনো ব্যবসায় অংশীদারীত্ব করতে পারেন না যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাময় কিংবা নির্বুদ্ধিতামূলক।

[২.৩] দেউলিয়াত্ব ঃ দেউলিয়া বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী, যে কারণে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। এ সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—দেউলিয়া ব্যক্তির যাবতীয় লেনদেনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর দেউলিয়া ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদ পাওনাদাররা তাদের অংশ অনুযায়ী ভাগ

www.amarboi.org

ভাটোয়ারা করে নেবেন। কিন্তু দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদের মধ্যে যদি কোনো বিক্রেতা তার পণ্য অবিকৃত অবস্থায় পান তাহলে তিনি ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে তার পণ্য ফেরত নিতে পারেন। এটি তার জন্য জায়েয।[৪] কারণ অন্যদের চেয়ে তিনিই সেই পণ্যের অধিক হকদার।

হাজ্জ (حج)—হাজ্জ

১. হাজ্জের নিয়ম কানুন সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা)-এর ইল্‌ম

ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সীরীন বলেন, হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে লোকদের অভিমত ছিলো হাজ্জের নিয়ম কানুন সম্পর্কে হযরত ওসমান (রা) সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)।[৫]

২. ইদ্দত পালনরত মহিলার হাজ্জ

ইদ্দত পালনরত অবস্থায় মহিলাদের জন্য জরুরী হচ্ছে তারা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তারা সফর করবেন না। কারণ সফর অবস্থায় নিজের ঘর ছেড়ে অন্যের ঘরে অবস্থান করতে হয়। আর হাজ্জ করতে গেলে সফরতো করতেই হয়। এজন্য হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে ইদ্দত পালনরত মহিলাদের ওপর হাজ্জ ফরয নয়। এমনকি ইদ্দত পালনরত কোনো মহিলা হাজ্জ কিংবা ওমরার জন্য বেরুলে তিনি জুহফা এবং যুল হুলাইফা থেকে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।[৬]

৩. হাজ্জের নিয়ত করা এবং ইহরাম বাধা

[৩.১] যখন কেউ হাজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করেন, তখন হাজ্জ আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হাজ্জ আদায় না করে কিংবা হাজ্জ ছেড়ে অন্য কোনো কাজ করা তার জন্য বৈধ নয়। অবশ্য নিয়তের সময় যদি কোনো শর্ত যোগ করে না থাকেন। যেমন—নিয়ত করার সময় বলা হলো আমি হাজ্জের নিয়ত করলাম কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা অন্য কোনো আঘাত পেলে অথবা বন্দী হয়ে পড়লে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবো।

কিংবা হাজ্জের নিয়ত করতে গিয়ে বললেন—'হে আল্লাহ ! আপনি আমার জন্য সহজসাধ্য করলে আমি হাজ্জ করবো, নইলে ওমরাহ।' হযরত ওসমান (রা) এরূপ শর্তারোপ করাকে দূষণীয় মনে করতেন না। আরাফাতের ময়দানে এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–তুমি কি এ ব্যাপারে কোনো শর্তারোপ করে রেখেছো ? তিনি বললেন–হাঁ।[৭]

[৩.২] ইফরাদ, তামাত্তু এবং কিরান হাজ্জ : [ক] হাজীদের জন্য হাজ্জে ইফরাদ (শুধু হাজ্জ) কিংবা হাজ্জে তামাত্তু করার নিয়ত করা উভয়ই জায়েয। হাজ্জে তামাত্তু বলা হয় হাজ্জের নির্দিষ্ট মাসে প্রথমে ইহরাম বেঁধে ওমরা আদায় করা তারপর ইহরাম খুলে ফেলা। হাজ্জের পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম ছাড়া মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করা। অতপর মক্কা মুকাররমা থেকে হাজ্জের জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধা।

তদ্রূপ হাজীদের জন্য হাজ্জে কিরানের নিয়ত করাও জায়েয আছে। হাজ্জে কিরান বলতে বুঝায় একই সাথে হাজ্জ এবং ওমরা করার জন্য ইহরাম বাঁধা।

www.amarboi.org

উল্লেখ্য যে, হাজ্জে কিরান এবং তামাত্তু শুধু বহিরাগত হাজীদের জন্য নির্দিষ্ট। যারা মক্কা মুকাররমার বসবাস করেন তাদের জন্য শুধু ইফরাদ হাজ্জের অনুমতি আছে। হযরত ওসমান (রা) মক্কার অধিবাসীদেরকে বলতেন, হাজ্জের সাথে ওমরা করার সুযোগ শুধু আমাদের জন্য, আপনাদের জন্য নয়।[৮]

[খ] সর্বোত্তম হাজ্জ হচ্ছে ইফরাদ হাজ্জ। কারণ পূর্ণাঙ্গ হাজ্জ শুধু এ প্রক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। এবার রইলো ওমরার কথা, যারা ওমরা করতে চান তারা অন্য মাসে ওমরা করবেন। হেরেমের অধিবাসীদের জন্য ওমরা করার সুযোগ সারা বছরই অব্যাহত থাকে। হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে কিরান ও তামাত্তু হাজ্জ করতে নিষেধ করতেন এবং ইফরাদ হাজ্জের জন্য উৎসাহিত করতেন, তা শুধু উত্তম হওয়ার কারণেই।[৯]

হযরত মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রা) বলেছেন, আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন গবাদি পশুকে পানি পান করানোর জায়গার দিকে যাচ্ছিলেন এবং উটের বাচ্চাকে গাছের পাতা ও ছানা আটা খাওয়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখে বলতে লাগলেন—'ওসমান (রা)-কে দেখেন, তিনি লোকদেরকে কিরান ও তামাত্তু হাজ্জ করতে নিষেধ করছেন।' অতপর আলী (রা) সেখান থেকে চলে গেলেন। তখনো তার হাতে গাছের পাতা ও গুলানো আটার চিহ্ন লেগে ছিলো। আমি সে কথা কখনো ভুলতে পারবো না। সেই অবস্থায়ই তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে পৌঁছে বলতে লাগলেন—আপনি নাকি কিরান এবং তামাত্তু হাজ্জ করতে নিষেধ করেন? তিনি উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, এটি আমার অভিমত।'

একথা শুনে হযরত আলী (রা) রাগত স্বরে এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন, 'হে আল্লাহ! আমি হাজ্জ ও ওমরা একই সাথে আদায়ের জন্য নিয়াত করলাম।'[১০]

আরেক ঘটনা। হযরত ওসমান (রা) এক ব্যক্তি সম্পর্কে শুনলেন, তিনি হাজ্জ ও ওমরা একই সাথে আদায়ের নিয়ত করেছেন। তিনি বললেন—হাজ্জ ও ওমরা একই সাথে আদায়কারীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে তাঁর কাছে হাজির করা হলে তিনি তাকে মারধর করলেন এবং বন্দী করে রাখলেন।[১১]

[গ] হাজীগণ ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে হাজ্জের নিয়ত করেন। তারপর জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন। তালবিয়া পাঠ ১০ই যিলহাজ্জ যামরাতু আকাবায় পাথর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাবহত রাখতে হয়।[১২]

৪. ইহরাম বাঁধা

ইহরাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে 'ইহরাম' শিরোনাম দেখুন।

৫. তাওয়াফুল কুদূম বা তাওয়াফে কুদূম

যখন হাজীগণ মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেন, তখন প্রথম কাজ হচ্ছে তাওয়াফুল কুদূম করা। অর্থাৎ সাতবার কা'বা ঘরের চারদিকে চক্কর লাগানো। হযরত ওসমান (রা) হারাম শরীফে প্রবেশের পর তাওয়াফে কুদূম না করে আর কোনো দিকে মনযোগ দিতেন না।[১৩]

তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রমল* করা হাজীদের জন্য জরুরী। তাই হযরত ওসমান (রা) তাওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রমল করতেন।[১৪] তাওয়াফের সময় খানায়ে

* কাধ উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দ্রুত বীরের মত চলাকে রমল বলা হয়।—অনুবাদক

www.amarboi.org

কা'বার পশ্চিমের দুকোণ চুমো খাওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু অবশিষ্ট দুকোণ (রুকনে ইয়েমেনী এবং হাজরে আসওয়াদ) চুমো খেতে হবে। হযরত ইয়ালা ইবনু উমাইয়া বলেছেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করেছি। তাওয়াফ শুরু করে আমরা হাজরে আসওয়াদকে চুমো করলাম। সে সময় আমি একেবারে খানায়ে কা'বার কাছাকাছি ছিলাম। অতপর যখন আমরা পশ্চিম কোণে (যা হাজরে আসওয়াদের পরে আসে) পৌছুলাম তখন আমি হাত বের করলাম চুমো খাওয়ার জন্য। তিনি আমাকে বললেন—'এ কী করছো ?' 'আমি জিজ্ঞেস করলাম'—'এখানে চুমো খেতে হবে না ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তুমি কি কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাওয়াফ করোনি ?' বললাম, 'হাঁ, আমিতো তাঁর সাথে তাওয়াফ করেছি।' বললেন, 'তুমি কি কখনো তাকে পশ্চিমের দুকোণে চুমো খেতে দেখেছো ? 'আমি বললাম, না।' 'তখন তিনি বললেন—তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর্শ মানবে না ?' বললাম—'কেন নয়, অবশ্যই মানবো।' তিনি বললেন, 'তবে চুমো খাওয়া থেকে বিরত থাকো।'[১৫]

৬. সাফা মারওয়া সাঈ করা

তাওয়াফে কুদূমের পর সাফা মারওয়া সাঈ করতে হয়। সাঈ শুরু করা হয় সাফা থেকে এবং মারওয়া গিয়ে তা শেষ হয়। প্রতিবারই সাফা কিংবা মারওয়া পাহাড়ের চূড়ায় ওঠতে হবে এটি জরুরী নয়। বরং এর পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ানোই যথেষ্ট। ইবনু আবী নাজীহ্ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, আমাকে এমন কতিপয় লোক বলেছেন যারা হযরত ওসমান (রা)-কে সাফা মারওয়া দৌড়াতে দেখেছেন, তিনি শুধু পাহাড়দ্বয়ের পাদদেশে গিয়ে দাঁড়াতেন, চূড়ায় ওঠতেন না।[১৬]

৭. আরাফাতে অবস্থান (ওকুফে আরাফা)

৯ই যিলহাজ্জ প্রত্যুষে হাজীগণ আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অবস্থানের সময় তালবিয়া ও দু'আ দরূদ পাঠ করা হয়। সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হতে হয়। হযরত ওসমান (রা) সূর্য ডুবে যাবার পর আরাফাত থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন।[১৭]

আরাফাতের দিন হাজীদের রোযা রাখা উচিত নয়। যাতে পূর্ণ শক্তিতে আল্লাহর দরবারে দু'আ ও মুনাজাতে লিপ্ত হতে পারেন। আরাফাতের দিনের রোযা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, তিনি বললেন—আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) সকলের সাথেই হাজ্জ করেছি, তাদের মধ্যে কেউই আরাফাতের দিন রোযা রাখেননি। এমন কি তারা রোযা রাখতেও নির্দেশ দেননি আবার কাউকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতেও বলেননি।[১৮]

যদি কোনো হাজী মনে করেন, তার রোযা রাখার সামর্থ আছে, তাহলে তিনি রোযা রাখতে পারেন। হাসান বসরী (রহ)-কে আরাফাতের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, বললেন—হযরত ওসমান (রা) প্রচণ্ড গরমের সময়ও আরাফাতের দিন রোযা রাখতেন। তিনি গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের ওপর ছায়া করে রাখতেন।[১৯]

www.amarboi.org

৮. হাজ্জের সময় মুসাফিরদের জন্য নামায কসর করা

বহিরাগত হাজীগণ যদি মক্কা মুকাররমায় (১৫ দিনের বেশী) অবস্থানের ইচ্ছে না করেন তাহলে তারা নামায কসর করবেন। যদি অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন তবে পুরো নামায পড়বেন। হযরত ওসমান (রা) ২৯ হিজরী পর্যন্ত হাজ্জ কিংবা ওমরা করার জন্য মক্কায় তাশরীফ নিলে নামায কসর পড়তেন। কিন্তু ২৯ হিজরীতে তিনি মিনায় লোকদেরকে পুরো নামাযই পড়িয়েছেন।

মুসান্নাফ–ইবনু আবী শাইবায় বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম সাত বছর হাজ্জের সময় নামায কসর পড়ছেন। তারপর তিনি মিনায় অবস্থানকালে পুরো নামায পড়তেন।[২০]

মুসান্নাফ–আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনা, হযরত ওসমান (রা) তাঁর খিলাফাতের প্রথম দিকের বছরগুলোতে সফরে নামায কসর করতেন। পরে তিনি পুরো নামায পড়া-ই শুরু করে দিয়েছিলেন।[২১]

ওলামাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য হতে পারেননি যে, হযরত ওসমান (রা) হাজ্জের সময় দু রাকায়াত নামায পড়ার পরিবর্তে চার রাকায়াত পড়া শুরু করলেন কেন ? অনেকে বলেছেন, তিনি হাজ্জের সময় মক্কা শরীফে (১৫ দিনের বেশী) অবস্থানের নিয়ত করতেন, এজন্য তিনি সেখানে বিয়ে করে নিয়েছিলেন। যখন দু রাকায়াতের পরিবর্তে চার রাকায়াত নামায পড়া নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলো, তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন—লোকেরা শুনুন ! আমি এরূপ করছি কারণ আমি মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে বিয়ে করে নিয়েছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো জনপদে বিয়ে করবে সে সেখানে মুকীমের মত (পুরো) নামায আদায় করবে।[২২]

আরেক দলের মতে—হযরত ওসমান (রা) সে বছর মিনায় চার রাকায়াত নামায পড়িয়েছেন, কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন সেবার সর্বাধিক বেদুঈন হাজ্জে এসেছেন, তারা যেন বুঝতে পারেন নামায দু রাকায়াত নয় বরং চার রাকায়াত। ইমাম যুহরী (রহ) বলেন, হযরত ওসমান (রা) মিনায় শুধু বেদুঈনদের জন্য চার রাকায়াত নামায পড়িয়েছিলেন। সে বছর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বেদুঈন হাজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদেরকে শেখাতে চেয়েছিলেন যে, নামায মূলত চার রাকায়াত।[২৩]

অন্য আরেক দলের মতে—হযরত ওসমান (রা) সফরে নামায কসর করা জায়েয মনে করতেন কিন্তু ওয়াজিব মনে করতেন না। তাঁর অভিমত ছিলো সফরে নামায কসর করা কিংবা পুরো পড়া মুসাফিরের ইচ্ছেধীন। তিনি তাঁর খিলাফাতকালের প্রথম দিকের বছরগুলোতে নামায কসর পড়তেন কিন্তু শেষ দিকের বছরগুলোতে পুরো নামায পড়া-ই শুরু করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা)-এর অভিমতও অনুরূপ।[২৪]

৯. তালবিয়া পাঠ বন্ধ করা

আমরা এর আগে বলেছি হাজীগণ ইহরাম বাঁধার পর থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু করবেন এবং জামরাতু আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তালবিয়া পড়া বন্ধ করবেন। হযরত ওসমান (রা)-এর আমলও এরূপ ছিলো।

www.amarboi.org

হাজামাহ্ (حجامة)—শিঙ্গা লাগানো

১. হাজামাহ অর্থ শিঙ্গা লাগিয়ে চিকিৎসা করা এবং শিঙ্গায় মুখ লাগিয়ে পুঁজ ও রক্ত চুষে বের করা।

২. শিঙ্গা লাগানোকে পেশা হিসেবে নেয়া

হযরত ওসমান (রা) শিঙ্গা লাগানোকে পেশা হিসেবে নেয়া মাকরূহ্ মনে করতেন।[২৫] হযরত সা'দ ইবনু মুহাইসাহ্ তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সা'দ এর দাদা) শিঙ্গা লাগিয়ে তার পারিশ্রমিকের টাকা গ্রহণের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি চাইলেন। তিনি তা গ্রহণ করতে নিষেধ করে দিলেন। তাঁর আযাদকৃত এক ক্রীতদাস ছিলো। সে শিঙ্গা লাগিয়ে উপার্জন করতো। তিনি এ উপার্জনের টাকা কিভাবে ব্যয় করবেন একথা জানার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি তাকে বলে দিলেন ঐ পারিশ্রমিক দিয়ে উটের খাদ্য কিনে নিয়ো কিংবা গোলাম বাঁদীকে খাইয়ে দিয়ো।[২৬]

একদিন হযরত ওসমান (রা)-এর এক আত্মীয় এলেন। তিনি কী করেন ওসমান (রা) তা জানতে চাইলেন। সেই আত্মীয় জবাবে বললেন—হাম্মাম (গোসলখানা)-এর আয় ও শিঙ্গা লাগানোকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। একথা শোনে হযরত ওসমান (রা) বললেন—তোমার দু'টো পেশা-ই নোংরা কিংবা বললেন, নাপাক।[২৭]

যেহেতু হযরত ওসমান (রা) শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে উপার্জনকে অপছন্দ করতেন, তাই স্পষ্ট বুঝা যায়—তিনি একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করাকেও অপছন্দ করতেন। কারণ শিঙ্গা লাগানোর সময় মুখে রক্ত ও পুঁজ লেগে যায়, যা নাপাক। এজন্যই এটি নোংরা কাজ।

–(আরো জানতে হলে দেখুন 'ইজারা' শিরোনাম)

হাদ (حد)—শাস্তি

১. সংজ্ঞা

হাদ বলতে এমন নির্দিষ্ট শাস্তিকে বুঝায় যা কোনো নির্দিষ্ট অপরাধের কারণে প্রয়োগ করা হয়।

২. হাদ কার্যকর করার অধিকার

হাদ কার্যকর করার মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রের। কারণ হাদ আল্লাহর হক। এ হক শুধু রাষ্ট্র প্রধানই সঠিকভাবে আদায় করতে পারেন। আমরা দেখতে পাই হযরত ওসমান (রা) আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদের ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি এক বাঁদীকে হত্যা করেছিলেন। যে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-কে যাদু করেছিলো।[২৮] তার রাগের কারণ ছিলো তিনি খলীফার অনুমোদন ছাড়াই সেই বাঁদীকে হত্যা করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক বাঁদী উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-কে যাদু করেছিলো। পরে বাঁদী তার অপরাধ স্বীকার করে। হাফসা (রা), আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রা)-কে নির্দেশ দেন তাকে হত্যা করে ফেলার জন্য। তিনি তাকে হত্যা করে ফেলেন। হযরত ওসমান (রা) একথা জানতে পেরে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর

www.amarboi.org

(রা) হযরত ওসমান (রা)-কে বলেন—আপনি এমন মহিলাকে হত্যার জন্য আপত্তি করছেন যে উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-এর ওপর যাদু করেছে এবং তার অপরাধের স্বীকৃতিও দিয়েছে? আপনি আপনার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন না। একথা শুনে হযরত ওসমান (রা) চুপ হয়ে গেলেন।[২৯]

মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবায় বর্ণিত হয়েছে—ঐ মহিলাকে হত্যার ব্যাপারটি হযরত ওসমান (রা) এজন্য অপছন্দ করেছিলেন, কারণ, তিনি তার অনুমতি ছাড়াই সেই বাঁদীকে হত্যা করেছিলেন।[৩০]

হাদ কার্যকরী করার দায়িত্ব কারো ওপর অর্পণ করা ইমাম বা রাষ্ট্রপতির জন্য জায়েয। হযরত ওসমান (রা) ওয়ালীদ ইবনু ওকবার ওপর মাদক দ্রব্য সেবনের অভিযোগে হাদ কার্যকরী করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত আলী (রা)-কে। আলী (রা) আবার তা কার্যকরী করার দায়িত্ব তার ছেলে হযরত হাসান (রা)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি অপারগতা প্রকাশ করলে হযরত আলী (রা) এ দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা)-কে অর্পণ করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা) চাবুক মারলেন এবং হযরত আলী (রা) গুণতে লাগলেন।[৩১]

-(আরো দেখুন 'আশরাবাহ' শিরোনাম)

[২.১] খলীফার জন্য এটি জরুরী নয় যে, হাদ কার্যকরী করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমরা দেখেছি হাদ কার্যকর করার জন্য তিনি হযরত আলী (রা)-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আরেক ঘটনায় এক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকেননি।[৩২]

[২.২] যদি কেউ অপরাধীর ওপর হাদ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করেন, যা একান্তভাবে রাষ্ট্রের অধিকার, তিনি ভুল করবেন। আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন—উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর এক বাঁদী তাকে যাদু করেছিলো। পরে বাঁদী তার অপরাধ স্বীকার করে। হাফসা (রা) আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদকে নির্দেশ দেন তাকে হত্যা করার জন্য। তিনি তাকে হত্যা করেন। হযরত ওসমান (রা) একথা জানতে পেরে ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন—আপনি এমন মহিলাকে হত্যার জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন, যে উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-এর ওপর যাদু করেছে এবং তার অপরাধ স্বীকারও করেছে? একথা শুনে হযরত ওসমান (রা) চুপ হয়ে গেলেন।[৩৩]

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কেউ তার গোলাম বাঁদীকে হত্যা করবেন, এটি হযরত ওসমান (রা) অনুমোদন করতেন না। শুধু উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি হাফসা (রা)-এর ব্যাপারটি চুপ করে গেছেন। আরো একটি কারণ হতে পারে, তিনি একে ইজতিহাদ মনে করেছেন। না ইজতিহাদ দিয়ে আরেক ইজতিহাদকে নিষেধ করা যায়। আর না এক ইজতিহাদ দিয়ে আরেক ইজতিহাদকে বাতিল করা যায়।

৩. হাদ কার্যকর করার শর্ত

নিম্নোক্ত শর্তাবলী না পাওয়া পর্যন্ত কারো ওপর হাদ কার্যকর করা যাবে না ঃ

www.amarboi.org

[৩.১] বুদ্ধিমান হওয়া ঃ বালেগ হওয়ার পর এ শর্তটি পূর্ণ হয়। বালেগ হওয়ার পূর্বে কেউ অপরাধে লিপ্ত হলে তার ওপর হাদ কার্যকরী করা যাবে না। এজন্য হযরত ওসমান (রা) কখনো না বালেগের ওপর হাদ কার্যকর করতেন না। বর্ণিত আছে—চুরির অপরাধে এক বালককে তাঁর আদালতে হাজির করা হলো। তিনি বললেন—চেক করে দেখুন তার নাভির নিচে লোম গজিয়েছে কিনা। লোকেরা তাকে চেক করে দেখলো, সেখানে লোম গজায়নি। সম্ভবত সে তখনও বালেগ হয়নি। তখন হযরত ওসমান (রা) রায় দিলেন—চুরির অপরাধে তার হাত কাটা যাবে না। অর্থাৎ তার ওপর হাদ কার্যকরী করা যাবে না।[৩৪] সেই সাথে তিনি এও বললেন—নাভির নিচে লোম গজালে তার ওপর হাদ কার্যকরী করা জরুরী হয়ে যায়।[৩৫] এজন্যই নাবালেগের ওপর হাদ কার্যকর করা যায় না যে, তার বুদ্ধিশুদ্ধি এখনো পূর্ণতায় পৌঁছেনি। কাজেই যারা পাগল, বোকা, বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ নয়—তাদের ওপর হাদ কার্যকর করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

[৩.২] স্বেচ্ছায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া ঃ যাকে জোর করে অপরাধে লিপ্ত করা হয়েছে, তার ওপর হাদ কার্যকর করা যাবে না, এ সম্পর্কে সকল উম্মাহ একমত।

[৩.৩] অপরাধ নিষিদ্ধ সে সম্পর্কে ধারণা থাকা ঃ কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলো কিন্তু সেই অপরাধ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তার জানা ছিলো না। এমতাবস্থায় তার ওপর হাদ কার্যকর করা যাবে না। হাদ কেবল তার ওপর কার্যকর করা যাবে, যে অপরাধের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানে।[৩৬]

হিশাম ইবনু ওরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাকে ইয়াহইয়া ইবনু আবদুর রহমান ইবনু হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ বলেছেন, তাঁর পিতা আবদুর রহমান ইবনু হাতিব মৃত্যুর সময় তাঁর গোলাম বাঁদী যারা নামায পড়তো তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। একজন বাঁদী এমন ছিলো, যে নামায রোযা করতো কিন্তু অনারব হওয়ার কারণে দীন সম্পর্কে খুব কমই জানতো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সে মূর্খ ছিলো। তার গর্ভ প্রকাশ পাওয়ার পর সে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লো। সে ছিলো অকুমারী। আবদুর রহমান ইবনু হাতিব তার ভয় ও পেরেশানী সম্পর্কে অবহিত হয়ে হযরত ওমর (রা)-এর নিকট গেলেন। সবকিছু শুনে হযরত ওমর (রা) বললেন—আপনি কোনো ভালো খবর নিয়ে আসেননি। তিনি ঐ বাঁদীকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি কি গর্ভবতী ?' বললো—মারওশের দ্বারা আমার গর্ভ হয়েছে। সে এ কাজের জন্য আমাকে দুটো দিরহাম দিয়েছে। সেখানে হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা)-ও ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন—এ সম্পর্কে আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। হযরত ওসমান (রা) বসাছিলেন, একথা শোনে শুইয়ে পড়লেন। হযরত আলী (রা)-ও হযরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা) বললেন—'এ বাঁদীর ওপর হাদ কার্যকর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।' হযরত ওমর (রা) হযরত ওসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন—এবার আপনার পরামর্শ বলুন। তিনি বললেন—আপনার অন্য দু ভাই তো আপনাকে পরামর্শ দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা) বললেন—'না আপনিও পরামর্শ দিন।' তখন হযরত ওসমান (রা) বললেন—'আমি দেখতে পাচ্ছি যেভাবে এ বাঁদী বলে বেড়াচ্ছে, মনে হয় এটি যে গুনাহর কাজ কিংবা অপরাধ এ সম্পর্কে সে বেখবর। হাদ তো কেবল তাদের ওপরই কার্যকর করা হয় যারা অপরাধ সম্পর্কে সচেতন।

www.amarboi.org

একথা শুনে হযরত ওমর (রা) রায় দিলেন—তা'যীর (সংশোধনীমূলক শাস্তি) স্বরূপ তাকে একশ' ঘা বেত লাগাও এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাও। রায় কার্যকরী করা হলো। তারপর হযরত ওসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন—আপনি সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, হাদ কেবল তার ওপরই প্রয়োগ করা যায় যে অপরাধ সম্পর্কে সচেতন এবং জানে এটি গুনাহর কাজ।[৩৭]

৪. অপরাধ প্রমাণের উপায়

[৪.১] **স্বীকারোক্তি** ঃ ওপরের ঘটনায় আমরা দেখেছি অপরাধের স্বীকারোক্তির কারণে হযরত ওমর (রা) সেই বাঁদীকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিতে চেয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রা)-এর পরামর্শে হাদ প্রয়োগ থেকে তিনি বিরত রয়েছেন। তদ্রূপ বিচারকের উচিত, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়ার পরও পরোক্ষভাবে তাকে প্রত্যাহার করার আমন্ত্রণ জানানো। বর্ণিত আছে—হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট এক চোরকে উপস্থিত করা হলো। তিনি বললেন—আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি একজন সুপুরুষ এবং সুন্দর চেহারার অধিকারী কাজেই তোমার মত লোক চুরি করতে পারে না। তুমি কি কুরআনুল কারীমের কোনো অংশ পড়তে পারো ? বললো—হাঁ, আমি সূরা আল বাকারা পড়তে পারি।[৩৮]

[৪.২] **সাক্ষ্য** ঃ অপরাধ প্রমাণের আরেকটি উপায় হচ্ছে সাক্ষ্য। যিনা ছাড়া অন্য অপরাধে দুজন পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন। অবশ্য যিনার জন্য চারজন পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ع

"তোমাদের মহিলাদের মধ্যে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তোমাদের থেকে চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১৫)

[৪.৩] **আলামত** ঃ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার তৃতীয় উপায় হচ্ছে আলামত। যেমন—সুরা পানের পর বমিতে তার আলামাত পাওয়াই প্রমাণ করে যে, সে সুরা পান করেছে। হুসাইন ইবনু মানযার রুককাশী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে ওয়ালীদ ইবনু ওকবাকে হাজির করা হলো। তার বিরুদ্ধে হামরান ও অন্য এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করলেন। একজন বললেন আমি তাকে সুরা পান করতে দেখেছি। আরেকজন বললেন, আমি তার বমিতে সুরা পানের আলামত পেয়েছি। তখন হযরত ওসমান (রা) বললেন, সে মদ পান না করলে বমিতে মদ এলো কোত্থেকে ? তারপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন; ওঠুন, ওকে চাবুক লাগান। হযরত আলী (রা) তাঁর ছেলে হাসান (রা)-কে বললেন, তুমি যাও। হাসান (রা) বললেন, এ ব্যাপারে যার আগ্রহ বেশী সেই যাক। সম্ভবত তিনি একে প্রকাশ করা সমুচীন মনে করেননি। তখন আলী (রা) আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা)-কে বললেন, 'তুমি যাও, চাবুক লাগাও।' আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা) চাবুক মারতে লাগলেন এবং হযরত আলী (রা) গুণতে থাকলেন। যখন চল্লিশ ঘা লাগানো হলো তখন বললেন, থামো। তারপর বলতে লাগলেন—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদকসেবীদেরকে চল্লিশ ঘা চাবুক মেরেছেন, হযরত আবু বকর (রা)-ও অনুরূপ শাস্তি দিয়েছেন। অবশ্য হযরত ওমর (রা) আশি ঘা মেরেছেন। সবই সুন্নাত। তবে আমার নিকট এটিই পছন্দনীয়।[৩৯]

৩৮—

www.amarboi.org

৫. 'হাদ' এবং 'তা'যীর' একত্রে প্রয়োগ

অপরাধের মাত্রা বেশী হলে বিচারকের জন্য জায়েয আছে তিনি ইচ্ছে করলে 'হাদ' এবং 'তাযীর' একত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। যেমন অভ্যস্থ মাদকসেবীকে বারবার অপরাধ সংঘটিত করার জন্য শাস্তির মাত্রাটা বেশী করা প্রয়োজন। এজন্য হযরত ওসমান (রা) অভ্যস্ত মাদকসেবীকে চল্লিশ ঘা মেরেছেন 'হাদ' হিসেবে এবং অতিরিক্ত চল্লিশ ঘা মেরেছেন 'তা'যীর' হিসেবে। কারণ কোনো অপরাধ পুনরাবৃত্তি করার জন্য নির্দিষ্ট 'হাদ'-এর অতিরিক্ত শাস্তি নির্ধারিত নেই।-(আরো দেখুন 'আশরাবাহ' শিরোনাম)

৬. গোলাম বাঁদীর জন্য নির্দিষ্ট 'হাদ' এর অর্ধেক শাস্তি

স্বাধীন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট 'হাদ' এর অর্ধেক একজন গোলাম বা বাঁদীকে প্রয়োগ করতে হবে। [যদিও উভয়ের অপরাধের মাত্রা এক]। সূরা আন নিসায় বাঁদীকে ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে—

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ط ـ(النساء : ٢٥)

"তারা যদি অশ্লীল কাজ করে, তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ২৫)

আবদুল্লাহ ইবনু আমির ইবুন রবী'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) সহ অন্যান্য খলীফার শাসনামলে দেখেছি, তাদের কাউকে গোলাম বাঁদীর ওপর হাদ প্রয়োগের সময় চল্লিশ ঘা বেতের বেশী মারতে দেখিনি।[৪০]

হযরত ওসমান (রা)-এর এক গোলাম একবার মদ পান করেছিলো। তিনি তার ওপর স্বাধীন ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত 'হাদ' এর অর্ধেক প্রয়োগ করেছিলেন।

-(বিস্তারিত দেখুন-'আশরাবাহ' শিরোনাম)

৭. হাদ এর প্রকার

হাদ সাত প্রকার। যথা-

[৭.১] মুরতাদ এর হাদ।-(বিস্তারিত দেখুন 'রিদ্দাহ' শিরেনাম)

[৭.২] যিনা র হাদ।-(বিস্তারিত 'যিনা' শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

[৭.৩] চুরির হাদ।-('সিরকাহ' শিরেনাম দেখুন)

[৭.৪] লুঠতরাজের হাদ। এ সম্পর্কে আমি হযরত ওসমান (রা)-এর কোনো অভিমত পাইনি।

[৭.৫] সতী নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার হাদ।

-(বিস্তারিত দেখুন 'কাযাফ' শিরোনাম)

[৭.৬] মাদক দ্রব্য সেবনের হাদ।-(দেখুন 'আশরাবাহ' শিরোনাম)

[৭.৭] যাদু টোনার হাদ।-(বিস্তারিত দেখুন 'সিহর' শিরোনাম)

৮. সন্দেহের ক্ষেত্রে হাদ স্থগিত হয়ে গেলে তাযীর প্রয়োগ।

-(বিস্তারিত দেখুন 'তা'যীর' শিরোনাম।

www.amarboi.org

হাদাছ (حدث)—অপবিত্রতা/ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া/নতুনত্ব

(এখানে) হাদাছ বলতে নাজাসাতে হুকমীকে বুঝানো হয়েছে। নাজাসাতে হুকমীর অবস্থায় নামায আদায় করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ওযু বা গোসল করে নিতে হবে।

–(বিস্তারিত দেখুন 'ওযু' এবং 'গুসল' শিরোনাম)

হাদিয়্যাহ (هدية)—দান/উপহার

–কারো সাথে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ কিংবা কারো নৈকট্য অর্জনের জন্য বিনা প্রতিদানে নিজের কোনো সম্পদ তার মালিকানায় দিয়ে দেয়াকে হাদিয়া বা দান বলে।

–হাদিয়্যাহ ও হিবা একই জিনিস।–('হিবা' শিরোনাম দেখুন)

হাদীস (حديث)—

হযরত ওসমান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি কারো জন্য এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয মনে করতেন না, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রসিদ্ধ নয় কিংবা যা প্রথম খলীফার সময়ে সাহাবা কিরাম (রা) বর্ণনা করেননি। মাহমুদ লবীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি হযরত ওসমান (রা)-কে মিম্বারের ওপর বসে বলতে শুনেছি, কারো জন্য জায়েয নয় যে, সে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করবে যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে শোনা যায়নি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে যে জিনিসটি আমাকে বাধা প্রদান করে তা এই নয় যে, আমি তার সম্পর্কে বেখবর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম বরং আমি তাকে বলতে শুনেছি–

مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَالَمْ اَقُلْ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

"যে ব্যক্তি আমার রেফারেন্সে এমন কথা বলবে, যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিলো।"

হাবাল (حبل)—গর্ভ/ভ্রূণ

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'হামল' শিরোনাম।

হামল (حمل)—গর্ভ/গর্ভের ভ্রূণ

১. গর্ভের ন্যূনতম সময়

হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট 'হামল' (গর্ভ)-এর ন্যূনতম মেয়াদ ছ' মাস। বর্ণিত আছে—এমন এক মহিলাকে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত করা হলো যিনি গর্ভধারণের ছ' মাস পর সন্তান প্রসব করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা) তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) একথা জানতে পেরে তাকে বললেন—এ মহিলাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম)-এর নির্দেশ দেয়া যেতে পারে না। কেননা সূরা আহকাফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

حَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط ـ(الاحقاف : ١٥)

"গর্ভধারণ এবং সন্তানকে দুধ ছাড়ানোর ত্রিশ মাস লেগে গেছে।"–(সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫)

সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط

"পিতা চাইলে মা তার বাচ্চাকে পুরোপুরি দু' বছর দুধ পান করাবে।"–(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

আল্লাহ তা'আলার এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয়, গর্ভধারণের (ন্যূনতম) মেয়াদ ছ' মাস। তাই এ মহিলাকে রজম করা যেতে পারে না। হযরত ওসমান (রা) সাথে সাথে সেই মহিলার কাছে লোক পাঠালেন। কিন্তু তিনি গিয়ে দেখতে পেলেন তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হয়ে গেছে।[৪১]

সুনানু সাঈদ ইবনু মানসুরে এ রকম আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। গর্ভধারণের ছ' মাস পর সন্তান প্রসব করেছে এমন এক মহিলা সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করা হলো। হযরত ওসমান (রা) তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। একথা হযরত ইবনু আব্বাস (রা) জানতে পারলেন। বললেন—আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো, লোকজন তাঁকে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন—এ মহিলা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারায় ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط

"পিতা চাইলে মা তার সন্তানকে পুরো দু' বছর দুধ পান করাবে।"–(সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط ـ(الاحقاف : ١٥)

"গর্ভধারণ ও সন্তানকে দুধ ছাড়ানোর ত্রিশ মাস লেগেছে।"–(সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫)

তখন হযরত ওসমান (রা) সেই মহিলাকে ডেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন।[৪২] এখন আল্লাহই ভালো জানেন ওপরোক্ত দুটো ঘটনার মধ্যে কোন্‌টি সংঘটিত হয়েছিলো। কেননা একথা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে, দু দুবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো আর তিনি দুবারই ভুল করলেন।

২. গর্ভবতীর ইদ্দত প্রসব পর্যন্ত।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইদ্দাতুন' শিরোনাম)

–গর্ভধারণ বালেগ হওয়ার 'আলামত'।–(বিস্তারিত 'বুলূগ' শিরোনাম দেখুন)

–গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায়।

–(দেখুন 'যাকাতুল ফিতর' শিরোনাম)

হামাম (حمام)-কবুতর

হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে কবুতর উড়ানো প্রতিযোগিতার হিড়িক পড়ে যায়। তা এমনভাবে প্রসারতা লাভ করে, মানুষ আল্লাহর স্মরণ ও তার যাবতীয় দায়-দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে বসে। অযথা সময় নষ্ট করতে থাকে। কবুতর উড়ানোর জন্য বাড়ির ছাদে ওঠে

www.amarboi.org

মানুষের পর্দায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এজন্য হযরত ওসমান (রা) কবুতর প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেসব কবুতর দিয়ে প্রতিযোগিতা করা হতো সেগুলোকে যবাহ করার নির্দেশ দেন। হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি নিজে হযরত ওসমান (রা)-কে জুম'আর খুতবায় কুকুর নিধন ও কবুতর যবেহ্ করার ব্যাপারে বলতে শুনেছি।[৪৩] পরে তিনি এ নির্দেশের ওপর স্থির থাকেননি, বনী লাইছ গোত্রের এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কবুতরের (পাখার) পালক কেটে দেয়ার জন্য যেন তা উড়তে না পারে। হাকীম ইবনু ইবাদ ইবনু হানীফ থেকে বর্ণিত, আরাম আয়েশ ও সুখ স্বাচ্ছন্দের কারণে মানুষ যখন সুস্থ্ সবল হয়ে ওঠেছিলো তখন সর্বপ্রথম মদীনায় যে অন্যায় কাজের প্রকাশ পায়, তা হচ্ছে—কবুতর উড়ানো এবং হিংসা-বিদ্বেষে পাথর ছুড়াছুড়ি। হযরত ওসমান (রা) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বনী লাইছ গোত্রের এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন কবুতরের পাখা কেটে দেয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার জন্য।[৪৪]

হাম্মাম (حمام)—গোসলখানা/সুইমিংপুল

গোসলখানা বা সুইমিং পুলকে হাম্মাম বলা হয়। গোসলখানার পরিবেশ সাধারণত নোংরা থাকে। তাছাড়া যারা গোসল করেন তারা সেখানে সতরের ব্যাপারটি খুব একটা গুরুত্ব দেন না। এজন্য হযরত ওসমান (রা) হাম্মামের ব্যবসা এবং তা থেকে উপার্জনকে অপছন্দ (মাকরূহ মনে) করতেন। তাঁর এক আত্মীয় একদিন বেড়াতে এলেন। তিনি তার আয় উপার্জন সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। তিনি উপার্জনের দুটো মাধ্যমের কথা বললেন—একটি হাম্মামের ব্যবসা, অপরটি শিঙ্গা লাগানো। একথা শোনে হযরত ওসমান (রা) বললেন—তোমার উপার্জনের দুটো পদ্ধতিই নোংরা কিংবা বললেন—অপবিত্র।[৪৫]

হামীল (حميل)—সন্তানের মাতৃত্ব দাবী করা

হামীল বলা হয় যুদ্ধবন্দী মহিলারা যেসব সন্তান সাথে নিয়ে আসে এবং যাদেরকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে।

–হামীলের ওয়ারিশীস্বত্ব।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইরছ' শিরোনাম)

হায়িয (حيض)—ঋতুস্রাব/মাসিক

১. সংজ্ঞা

অসুখ-বিসুখ এবং গর্ভধারণ ছাড়া (নির্দিষ্ট বয়সে) মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে প্রতি মাসে যে রক্ত বের হয় তাকে হায়িয বলা হয়।

২. মাসিকের সময় যেসব জিনিস মহিলাদের নিষিদ্ধ

মাসিকের সময় মহিলাদের নামায, রোযা এবং মসজিদে অবস্থান সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। এমনকি স্বামীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাও নিষেধ। ইরশাদ হচ্ছে—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ط قُلْ هُوَ اَذًى لا فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ط

"লোকেরা হায়িয সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন সে তো এক অস্বস্তিকর অবস্থা, তখন মহিলাদের থেকে পৃকক থাকো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২২)

www.amarboi.org

ইমাম ইবনু হাযম হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন—তিনি মহিলাদের মাসিকের সময় ইশারায় তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয মনে করতেন।[৪৬]

৩. হায়িয হচ্ছে বালিগ হওয়ার নিদর্শন

(বিস্তারিত দেখুন 'বুলূগ' শিরোনাম)

–তালাকাপ্রাপ্তার যদি মাসিক হয় তাহলে মাসিকের হিসেবে ইদ্দত গণনা করতে হবে।–(বিস্তারিত দেখুন 'ইদ্দাতুন' শিরোনাম)

–হায়িয শেষে গোসল করা অপরিহার্য।–(বিস্তারিত দেখুন 'গুসল' শিরোনাম)

–হায়িযের সময় মহিলাদের ইশারায় তিলাওয়াতের সিজদা করা।

–(বিস্তারিত দেখুন 'সুজূদ' শিরোনাম)

হারবী (حربی)–সামরিক/মুসলিম দেশের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম

ইসলামী রাষ্ট্রে আগমনকারী হারবীদের কর (TAX) প্রদান বাধ্যতামূলক।

হারাম (حرام)–নিষিদ্ধ/সম্মানিত

যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের ওপর হারাম করে নেয়।

–বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'যিহার' এবং 'তালাক' শিরোনাম)

হারাম (حرم)—পবিত্রস্থান/মক্কা ও মদীনার সংরক্ষিত স্থান

১. মক্কার সংরক্ষিত স্থানের সীমানা

বিস্তারিত দেখুন 'মাক্কাহ' শিরোনাম।

–হারাম শরীফের ভেতর শিকার করা এবং তার ক্ষতিপূরণ।–(দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

–মক্কায় হারাম শরীফের ভেতর ইহরাম অবস্থায় প্রবেশের বিধান।

–(বিস্তারিত দেখুন 'ইহরাম' শিরোনাম)

–হারাম শরীফের মধ্যে হারানো বস্তু পাওয়া। হারানো বস্তু ওঠানোর জরিমানা দ্বিগুণ।

–হারাম শরীফে অপরাধ সংঘটিত হওয়া এবং দিয়াতে কঠোরতা করা।

–(বিস্তারিত দেখুন 'জিনাইয়া' শিরোনাম)

২. মদীনার সংরক্ষিত স্থানের সীমানা

হযরত ওমর (রা)-এর মতই হযরত ওসমান (রা) অমুসলিম যিম্মীদের হিযাযের সীমানায় বিশেষ করে মদীনা মুনাওয়ারার সংরক্ষিত স্থানের (হারামের) সীমানায় বসবাসের অনুমতি দিতেন না। যেসব অমুসলিম মদীনা শরীফে ব্যবসার পণ্য নিয়ে প্রবেশ করতো, পণ্য বিক্রি করার জন্য তাদেরকে তিনদিন থাকার অনুমতি প্রদান করা হতো।[৪৭]

হালয়ুন (حلی)–অলংকার/গহনা/কারুকাজ

১. সোনা রূপা কিংবা মূল্যবান পাথর দিয়ে কারুকাজ করে যেসব অলংকারাদি সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বানানো হয় তাকে হালয়ুন বলে।

www.amarboi.org

২. মনে হয় হযরত ওসমান (রা) কুরআনুল কারীমের সৌন্দর্য বিকাশের জন্য সোনা রূপা ও অন্যান্য ধাতুর কারুকাজ জায়েয মনে করতেন। কেননা তার খিলাফাতকালে কতিপয় লোক সোনা রূপা দিয়ে তাদের কুরআন শরীফে কারুকাজ করে নিয়েছিলেন। ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি ইমাম মালিক (রহ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সোনা রূপা দিয়ে কুরআন শরীফে কারুকাজ করা যায় কি ? তিনি আমাকে কুরআন শরীফের একটি কপি বের করে দেখালেন এবং বললেন, আমার পিতা তার পিতার বরাদ দিয়ে বলেছেন—যিনি হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন—তারা কুরআনুল কারীমের কতিপয় কপিকে সোনা-রূপা দিয়ে ডিজাইন করেছিলেন।[৪৮]

হিজরত (هجرة)-নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যাকাত/সাদকা প্রদান।-(বিস্তারিত দেখুন 'সাদাকাহ' শিরোনাম)

হিজা (هجاء)-নিন্দা করা/ব্যঙ্গ করা/বানান করা

১. কারো নিন্দা বা কুৎসা রটনাকে হিজা বলা হয়।

২. হিজার শাস্তি

নিন্দা বা কুৎসা রটনা হারাম। তাই প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে—এ ধরনের কাজ বন্ধের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া। প্রয়োজনে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে, যেন এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। হযরত ওসমান (রা) এ ধরনের কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করতেন।[৪৯]

হিদাদ (حداد)-শোক পালন/শোকবস্ত্র

ইদ্দত পালনরত বিধবা শোক প্রকাশার্থে সৌন্দর্য চর্চা ও প্রসাধনী ব্যবহার থেকে বিরত থাকাকে হিদাদ বলা হয়।-(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'ইদ্দাহ্' শিরোনাম)

হিবা (هبة)-দান/উপহার

১. সংজ্ঞা

নিজের জীবদ্দশায় নিজস্ব কোনো জিনিস কোনোরূপ বিনিময় ব্যতিরেকে কাউকে সেই জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়াকে হিবা বলা হয়।

২. দানের ব্যাপারে সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

কারো একাধিক সন্তান থাকলে, কোনো একজনকে কিছু দান করতে চাইলে, সকলকেই অনুরূপ বস্তু দান করা উচিত। ইনসাফ এবং সমতার দৃষ্টিকোণ থেকেই এরূপ করা প্রয়োজন। অবশ্য কেউ যদি তার কোনো সন্তানকে উত্তম কোনো কাজ কিংবা ভালো কাজের বিনিময়ে কিছু দান করেন তাহলে অন্যদের মাঝেও অনুরূপ বস্তু দান করতে হবে এটি জরুরী নয়। মু'আবিয়া ইবনু হাইদাহ থেকে বর্ণিত, তার পিতা হাইদার বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলো। যারা বয়সের দিক থেকে মু'আবিয়ার থেকে ছোট ছিলো। হাইদাহ খুব ধনী ছিলেন। তিনি তার

www.amarboi.org

সমস্ত সম্পদ এক স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের নামে দিয়ে দিলেন। এটি দেখে মু'আবিয়া হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে সবকিছু জানিয়ে দিলেন। তিনি হাইদারকে (ডেকে) বললেন—হয় তোমার দান ফেরত নেবে, না হয় সকল সন্তানের মধ্যে তা সমানভাবে ভাগ করে দেবে। তিনি দান ফেরত নিলেন। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন তার বড়ো সন্তানরা ছোট ভাইদের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।[৫০]

৩. হিবার শর্ত

[৩.১] হিবাকৃত বস্তু নিজের অধিকারে না নেয়া পর্যন্ত হিবা কার্যকরী হয় না। এ সূত্রের ভিত্তিতে যাকে হিবা করা হয়, তিনি যদি তা নিজ অধিকারে না নিয়ে থাকেন তাহলে হিবাকারী তা প্রত্যাহার করতে পারেন। এটি বৈধ।[৫১]

[৩.২] যদি হিবাকৃত বস্তু যাকে হিবা করা হলো তিনি নিজ আয়ত্বে নিতে সমর্থ না হন, (অর্থাৎ নাবালেগ হওয়ার কারণে নিজ আয়ত্বে নেয়া সম্ভব না হয়) এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক তা গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে ধরে নেয়া হবে বালেগ অবস্থায় সেটি তার আয়ত্বাধীনে চলে গেছে। হযরত ওসমান (রা)-এর বাণী—"সন্তানের মালের হিফাযতের জন্য তা দখলে নেয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী তার পিতা।"[৫২]

[৩.৩] **পিতা তার সন্তানকে হিবা করা ঃ** পিতা তার সন্তানকে কোনোকিছু হিবা করতে চাইলে সেজন্য সাক্ষী রাখা প্রয়োজন। সাক্ষী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধরে নেয়া হবে হিবা তার করায়ত্বে চলে গেছে। তারপর সেই জিনিস পিতার নিকট রেখে দেয়া জায়েয। হযরত ওসমান (রা)-এর অভিমত হচ্ছে—"কোনো ব্যক্তি তার অল্প বয়স্ক সন্তানকে কিছু হিবা করতে চাইলে সেই সন্তান যদি তা গ্রহণ এবং হিফাযত করতে অসমর্থ হয়, তাহলে পিতা কোনো সাক্ষীর সামনে তার হিবা করার ঘোষণা দিলে তা জায়েয আছে। পরে অভিভাবক হিসেবে পিতাকেই তার হিফাযত করতে হবে।[৫৩]–(আরো জানতে হলে দেখুন 'ইশহাদ' শিরোনাম)

হিমা (حمى)-চারণ ভূমি

১. সংজ্ঞা

মুসলমানের কল্যাণার্থে ওয়াক্‌ফকৃত কোনো জমি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে জনসাধারণকে সেখানে প্রবেশ করতে না দেয়াকে হিমা বলা হয়।

২. হিমার শরঈ ও আইনগত মর্যাদা

আমরা দেখতে পাই স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকী' নামক এলাকাকে 'হিমা' হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-ও সেই এলাকাকে 'হিমা' হিসেবেই সংরক্ষণ করেছেন। হযরত ওমর (রা) শারফ এবং রাবযাকে 'হিমা' ঘোষণা করেছিলেন।[৫৪] তারপর এলো হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকাল। তিনিও বিশেষ কিছু অঞ্চলকে হিমা হিসেবে সংরক্ষণের ঘোষণা দিলেন। আল্লাহর রাসূলের সময় যেসব সাহাবা ফাতওয়া প্রদান করতেন তারাও তখন কিছু বলেননি।[৫৫] অবশ্য মিসর থেকে যে প্রতিনিধিদল তাঁর নিকট এসেছিলো তাদের পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো তা অজ্ঞতার ভিত্তিতেই হয়েছিলো। যখন তারা এসব বিষয় নিয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর সাথে বিতর্ক করছিলো তখন তাদেরকে তিনি

www.amarboi.org

দলিল প্রমাণ ভিত্তিক এমন উত্তর দিলেন, তারা লা জবাব হয়ে গেলো। সুনানু বাইহাকীতে বর্ণিত হয়েছে, যখন মিসরবাসী হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলো তখন তারা তাঁর নিকট এক কপি কুরআন শরীফ চাইলো। তারপর সূরা ইউনুস বের করলো। হযরত ওসমান (রা) যখন তা তিলাওয়াত করে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় এসে পৌছুলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآاَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلاً ط قُلْ اٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ٥(يونس : ٥٩)

"হে নবী! তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তার মধ্যে কতিপয় তোমাদের জন্য হালাল এবং কতিপয় হারাম করে নিয়েছো? আরো জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এরূপ করার অনুমতি দিয়েছেন নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর অপবাদ দিচ্ছো?"–(সূরা ইউনুস ঃ ৫৯)

তারা বললো, ব্যস এখানেই থামুন। এবার বলুন, যে জমি আপনি 'হিমা' এর নামে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ কি কোনো নির্দেশ দিয়েছেন, না আপনি আল্লাহর ওপর অপবাদ চাপাচ্ছেন? হযরত ওসমান (রা) উত্তর দিলেন, এ আয়াতে কারীমার সাথে এ বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই একে এখানেই থাকতে দিন। এ আয়াত মক্কার কাফিরদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা বাহীরা, সায়িবা এবং ওয়াসিলা প্রভৃতিকে কখনো হালাল আবার কখনো হারাম মনে করতো। রইলো চারণ ভূমি (হিমা) নির্দিষ্ট করণের প্রসঙ্গ। তো আমার পূর্বে হযরত ওমর (রা) বাইতুলমালের উট চরানোর জন্য কিছু জমিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। আমি খলীফা হওয়ার পর বাইতুলমালে উটের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে তাই আমি চারণভূমির পরিমাণও বাড়িয়ে দিয়েছি।[৫৬]

হিরফাহ (حرفة)–পেশা/বৃত্তি

বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'কাসবুন' শিরোনাম।

হিরয (حرز)-সুরক্ষিত জায়গা/দুর্গ/গোডাউন

–এমন জায়গাকে 'হিরয' বলা হয় যা ধন-সম্পদ বা মালামাল রাখার জন্য নির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত।

–ততক্ষণ পর্যন্ত চোরের হাত কাটা যাবে না যতক্ষণ চোরাই মাল সংরক্ষিত জায়গা থেকে স্থানান্তর করে নিয়ে না যাবে।–(আরো দেখুন 'সিরকাহ' শিরোনাম)

www.amarboi.org

'হ' বর্ণের তথ্য নির্দেশিকা

১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭০ ; সুনানু বাইহাকী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪১২।
২. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১০৯ ; আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৫২৬।
৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৬৭ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৬৬১ ; আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৮৪-২৮৫ ; আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪৬৯ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭।
৪. আল মুগনী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৪০৯ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৬।
৫. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৩।
৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড পৃ-২৮২।
৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৯০ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১১৩।
৮. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১০৭।
৯. আল মাজমূ', ৭ম খণ্ড, পৃ-১৩৯।
১০. সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ-কিতাবুল হাজ্জ, তামাত্তু অনুচ্ছেদ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-৩০৬ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৮২; সুনানু বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃ-২২ ; ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৫২ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৫৮-১৫৯ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১০৭ ; আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-২৭৬, ২৭৮, ২৮০।
১১. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১০৭।
১২. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৪৮।
১৩. আল মুগনী, ৩য় খণ্ড, পৃ-৩৭।
১৪. ঐ, পৃ-৩৭৪।
১৫. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৭৮।
১৬. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১৮৪।
১৭. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৯৬।
১৮. ঐ, পৃ-১৬৯ ; আল মাজমূ', ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৪৩৮ ; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ-২০৮ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৮ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৬।
১৯. আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-১৯।
২০. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১৭৭।
২১. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ২য় খণ্ড, পৃ-৫১৬ ; মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ১ম খণ্ড, পৃ-৪০২।
২২. মুসনাদ-ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের রেফারেন্সে ফতহুল বারীতে হাজ্জ অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৯০ ; ৩য় খণ্ড, পৃ-৪০৮, ৪৫৬ ; আল মুহাল্লী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২৬৯ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-১১৩।
২৩. সুনানু বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৪৪ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৮৬।
২৪. ঐ ; আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৬৭-২৬৮।
২৫. আল মুহাল্লী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৯৩ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৯১।
২৬. জামি আত তিরমিযি, সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল বুয়ূ অধ্যায়, কাসবুল হাজ্জাম অনুচ্ছেদ ; মুসনাদ ইমাম আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৩৬।
২৭. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮।
২৮. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮০ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-৩৯৪ ; কানযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৭৫; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৭৮।
২৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৭৮।
৩০. ঐ।
৩১. সহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ-হুদূদ অধ্যায় মাদক দ্রব্য অনুচ্ছেদ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৩ ; ৮ম খণ্ড, পৃ-৩১০।

www.amarboi.org

৩২. সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২২০।
৩৩. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৮০ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৭ ; আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৬৪, ৩৯৪ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৭৫০।
৩৪. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ১০ম খণ্ড, পৃ-১৭৮ ; ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬ ; আল মুগনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-৫৫৮ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৪৬ ; কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৭।
৩৫. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২৬।
৩৬. আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-১৮৫, ৩০৮।
৩৭. আল মুহাল্লী, ১১শ খণ্ড, পৃ-১৮৪, ৪০২ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৩৮।
৩৮. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৫৯।
৩৯. সহীহ মুসলিম ; সুনানু আবী দাউদ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৮৩ ; ৮ম খণ্ড, পৃ-৩১০।
৪০. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৮২৮ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৫ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬২।
৪১. মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৮২৫ ; সুনানু বাইহাকী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪৪৩ ; আল মুগনী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২১১, ৫২৮।
৪২. সুনানু-সাঈদ ইবনু মানসুর, ৩য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ-৬৯ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪১৯ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৭ম খণ্ড, পৃ-৩৫১।
৪৩. কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-১০১ ; আল মুহাল্লী, ৭ম খণ্ড, পৃ-৪০০।
৪৪. ঐ, পৃ-২২২।
৪৫. সুনানু বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, পৃ-৩৩৮।
৪৬. আল মুহাল্লী, ৫ম খণ্ড, পৃ-১১১ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-৬৫ ; আল মুগনী, ১ম খণ্ড, পৃ-৬২০।
৪৭. আল মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃ-২৮৮।
৪৮. কানযুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ-৩৩৮।
৪৯. মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ২য় খণ্ড, পৃ-১২৭ ; সুনানু বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, পৃ-২৫৩ ; কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৬৩।
৫০. আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১৪৩, ১৪৯।
৫১. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫৯২, ৫৯৪।
৫২. মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-১০৩ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২২ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০১।
৫৩. আল মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ-৭৭১ ; সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৭০ ; কানযুল উম্মাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ-৬৪৭ ; আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৬০২ ; মুসান্নাফ-আবদুর রাজ্জাক, ৯ম খণ্ড, পৃ-১০৩ ; মুসান্নাফ-ইবনু আবী শাইবা, ১ম খণ্ড, পৃ-২৭৩ ; আল মুহাল্লী, ৯ম খণ্ড, পৃ-১২২।
৫৪. ফিকহে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) 'হিমা' শিরোনাম।
৫৫. আল মুগনী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৫২৯।
৫৬. সুনানু বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ-১৪৭।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।